www.facebook.com/tanbir.ebooks

The Secret Stories Behind 100 Successful Man

প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন থাকে। কিন্তু স্বপ্নের পথে পা বাড়ালেই একের পর এক আসতে থাকে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। যে ব্যক্তি এসব প্রতিবন্ধকতা টপকে এগিয়ে যাবেন তিনিই হবেন সফল। মানুষের জীবন মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যায়। তারপরও মানুষের প্রত্যাশা থাকে পরিশ্রম, সাহস, ইচ্ছাশক্তি, একাগ্রতা আর প্রতিভার সমন্বয়ে জীবনে সফল হবার।মানুষের ভাগ্য তাদের হাতে নেই। কিন্তু নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার সমস্ত যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে।যারা নিজের এই ভাগ্যকে মানুষের কল্যানের জন্য পরিবর্তন করতে পেরেছে তাহারা পৃথিবিতে সফল মানুষ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে ।

এসকল সফল মানুষের পেছনে আছে কিছু গল্প, তা অনেকটা রূপকথার মতো। আর সে সব গল্প থেকে মানুষ খুঁজে নেয় স্বপ্ন দেখার সম্বল, এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন প্রেরণা। সফলতার গল্প মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। আর যে স্বপ্ন দেখতে জানে না বড় কিছু করা তার জন্য কঠিন।

যারা ভালবাসে স্বপ্ন দেখতে আর সফলতার শীর্ষে যেতে, তাদের জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আশা করি এই ই-বুকে দেওয়া সফলদের উপদেশ ও তাদের দিকনির্দেশনা সমূহ আপনাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নরূণের পথে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।কারন ই-বুকে রয়েছে জগদ্বিখ্যাত সফল ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-বক্তৃতা অথবা তরুণদের উদ্দেশে দেওয়া সাক্ষাৎকারের চৌম্বক অংশ , যেখানে তারা বলেছেন তাদের সফলতার গোপন রহস্য ।তাই তাদের উপদেশ সমূহ পড়ুন এবং নিজের জীবনে কাজে লাগান তাঁদের দিকনির্দেশনা।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

ড.আতিউর রহমান (ব্যাংকের গভর্নর)

রাখাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর



দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড.আতিউর রহমানের ছেলেবেলা কেটেছে গরু-ছাগল চড়িয়ে! সেখান থেকে আজকের অবস্থানে পৌছাতে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করতে হয়েছে।

প্রিয় পাঠক আসুন সেই কাহিনী শুনি তাঁর নিজের-ই মুখে:— আমার জন্ম জামালপুর জেলার এক অজপাড়াগাঁয়ে । ১৪ কিলোমিটার দূরের শহরে যেতে হতো পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে । পুরো গ্রামের মধ্যে একমাত্র মেট্রিক পাস ছিলেন আমার চাচা মফিজউদ্দিন ।আমার বাবা একজন অতি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন । কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো আমাদের।আমার দাদার আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি । কিন্তু তিনি আমার বাবাকে তাঁর বাড়িতে ঠাঁই দেননি । দাদার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ছনের ঘরে আমরা এতগুলো ভাই-বোন আর বাবা-মা থাকতাম । মা তাঁর বাবার বাড়ি থেকে নানার সম্পত্তির সামান্য অংশ পেয়েছিলেন । তাতে তিন বিঘা জমি কেনা হয় । চাষাবাদের জন্য অনুপযুক্ত ওই জমিতে বহু কষ্টে বাবা যা ফলাতেন, তাতে বছরে ৫/৬ মাসের খাবার জুটতো । দারিদ্র্য কি জিনিস, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি- খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, কি এক অবস্থা!!

আমার মা সামান্য লেখাপড়া জানতেন । তাঁর কাছেই আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি । তারপর বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই । কিন্তু আমার পরিবারে এতটাই অভাব যে,আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম,তখন আর

পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলো না । বড় ভাই আরো আগে স্কুল ছেড়ে কাজে ঢুকেছেন । আমাকেও লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের পথে নামতে হলো। আমাদের একটা গাভী আর কয়েকটা খাঁসি ছিল । আমি সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ওগুলো মাঠে চড়াতাম। বিকেল বেলা গাভীর দুধ নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতাম । এভাবে দুই ভাই মিলে যা আয় করতাম, তাতে কোন রকমে দিন কাটছিল । কিছুদিন চলার পর দুধ বিক্রির আয় থেকে সঞ্চিত আট টাকা দিয়ে আমি পান-বিড়ির দোকান দেই । প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসতাম । পড়াশোনা তো বন্ধই,আদৌ কি করবো- সেই স্বপ্নও ছিল না। এক বিকেলে বড় ভাই বললেন, আজ স্কুল মাঠে নাটক হবে । স্পষ্ট মনে আছে, তখন আমার গায়ে দেয়ার মতো কোন জামা নেই । খালি গা আর লুঙ্গি পরে আমি ভাইয়ের সঙ্গে নাটক দেখতে চলেছি । স্কুলে পৌছে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক! চারদিকে এত আনন্দময় চমৎকার পরিবেশ । আমার মনে হলো,আমিতো আর সবার মতোই হতে পারতাম । সিদ্ধান্ত নিলাম,আমাকে আবার স্কুলে ফিরে আসতে হবে। নাটক দেখে বাড়ি ফেরার পথে বড় ভাইকে বললাম,আমি কি আবার স্কুলে ফিরে আসতে পারি না ? আমার বলার ভঙ্গি বা করুণ চাহনি দেখেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক কথাটা ভাইয়ের মনে ধরলো । তিনি বললেন,ঠিক আছে কাল হেডস্যারের সঙ্গে আলাপ করবো।

পরদিন দুই ভাই আবার স্কুলে গেলাম । বড় ভাই আমাকে হেডস্যারের রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে গেলেন । আমি বাইরে দাড়িয়ে স্পষ্ট শুনছি, ভাই বললেন আমাকে যেন বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগটুকু দেওয়া হয় । কিন্তু হেডস্যার অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললেন, সবাইকে দিয়ে কি লেখাপড়া হয়!

স্যারের কথা শুনে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। যতখানি আশা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম,স্যারের এক কথাতেই সব ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল । তবু বড় ভাই অনেক পীড়াপীড়ি করে আমার পরীক্ষা

দেওয়ার অনুমতি যোগার করলেন । পরীক্ষার তখন আর মাত্র তিন মাস বাকি । বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, আমাকে তিন মাসের ছুটি দিতে হবে । আমি আর এখানে থাকবো না । কারণ ঘরে খাবার নেই,পরনে কাপড় নেই- আমার কোন বইও নেই, কিন্তু আমাকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

মা বললেন, কোথায় যাবি? বললাম, আমার এককালের সহপাঠী এবং এখন ক্লাসের ফার্স্ট বয় মোজাম্মেলের বাড়িতে যাবো । ওর মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে । যে ক'দিন কথা বলেছি,তাতে করে খুব ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে । আমার বিশ্বাস, আমাকে উনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

দুরু দুরু মনে মোজাম্মেলের বাড়ি গেলাম । সব কিছু খুলে বলতেই খালাম্মা সানন্দে রাজি হলেন । আমার খাবার আর আশ্রয় জুটলো; শুরু হলো নতুন জীবন । নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলাম। প্রতিক্ষণেই হেডস্যারের সেই অবজ্ঞাসূচক কথা মনে পড়ে যায় ,জেদ কাজ করে মনে; আরো ভালোকরে পড়াশোনা করি। যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো । আমি এক-একটি পরীক্ষা শেষ করছি আর ক্রমেই যেন উজ্জীবিত হচ্ছি। আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যাচ্ছে । ফল প্রকাশের দিন আমি স্কুলে গিয়ে প্রথম সারিতে বসলাম হেডস্যার ফলাফল নিয়ে এলেন । আমি লক্ষ্য করলাম , পড়তে গিয়ে তিনি কেমন যেন দ্বিধান্বিত । আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন । তারপর ফল ঘোষনা করলেন । আমি প্রথম হয়েছি ! খবর শুনে বড় ভাই আনন্দে কেঁদে ফেললেন । শুধু আমি নির্বিকার-যেন এটাই হওয়ার কথা ছিল। বাড়ি ফেরার পথে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । আমি আর আমার ভাই গর্বিত ভংগিতে হেঁটে আসছি । আর পিছনে এক দল ছেলেমেয়ে আমাকে নিয়ে হৈ চৈ করছে, স্লোগান দিচ্ছে । সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল! আমার নিরক্ষক বাবা, যারঁ কাছে ফার্স্ট আর লাস্ট একই কথা- তিনিও আনন্দে আত্মহারা; শুধু এইটুকু বুঝলেন যে, ছেলে বিশেষ কিছু একটা করেছে।যখন শুনলেন আমি ওপরের ক্লাসে উঠেছি, নতুন বই লাগবে,

www.facebook.com/tanbir.ebooks
পরদিনই ঘরের খাসিটা হাটে নিয়ে গিয়ে ১২টাকায় বিক্রি করে দিল। তারপর আমাকে নিয়ে জামালপুর গেলেন। সেখানকার নবনূর লাইব্রেরী থেকে নতুন বই কিনলাম।

আমার জীবনযাত্রা এখন সর্ম্পূন বদলে গেছে। আমি রোজ স্কুলে যাই। অবসরে সংসারের কাজ করি। ইতোমধ্যে স্যারদের সুনজরে পড়ে গেছি। ফয়েজ মৌলবী স্যার আমাকে তারঁ সন্তানের মত দেখাশুনা করতে লাগলেন। সবার আদর,যত্ন, স্নেহে আমি ফার্স্ট হয়েই পঞ্চম শ্রেনীতে উঠলাম।এতদিনে গ্রামের একমাত্র মেট্রিক পাশ মফিজউদ্দিন চাচা আমার খোঁজ নিলেন। তারঁ বাড়ীতে আমার আশ্রয় জুটলো।প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আমি দিঘপাইত জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হই। চাচা ওই স্কুলের শিক্ষক। অন্য শিক্ষকরাও আমার সংগ্রামের কথা জানতেন। তাই সবার বাড়তি আদর-ভালবাসা পেতাম।

আমি যখন সপ্তম শ্রেনীতে পেরিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উঠবো, তখন চাচা একদিন কোথেকে যেন একটা বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে এসে আমাকে দেখালেন। ওটা ছিল ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন। যথাসময়ে ফরম পূরণ করে পাঠালাম।

এখানে বলা দরকার, আমার নাম ছিল আতাউর রহমান। কিন্তু ক্যাডেট কলেজের ভর্তি ফরমে স্কুলের হেডস্যার আমার নাম আতিউর রহমান লিখে চাচাকে বলেছিলেন, এই ছেলে একদিন অনেক বড় কিছু হবে। দেশে অনেক আতাউর আছে। ওর নামটা একটু আলাদা হওয়া দরকার; তাই আতিউর করে দিলাম।

আমি রাত জেগে পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নিলাম। নির্ধারিত দিনে চাচার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। ওই আমার জীবনে প্রথম ময়মনসিংহ যাওয়া। গিয়ে সবকিছু দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। এত এত ছেলের মধ্যে আমিই কেবল পায়জামা আর স্পঞ্জ পরে এসেছি। আমার মনে হলো, না আসাটাই ভালো ছিল। অহেতুক কষ্ট করলাম। ভাবলাম হবে না। কিন্তু দুই মাস পর চিঠি পেলাম, আমি নির্বাচিত হয়েছি। এখন চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

সবাই খুব খুশি; কেবল আমিই হতাশ। আমার একটা প্যান্ট নেই, যেটা পরে যাবো। শেষে স্কুলের কানাই লাল বিশ্বাসের ফুলপ্যান্টটা ধার করলাম। আর একটা শার্ট যোগাড় হলো। আমি আর চাচা অচেনার ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। চাচা শিখিয়ে দিলেন, মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি যেন দরজার কাছে দাড়িঁয়ে বলি: ম্যা আই কাম ইন স্যার? ঠিক মতোই বললাম। তবে এত উচ্চস্বরে বললাম যে, উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। পরীক্ষকদের একজন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের এম. ডাব্লিউ. পিট আমাকে আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবকিছু আচঁ করে ফেললেন। পরম স্নেহে আমাকে বসালেন। মুহুর্তের মধ্যে তিনি আমার খুব আপন হয়ে গেলেন। আমার মনে হলো, তিনি থাকলে আমার কোন ভয় নেই। পিট স্যার আমার লিখিত পরীক্ষার খাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর অন্য পরীক্ষকদের সঙ্গে ইংরেজীতে কী-সব আলাপ করলেন। আমি সবটা না বুঝলেও আচঁ করতে পারলাম যে, আমাকে তাদেঁর পছন্দ হয়েছে। তবে তারাঁ কিছুুই বললেন না। পরদিন ঢাকা শহর ঘুরে দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। যথারীতি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলাম। কারন আমি ধরে নিয়েছি আমার চান্স হবে না।

হঠাৎ তিন মাস পর চিঠি এলো। আমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। মাসে ১৫০ টাকা বেতন লাগবে। এর মধ্যে ১০০ টাকা দেওয়া হবে, বাকি ৫০ টাকা আমার পরিবারকে যোগান দিতে হবে। চিঠি পড়ে মন ভেঙ্গে গেল। যেখানে আমার পরিবারের তিনবেলা খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, আমি চাচার বাড়িতে মানুষ হচ্ছি, সেখানে প্রতিমাসে ৫০ টাকা বেতন যোগানোর কথা চিন্তাও করা যায় না!

এই যখন অবস্থা, তখন প্রথমবারের মতো আমার দাদা সবর হলেন। এত বছর পর নাতির (আমার) খোঁজ নিলেন। আমাকে অন্য চাচাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা থাকতে নাতি আমার এত ভালো সুযোগ পেয়েও পড়তে পারবে না? কিন্তু তাদের অবস্থাও খুব বেশি

ভালো ছিল না। তারাঁ বললেন, একবার না হয় ৫০ টাকা যোগাড় করে দেবো, কিন্তু প্রতি মাসে তো সম্ভব নয়। দাদাও বিষয়টা বুঝলেন।
আমি আর কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে সেই ফয়েজ মৌলভী স্যারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি থাকতে কোন চিন্তা করবে না। পরদিন আরো দুইজন সহকর্মী আর আমাকে নিয়ে তিনি হাটে গেলেন। সেখানে গামছা পেতে দোকানে দোকানে ঘু-রলেন। সবাইকে বিস্তারিত বলে সাহায্য চাইলেন। সবাই সাধ্যমতো আট আনা, চার আনা, এক টাকা, দুই টাকা দিলেন। সব মিলিয়ে ১৫০ টাকা হলো। আর চাচারা দিলেন ৫০ টাকা। এই সামান্য টাকা সম্বল করে আমি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলাম। যাতায়াত খরচ বাদ দিয়ে আমি ১৫০ টাকায় তিন মাসের বেতন পরিশোধ করলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন।
প্রথম দিনেই এম. ডাব্লিউ. পিট স্যার আমাকে দেখতে এলেন। আমি সব কিছু খুলে বললাম। আরো জানালাম যে, যেহেতু আমার আর বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই তিনমাস পর ক্যাডেট থেকে চলে যেতে হবে। সব শুনে স্যার আমার বিষয়টা বোর্ড মিটিয়ে তুললেন এবং পুরো ১৫০ টাকাই বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।এস.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ৫ম স্থান অধিকার করলাম এবং আরো অনেক সাফল্যের মুকুট যোগ হলো।
আমার জীবনটা সাধারণ মানুষের অনুদানে ভরপুর। পরবর্তীকালে আমি আমার এলাকায় স্কুল করেছি, কলেজ করেছি। যখন যাকে যতটা পারি, সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করি। কিন্তু সেই যে হাট থেকে তোলা ১৫০ টাকা!! সেই ঋণ আজও শোধ হয়নি। আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেও সেই ঋণ শোধ হবে না। শোধ হবার নয়!!

ড. মুহাম্মদ ইউনূস
(নোবেলজয়ী ও অর্থনীতিবিদ)

মানুষ টাকা বানানোর মেশিন নয়। টাকা বানানো জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। মানুষ সৃজনশীল সত্ত্বার অধিকারী।



নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, মানুষ টাকা বানানোর মেশিন নয়। টাকা বানানো জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। মানুষ সৃজনশীল সত্ত্বার অধিকারী। তার মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সৃজনশীল উদ্যোগ নিতে হবে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষকে আকাশের মতো বিশাল হতে হবে।

বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক ব্যবসা চর্চা নিয়ে একক বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ আজকের তরুণদের আগামী দিনের নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিতে হবে। তাদের বিশ্ব নিয়ে ভাবতে হবে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো সনাক্ত করে উদ্যোগ নিতে হবে সমাধানে।

তরুণদের উদ্দেশ্য করে ইউনূস বলেন, “তোমরা টাকা বানানোর মেশিন হবে না। সামাজিক সমস্যা বুঝে তা সমাধানে এগিয়ে যাবে।”

ইউনূস বলেন, টাকা বানানো জীবনের মূল্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে অংশ হতে পারে। তবে অর্জিত অর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে হবে। অন্যকে সুখী করার মধ্যে নিজের সুখ খুঁজতে হবে। মানুষের জীবন টাকা নিয়ে আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না।

তিনি বলেন, আমাদের ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সমস্যা রয়েছে। সবাই ব্যবসা করে মুনাফার জন্য। কিন্তু মুনাফা ব্যবসার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজে বিভিন্ন সমস্যা তাই আজও রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবেশ, জ্বালানি,

যোগাযোগসহ কত সামাজিক সমস্যা। তাই আমাদের নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সামাজিক ব্যবসা এর সমাধানের উপায় হতে পারে। এর মুনাফা বিনিয়োগকারিরা নিতে পারবে না। শুধু বিনিয়োগ ফেরত পাবেন। মুনাফা আবার বিনিয়োগ করা হবে।

তিনি তার ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আমি যখন দেখলাম আমার অঞ্চলের শিশুরা রাতকানা রোগে ভুগছে। তখন আমি এর সমাধান খুঁজলাম। কিন্ত তা একটু ভিন্নভাবে। ভিটামিন এ এর অভাবে এটি হয়। তাই আমি শাক সবজি চাষে অর্থ দেওয়া শুরু করি। বাড়ির চারপাশে সবজি চাষের জন্য এক টাকা দরে বীজ দিতাম। যাতে করে নিজের বাড়িতে তারা সবজি চাষ করে ভিটামিন এ এর অভাব পূরণ করতে পারে। আমি এরকম সব সময় সমস্যা দেখে ব্যবসার চিন্তা করেছি। কখনো টাকা বানানোর জন্য নয়। মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসা আমাকে হতাশ করে।

সামাজিক ব্যবসার এই প্রবর্তক বলেন, আজ প্রযুক্তি আমাদের হাতে। আজ থেকে ২০ বছর আগে আমরা কি ভেবেছিলাম আমাদের হাতে হাতে মোবাইল ফোন থাকবে। কিন্তু আজ তা সত্য। গতকাল যা অসম্ভব ছিলো, আজ তা সম্ভব হচ্ছে। অসম্ভব ও সম্ভব হাতে হাত রেখে চলছে। তাই তরুণদের সামাজিক ফিকশন রচনা করতে হবে। আজ থেকে ২০ বছর পরে ৩০ বছর পরে কোথায় থাকবে সমাজ। তাই এখনই ভেবে করনীয় ঠিক করতে হবে।

এসময় তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে সামাজিক ফিকশন করার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমাদের সায়েন্স ফিকশন আছে। এক সময় সায়েন্স ফিকশনে ভাবা হতো আমরা অন্য গ্রহে যাব। কিন্তু আজ তা সত্য। তাই সামাজিক ফিকশন করে তরুণদের, নতুন বিশ্ব গড়তে হবে। যেখানে বেকার থাকবে না। সামাজিক সমস্যা থাকবে না। দারিদ্র্য থাকবে না। পরের প্রজন্ম প্রশ্ন তুলবে, দারিদ্র্য কি?

www.facebook.com/tanbir.ebooks

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ(শিক্ষাবিদ)

নিজের ওপর আস্থা রাখো



আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। শিক্ষাবিদ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি সারা দেশে আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য কাজ করে চলেছেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কজন শিক্ষার্থী সম্প্রতি প্রথম আলো কার্যালয়ে বাগ্মী এই শিক্ষাবিদের সঙ্গে এক আড্ডায় মেতেছিলেন। সেখানে উঠে এসেছে বই পড়া, শিক্ষা, স্বপ্ন, ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে শুরু করে নানা বিষয়। সেই আড্ডার নির্বাচিত অংশ 'স্বপ্ন নিয়ে'র পাঠকদের জন্য।

☆ আমি পড়াশোনা করছি ভূগোল বিষয়ে। আমার শখ ছিল বাংলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করব। বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিছু একটা করব। কিন্তু আব্বু-আম্মু চাননি আমি বাংলায় পড়ি। তাঁদের ধারণা, তাহলে আমি জীবনে কিছু করতে পারব না। আমি এখন কী করব?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: আমার কাছেও আমার অভিভাবকদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। আমি কিন্তু কারও কথা শুনিনি। আমি ঠিক করেছিলাম বাংলা সাহিত্য পড়ব, শিক্ষক হব, আমি তা-ই পড়েছি, হয়েছি।

☆ কিন্তু স্যার, অভিভাবকদের কথা শোনাও তো আমাদের একটা কর্তব্য।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: সব সময়ই শুনবে। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি মনে করো কারও কথা শুনলে জীবনের বড় রকমের ক্ষতি হবে, তবে তাঁদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে অনুরোধ করে তোমার পক্ষে আনার চেষ্টা করবে। একেবারেই সম্ভব না হলে নিজের পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তখনো আগের মতোই বুঝিয়ে যাবে, প্রাণপণে চেষ্টা করবে যাতে তাঁরা মনে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

দুঃখ না পান। আগে তোমার জীবনের লক্ষ্য কী হবে, কোথায় তোমার আত্মার আনন্দ, তা ঠিক করো। যদি তুমি তোমার স্বপ্নের জীবনকে পেতে চাও, তোমাকে স্পষ্টবাদী ও সাহসী হতে হবে। শুধু যে আব্বা-আম্মা ফ্যাক্টর তা নয়, আত্মীয়স্বজন বা চারপাশের মানুষজনও অনেক সময় বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

☆আপনি আপনার পরিবার থেকে কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: আমার একটা খুব বড় সুবিধা ছিল যে আমার আব্বা ছিলেন আমার সব উল্টোপাল্টা কাজের পক্ষে। আমার আব্বা কলেজের শিক্ষক ছিলেন; দীর্ঘদিন অধ্যক্ষও ছিলেন। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসছি, তখন আব্বা আমাকে আমাদের মফস্বল শহরের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। বাস ছাড়তে তখনো ৪৫ মিনিট বাকি। আমরা তখন আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করছি। হঠাৎ দেখলাম, আব্বার ভেতর থেকে 'বাবা নয়' একজন 'শিক্ষক' কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি বললেন, 'আমাদের সবার বুকের বাঁ দিকে একজন মানুষ বাস করে। গভীরভাবে কান পাতলে তার গলার স্বর শোনা যায়। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে জিগ্যেস করবি, কী করব। সে যা বলবে, সেদিকে চলে যাবি। সেখানে তোর বাবা নেই, মা নেই, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। সেখানে তুই একা। রাজার মতোই একা।' সেদিনের পর থেকে আমি আর কোনো দিন কারও কথা শুনিনি। ঘরে-বাইরে সবখানে জনপ্রিয়তা হারিয়েছি, কিন্তু নিজের পছন্দের দিকে হেঁটে গেছি।

☆পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারিনি। যে বিষয়ে পড়ছি, তা নিরস মনে হয়। মনে হয়, যেন আমাকে জোর করে গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে। সারা বছর পড়তে ইচ্ছা করে না। পরীক্ষার এক মাস আগে মুখস্থ করি। রেজাল্টও ভালো হচ্ছে। কিন্তু আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না। এ ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ:

তোমাকে বুঝতে হবে যে পৃথিবীর কোনো বিষয়ই খারাপ নয়। অসংখ্য জিনিয়াস মাপের মানুষ তাঁদের প্রতিভার আলোয় ওই শাখাকে দীপান্বিত আর উজ্জ্বলিত করেছেন। তবে তুমি যেটা পড়তে চাও, সেটা তোমার আনন্দের হওয়াই ভালো। নিজের ভেতরকার আনন্দকে অনুসরণ করো। নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে পারবে।

আমি ইন্টারমেডিয়েটে কমার্স পড়েছিলাম আমার বড় মামার উৎসাহে। স্কুল পর্যন্ত আমার জানাই ছিল না যে লেখাপড়ার আসল উদ্দেশ্য টাকা? মামাই এটা আমাকে প্রথম বলেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলে যে কী জৌলুশদার জীবন হবে, তা তিনিই আমাকে বোঝান। এর আগে আমি জানতাম খেতে যেমন হয়, খেলতে যেমন হয়, সে রকম পড়তেও হয়। এই আনন্দই এর লক্ষ্য। এর মধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা। মামার কথার দিন কয়েকের মধ্যে এক গণক আমার হাত দেখে বললেন, 'তুমি তো ভবিষ্যতে টাকার ওপর গড়াগড়ি খাবে হে।' আর যায় কোথায়! টাকার স্বপ্নে ভর্তি হয়ে গেলাম কমার্সে। একবারও ভেবে দেখলাম না আমার আসল আনন্দের জায়গা কোনটা? তখন আমি সাহিত্যের আনন্দে মাতোয়ারা, সেই জগতের বড় বড় লেখকদের নিয়ে মশগুল। সেই মন নিয়ে কী করে কমার্স পড়ব। আমি ভর্তি হলাম কমার্সে, কিন্তু দিন-রাত সাহিত্য পড়তে লাগলাম। কমার্সের প্রস্তুতি নেওয়ার নাম নেই। পরীক্ষা এগিয়ে এল। ঠিক করলাম, পরীক্ষাই দেব না। পরীক্ষা দিচ্ছি না শুনে পরীক্ষার আগে আব্বা এলেন। বিচার বসল। সবাই মিলে চেষ্টা চলল কী করলে আমাকে পরীক্ষা দেওয়ানো যায়। সব ব্যর্থ হলে আব্বা বললেন, 'তাহলে এক কাজ করি রে। পড়বিই না যখন, তখন তোকে একটা বিয়ে দিয়ে দিই। ম্যাট্রিক পাস করেছিস যখন, ৬৭ টাকা বেতনের প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরি তো পাবি। ওই চাকরি করবি, আর নববিবাহিতা পল্লিবধূর সঙ্গে বসে বসে সারা দিন সাহিত্যচর্চা করবি।' হঠাৎ পল্লিবধূর কথা শুনে আমি এমন আতঙ্কিত হলাম যে পেছন দিকে তাকালেই মনে হতো যেন ঘোমটা

পরা পল্লিবধূ আমার পেছনে পেছনে শুধু আসছে। কিশোরীবধূর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণে পড়তে শুরু করে দিলাম।

☆ আমি পড়ছি ইংরেজি সাহিত্যে। গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। আমাদের গ্রামে কোনো লাইব্রেরি ছিল না। আমরা ২০০৮ সালে গ্রামে আকিমুদ্দিন লাইব্রেরি নামের একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাকে আমরা লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বলি, তারা তাকে তা বলতেও নারাজ। প-তে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে তাচ্ছিল্য করে তাকে বলে 'পাঁঠাগার'। শুরুতে আমাদের ৫৬টি বই ছিল। এক মাস পরে দেখা গেল, বইগুলোর একটিও নেই। কিন্তু এর পরও আমরা ঠিক করলাম, এটা আমরা চালিয়ে যাব। এখন আমরা ঢাকা থেকে বই পাঠাচ্ছি। কিন্তু গ্রামে এটা কোনোভাবেই চালাতে পারছি না। বই কেউ নিলে আর ফেরত আসছে না। 'দেব-দিচ্ছি' বলে সময় পার করে দিচ্ছে। আমরা কীভাবে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠব?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: তোমাদের থেকে আমার অভিজ্ঞতা আরও খারাপ। ১৯৮২ সালের কথা। আমিও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একটা লাইব্রেরি করেছিলাম। এক লাখ বইয়ের একটা লাইব্রেরি। এ কত খরচ করতে হয়েছিল, তা আশা করি বুঝতে পারছ। তখন দেশ গরিব। মানুষ গরিব। দেশের বড়লোকেরা গরিব। চেয়েচিন্তে কত কষ্ট করে যে এক লাখ বই কিনেছিলাম, তা বলার নয়। কিন্তু সদস্য হলো কতজন, জানো? মাত্র এক হাজার ২০০ জন। এক লাখ বই আর সদস্য এক হাজার ২০০ জন! এই এক হাজার ২০০ জনের মধ্যে প্রথম দিন ৬০০ সদস্য সেই যে বই নিয়ে চলে গেল, আর ফিরল না। রইল ৬০০ জনের মতো। এদের মধ্যে দেখলাম ৪০০ জনই গোয়েন্দা কাহিনি বা মাসুদ রানা ধরনের বই খুঁজছে। তাহলে প্রকৃত পাঠক হলো মাত্র শ দুয়েক।

আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরি আন্দোলন তাই বন্ধ করেছি। আমরা লাইব্রেরি নয়, বইপড়াকে গুরুত্ব দিচ্ছি। লাইব্রেরির পরিচিত চেহারাটাকেই আমরা কিছুটা বদলে নিয়েছি।

ঠিক করলাম, আমাদের কাছে কেউ বই নিতে আসবে না, আমরাই পাঠকের কাছে বই নিয়ে যাব। এ হবে আগ্রাসী পাঠাগার। কিন্তু কোথায় পাঠক? খুঁজে দেখা গেল, আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতেই আছে সেই পাঠক—সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে। একটা স্কুল বা কলেজ হচ্ছে বহু মানুষের চাক। মৌমাছির চাক থাকে না? তেমনি চাক। ভাবলাম, আমরা যদি ওখানে বই দিয়ে যেতে পারি, তবে সেখান থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে বড় দৃষ্টিভঙ্গি, বড় হৃদয়সম্পন্ন মানুষ। সেই থেকে আমাদের বইপড়া কর্মসূচির শুরু।
আগে পাঠক তৈরি করতে হবে। তাহলে লাইব্রেরি আপনাআপনিই হবে। পাঠকেরা নিজেরাই তখন তাদের নিজেদের লাইব্রেরি গড়ে নেবে। এই যে তোমরা লাইব্রেরি বানানোর কথা ভাবছ, এর কারণ কী? কারণ, তোমরা কিছুটা পড়াশোনা করেছ। ইতিমধ্যে টের পেয়েছ যে পড়াশোনা করাটা জীবনের বিকাশের জন্য খুব জরুরি। আনন্দের জিনিস। বড় জিনিস। তাই সে আনন্দ আর উপকার সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাচ্ছ।

☆ সফল হওয়ার উপায় কী?
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: সবাই শুধু সাফল্য সাফল্য করে চিৎকার করে। কিন্তু আমার ধারণা, সাফল্য খুব কাম্য জিনিস হলেও বড় জিনিস নয়। সাফল্য একটা দক্ষতা। চোর-বাটপারও অনেক সময় সফল হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশের সফল লোকদের মধ্যে ৮০ ভাগই তো দুর্বৃত্ত। এমন জিনিস নিয়ে পাগল হওয়ার কী আছে। সবচেয়ে যা বড় জিনিস, তা সাফল্য নয়, সার্থকতা। ফুলের অনেক বৈচিত্র্য বা রঙের জৌলুশ আছে। এগুলো তার সাফল্য। কিন্তু যে গন্ধ দিয়ে সে আমাদের মন ভোলায়, তা হলো তার সার্থকতা। সেই সার্থকতাই কী আমাদের কাম্য নয়?

☆ কোনো কাজে ব্যর্থ হলে হতাশ লাগে। হতাশা কাটাতে কী করতে পারি?
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: এই যে আমরা এখানে

বসে আছি—এই যে লাইট, মাইক্রোফোন, বিশাল ভবন, আর সভ্যতার নানা বিস্ময়কর উপকরণ—এর কোনো কিছু কি হতাশা দিয়ে তৈরি হয়েছে? পৃথিবীর বড় কোনো কিছুই হতাশা থেকে তৈরি নয়। আমাদের সব সুখ সব সাফল্যই তো আশা থেকে পাওয়া। তা হলে কেন হতাশা। হতাশা তো মানুষকে কুরে কুরে খায়। এই একমাত্র ছোট্ট জীবনে হতাশার বিলাসিতা কি আমাদের মানায়? হতাশার কাছ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে আনন্দময় জিনিস নিয়ে মেতে থাকা। কাম্য কিছু করা। আনন্দের মূলে রয়েছে কাজ। কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। সব দুঃখ-যন্ত্রণাকে সে ধুয়েমুছে ফেলে। তবে সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে কাজ না করাই ভালো। কেননা তাতে কোনো রকম ব্যর্থতা এলেই তখন হতাশা আসতে চাইবে। কাজের মধ্যেই সাফল্য লুকানো আছে। কাজ করো। সাফল্য পায়ে হেঁটে চলে আসবে।

যে গান গাইছে, সে যদি ভাবে এর মাধ্যমে আমি পুরস্কার পাব, তাহলে কি গান গাইতে পারবে? যে অভিনেতা সংলাপ বলছে, সে যদি মনে করে আরও ভালো করে প্রেমের ডায়ালগ দিতে পারলেই একুশে পদক হবে, তাহলে কি সে পরের সংলাপ বলতে পারবে? কোনো ব্যক্তিরই পুরস্কারের কথা ভেবে কাজ করা উচিত নয়। কাজের মধ্যে ঢুকে যাও। কাজের মধ্যে রয়েছে আনন্দ। যেমন আখের মধ্যে মিষ্টি রস। তুমি যদি আনন্দ পাও, তবে হতাশা থাকবে না।

☆ সব কাজেই ভয় পাই। কাজ শুরু করতে সাহস পাই না। কী করব?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: উত্তরটা একটু অন্যভাবে দিই। রিপু মানে শত্রু। ভারতীয় শাস্ত্রে মানুষের ছয়টা রিপুর কথা বলা আছে। এরা মানুষের শত্রু। এরা হলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। মাৎসর্য কী বলো দেখি? মাৎসর্য হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। পরশ্রীকাতরতায় আমরা সবার ওপরে। কিন্তু আমি মনে করি, সবচেয়ে বড় শত্রুটার কথাই সেখানে বাদ পড়ে গেছে। এর নাম ভয়। তোমরা জীবনের পেছন দিকে তাকিয়ে দেখো। সত্যিকারের ভয়ের ঘটনা

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ঘটেছে কয়টা? অথচ আমরা সারা জীবনকে ভরে রেখেছি ভয় আর আতঙ্কের এক জগৎ-জোড়া অশুভ বাতাবরণ দিয়ে। পরীক্ষা এলে আমরা ভয় পাই, প্লেনে উঠতে ভয় পাই। ইন্টারভিউ দিতে গেলে ভয় পাই, নতুন কিছু দেখলে ভয় পাই। প্রতিটা জায়গাতেই ভয়। ভূতে কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে ভালোবাসে। কেউ কোনো দিন প্রমাণ করতে পারেনি যে ভূত বলে কিছু আছে। কিন্তু সারাটা জীবন আমরা ভূতের ভয়ে অস্থির। খুঁজে দেখো তো দেখি, তোমার ভয়টা কিসের? মনের মধ্যে ভয় থাকলেই কেবল ভয় আসবে, তা ছাড়া নয়। মৃত্যু ছাড়া আমি জীবনের কোনো বিপদ দেখি না। এটার ওপর তোমার আমার কোনো হাত নেই। কাজেই মৃত্যু তার কাজ করুক। এসো, আমরা জীবনের কাজ করি।

☆ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। আমাদের সময়ের ছেলেমেয়েদের সারাক্ষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে চলতে হয়। এই প্রতিযোগিতার যুগে সুখী হওয়ার সুযোগ কোথায়?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: পুঁজিবাদী অর্থনীতির বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিযোগিতা। প্রতিটি মুহূর্তে ছুটতে হবে, নতুন হতে হবে, পাল্টাতে হবে; না হলে বিক্রি হবে না। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে ও অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এক ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা। এবার এক মডেল বের হলো তো পরের বছর নতুন মডেল চাই। এক ফ্যাশন শেষ হওয়ার আগেই আরেক ফ্যাশন এসে যাচ্ছে। যে যুগে অর্থনীতির যেমন ধারা, সে যুগের মানুষও তেমন। আজকের মানুষ শুধুই পাল্টাচ্ছে; প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে কেবলই ছুটছে আর পাল্টাচ্ছে। এই পরিবর্তনেই তার অস্তিত্ব, তার প্রতিষ্ঠা, তার গর্ব। প্রতিযোগিতার হাতে পড়ে মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। এর মধ্যে মানুষ শুধু অসুস্থের মতো ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটছে। থামার উপায় নেই। শান্তি বা সুস্থিরতার সব পথ বন্ধ। দুই দু গুণে চার। চার দু গুণে আট। আট দু গুণে ষোলো, বত্রিশ, চৌষট্টি। এর কোনো শেষ নেই, এ থেকে মুক্তি নেই। এ আজ মানবজাতির নিয়তি।

সুখী হতে হলে কী শুধু 'চাই চাই' করলে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

চলবে। তুমি বলবে, তাহলে সুখী হবে কীভাবে? সুখী হওয়ার উপায় একটাই : থামা, প্রত্যাখ্যান করা। ছন্দের মধ্যে বিরতি আসে বলে তা যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে জীবনের মধ্যে বিরতিও তেমনি জীবনকে সুন্দর করে তোলে। সুখী হতে হলে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখতে হবে। তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে কতটুকু তোমার দরকার যার পরে তোমার আর চাওয়া নেই। অন্যদের দিকে তাকালে তুমি দুঃখী হয়ে যাবে, তাই ওটা চলবে না, তাকাতে হবে নিজের দিকে। নিজের ইচ্ছা-খুশির দিকে। তোমার মন যা চায় শুধু তার দিকে। তখন তোমার মন শান্ত আর সুস্থির হবে। তুমি সুখী হবে। কাঁচা রোদের ভেতর প্রকৃতির মাঝখানে যেয়ে বলতে হবে, এই গাছের নিচে বসে নীল আকাশের রূপ দেখে আমার মন খুশি হয়ে আছে। আমি আর কিছু চাই না।

☆ আমাদের নতুনদের মধ্যে শুদ্ধ বাংলা আর শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইদানীং বাংলার মধ্যে ইংরেজি শব্দ দিয়ে কথা বলার একটা চল দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা থেকে কীভাবে উত্তরণ পাওয়া যাবে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: ভালো উচ্চারণ খুব কম মানুষই করতে পারে। উচ্চারণ ভালো করতে হলে খুব তীক্ষ্ণ কান চাই। লতা মুঙ্গেশকর যেসব বাংলা গান গেয়েছেন, সেসব শুনে কি মনে হয় যে এই ভদ্রমহিলা বাঙালি নন? শুনেছি অনেক গান মাত্র একবার শুনেই তিনি রেকর্ড করতে পারতেন। গান যাঁরা করেন, তাঁদের কান খুবই সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হয়। বাংলা উচ্চারণ ভালো করতে হলেও তোমার তীক্ষ্ণ কান লাগবে। আর লাগবে অনুশীলন। অনেক উচ্চারণ আমরা জানি না, কিন্তু আশপাশের অনেকে জানে। তাদের সাহায্য নিয়ে উচ্চারণ ঠিক করে নেওয়া যায়। আবৃত্তি বা উচ্চারণের কোর্সে অংশ নিলে উচ্চারণ অনেকটা ভালো হয়। তবে ভালো ইংরেজি উচ্চারণ আমাদের দেশে খুব অল্প মানুষই করে। এই যে আমাদের এফএম রেডিওগুলোতে অযথাই কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। আরে এতই যদি ইংরেজি জানিস, তাহলে ইংরেজিতেই

অনুষ্ঠান কর। অযথা বাংলা ভাষাটাতে রুচিহীন করে তুলিস কেন? আসলে এদের অনেকেই না জানে বাংলা, না ইংরেজি। তাই কোনোটাই পারে না। এদের শেখানোর কেউ নেই। রেডিওর অকর্ষিত কর্তারা এদের দিয়ে ওসব করায়। বিকৃত বাংলা শুনিয়ে রেডিওর মালিকেরা এক ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যবসা করে।

☆ বাংলা কথা বলতে বলতে 'বাট' বলছে, 'সো' বলছে। এটা কেন হচ্ছে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ এলে দোষ নেই। 'কলেজ' আসেনি? 'চেয়ার' আসেনি? বাংলা ভাষায় এ রকম ১৫ হাজার ইংরেজি শব্দ যুক্ত হয়েছে। এতে ভাষা সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু 'বাট', 'সো' 'দেন'—এগুলো আগে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। এগুলোর অনেক সুন্দর বাংলা আছে বলেই হয়তো হয়নি। এগুলো ব্যবহারের সময় এদের ভাবটা এমন: এ তোদের পাঁচপেচে বাংলা নয় রে। এ অনেক বড় জিনিস। এ হলো গিয়ে ইংরেজি। আমরা ওই ভাষাটাই তো বলতে চাই, শুধু তোরা বুঝিস না বলে বলি না। এগুলো যারা করে, তারা ইংরেজিটাও ঠিকমতো জানে না। যে ইংরেজি জানে, তার এটা করার দরকার হয় না। এদের অনেকে ইংরেজিতে একটা গোটা বাক্য পর্যন্ত বলতে পারে না। প্রথমে দুটো-তিনটে শব্দ পর্যন্ত বলে। তারপর আবার বাংলায় ফিরে আসে। 'সো', 'বাট' বলে তারা বোঝাতে চায়, আমি তোদের দলে নই রে, আমি ওপরের। কোনো রেডিওতে একজন মেয়ে আর জে আছে। তার এমনি চৌকস কথাবার্তা যে শুনে মনে হয় সে বেশ ইংরেজি জানেটানে আরকি। কিন্তু একদিন শুনি একজনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে বলছে, 'ব্যাপারটাকে অত হার্ডলি নেবেন না।'হার্ডলি নেবেন না' শুনেই বুঝলাম ইংরেজি তার ভালো জানা নেই। এই হচ্ছে গন্ডগোল।

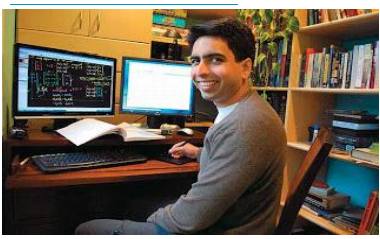
☆ শুদ্ধ বাংলা কি তাহলে হারিয়ে যাবে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: এটা আগামী বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এটা আমাদের জাতির পুঁজি গঠনের যুগ। এখন সবকিছুই অরাজক, বিশৃঙ্খল। আমাদের ভাষাও তাই।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ঢাকা শহরেও এখন কেউ শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে না। যদি কেউ বলে, তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। এই পুঁজি সুস্থির হয়ে এলে অনেক কিছুই ঠিক হয়ে আসবে। দেশে আবার সুধীসমাজের দেখা দেবে, যেমন ছিল আগে। সুধীসমাজ এলে সুধীজনের ভাষার দরকার হবে। একটা জাতিকে তো অবশ্যই প্রমিত ভাষায় কথা বলতে হবে। সব জাতিই তো বলে। তুমি বাড়ির মধ্যে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বসে ছিলে, তাই না। এখানে আসার সময় কি সেই পোশাকেই এসেছে? সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন, সুধীজনের জগৎ আর আমার বাড়ির জীবন কি এক? সামাজিক পরিবেশ যখন কথা বলতে হবে, তখন তোমাকে শুদ্ধ ভাষায়ই বলতে হবে। আমার মনে হয়েছে এফএম রিডিওর আর জেদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশি আর জেই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারে না। শুদ্ধ কথার ফাঁক দিয়ে আঞ্চলিক ভাষা বেরিয়ে পড়ে। তবে সৌভাগ্য, অনেকের ভাষা বেশ ভালো। শুনতে খুবই ভালো লাগে। আমি মনে করি তারা আগামী দিনের সুধীজনের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

সালমান খান (খান একাডেমি প্রতিষ্ঠাতা) শিখতে হবে সবখানে



বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সালমান খানের জন্ম ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে। সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিন নির্বাচিত বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির মধ্যে স্থান পেয়েছেন সালমান। ১০ মে ২০১২ রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

আজ এখানে বক্তৃতা দিতে পারা আমার জন্য সত্যিই এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, এখানে দাঁড়ানোয় ৩৫ বছরের নিজেকে তোমাদের তুলনায় অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে! কিন্তু আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার ছোট ভাইবোনদের কিছু বলতে এসেছি। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে চাই। এমন কিছু ব্যাপার, যা নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি, দেখতাম এবং এখনো দেখছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা একটি বড় ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছো। নিঃসন্দেহে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মান। এই সম্মান তোমাদের জীবনকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে। তোমাদের এই অর্জন কাজে লাগিয়ে কীভাবে পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নয়ন আরও বৃদ্ধি করা যায়, পৃথিবীটাকে আরেকটু সুন্দর করা যায়, সেটা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে।

২০০৯ সালে আমি যখন খান একাডেমি শুরু করি তখন আমি একটা সাজানো-গোছানো, সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝপথে। আমার ভিডিওগুলো দেখে তখন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লোকজন ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখত। কিন্তু একদিকে চাকরি আরেকদিকে খান একাডেমি, দুটোকে একসঙ্গে সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমি তখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের হাতে কী পরিমাণ টাকা-পয়সা আছে তার হিসাব করতে বসলাম। আমি তাকে

বোঝালাম কীভাবে খান একাডেমি দিয়ে শিক্ষার প্রচলিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে মানুষের শেখার ধরনকেই আমূল বদলে ফেলা যাবে, কীভাবে পৃথিবীজুড়ে মানুষ ঘরে বসে বিনা খরচে শিখতে পারবে, সভ্যতাকে কত সহজে কতখানি এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আর একবার এই সম্ভাবনা মানুষ বুঝতে পারলে এই মহৎ কাজে বিনিয়োগের অভাব হবে না। এমন এটাসেটা অনেক কিছু বুঝিয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম! আর পুরোপুরি খান একাডেমির কাজে লেগে গেলাম। আস্তে আস্তে নয় মাস কেটে গেল, অনেক কিছু করতে চেষ্টা করলাম, অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম, মিটিং করলাম। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হলো না। সত্যি কথা বলতে কি, আজ যখন লোকে শোনে আমি হার্ভার্ড, এমআইটিতে পড়াশোনা করেছি, তারা মনে করে কত সহজেই না আমি ভিডিও বানানো শুরু করেছি আর রাতারাতি খান একাডেমি গড়ে তুলেছি। কিন্তু কেবল আমিই জানি সেই সময়গুলো কতটা কঠিন ছিল। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গিয়েছিল প্রায়। আমার তখন ৩২ বছর বয়স, একটি ছেলেও হয়েছে, বাড়ি কেনার জন্য ৩০-৪০ হাজার ডলার ডাউনপেমেন্ট দিতে হবে—এমন অনেক সমস্যা তখন আমাকে ঘিরে রেখেছে। সে সময় কেউ আমাকে দেখলে বলত আমি নির্ঘাত বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি। আমি আমার পরিবার নিয়ে অনেক সুন্দর একটা জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আর আমিই সবকিছু নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলেছি। সেই সময় একটা জিনিসই আমাকে একটু আশার আলো দেখাত, আর তা হলো অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা ভরা চিঠি। কিন্তু তার পরও, একটা পর্যায়ে আর চালাতে না পেরে আমি হতাশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলাম। যখন প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলাম সবকিছু ছেড়ে দেব, ঠিক তখনই আমার কাছে খান একাডেমির নামে ১০ হাজার ডলারের অর্থ পুরস্কার আসে। এর আগে বেশির ভাগ লোক পাঁচ কিংবা ১০ ডলার করে পাঠাত। সেটাই ছিল তখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় অঙ্কের টাকা। সেটি পাঠিয়েছিল এই রাইস বিশ্ববিদ্যালয়েরই

১৯৭৫ সালের ব্যাচের একজন, তার নাম অ্যান ডোয়ার। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ই-মেইল করি। সে কাছেই থাকত, একদিন দুপুরে আমরা এক রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে কথা বলছিলাম। অ্যান আমার কাছে জানতে চাইল আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। আমি বললাম, এখনকার মতো আমি সারাজীবন ধরে ভিডিও বানিয়ে যেতে চাই! আমি বলেই যাচ্ছিলাম এটা নিয়ে আমার কত স্বপ্ন, কত কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। কীভাবে খান একাডেমি সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থা বদলে দিতে পারে! সে বলল, 'বুঝলাম তোমার অনেক বড় পরিকল্পনা! কিন্তু তুমি নিজে চলছ কীভাবে?' আমি তখন বোধহয় একটু বেশি জোরেই বলে ফেলেছিলাম, 'আমার তো চলছে না!'

যাই হোক, আমার কথা শুনে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, আমরা বিদায় নিলাম। আমি যখন বাড়ির প্রায় কাছে পৌঁছে গেছি, তখন অ্যানের কাছ থেকে আমি একটি মেসেজ পাই। সেখানে লেখা, 'তোমার নিজেরও তো চলতে হবে, তাই আমি টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে এক লাখ ডলার করে দিচ্ছি।' আমি আরেকটু হলেই গাড়ি নিয়ে সোজা গ্যারেজে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলাম! সেই মুহূর্তে টাকার অঙ্কের চেয়েও বেশি সাহায্য করেছিল খান একাডেমির সম্ভাবনার ওপর অ্যানের গভীর আস্থা। আজকে এসব শুনে অনেকেই বলবে, অ্যানের অঢেল টাকা ছিল, তাই সে সাহায্য করতে পেরেছে। আমার অত টাকা-পয়সা নেই যে, কাউকে এক লাখ ডলার দান করে দিতে পারি। এখানেই আমার দ্বিমত। আমি অন্তত এমন ৫০ জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, যাদের আর্থিক অবস্থা অ্যানের চেয়েও অনেক ভালো ছিল। কিন্তু তারা তো এগিয়ে আসেনি!

একটা কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলব, যদি কখনো এমন অবস্থানে থাকো, যেখানে তোমার একটু সাহায্যে অন্যের অনেক বড় কোনো উপকার হতে পারে, তবে কখনো তাকে উপেক্ষা করো না। আমি সব সময় যা করতে চেষ্টা করি এবং অন্যদেরও করতে বলি, তা হলো কখনো যদি দেখ কেউ অসাধারণ কোনো কিছু করছে

কিংবা করার চেষ্টা করছে, চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। তাকে প্রশংসা করো, ধন্যবাদ জানাও, তার কাজের স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করো। তার বসকে জানাও কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। তার পরিবারকে জানাও কত বড় কাজ করছে সে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমার ছোট্ট একটি পদক্ষেপ, একটি প্রশংসা বাক্য কীভাবে একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। তোমার উৎসাহে কেউ হয়তো তার জীবনের লক্ষ্যই বদলে ফেলতে পারে। একজন ইতিবাচক চিন্তাধারার মানুষ তার চারপাশের অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তাই সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করো। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি তুমি তোমার স্বপ্ন সফল করতে চাও, সব সময়, সবকিছু থেকেই শিখতে চেষ্টা করো। নতুন কিছু শেখার জন্য নিজেকে সব সময় প্রস্তুত করে রাখা কতটা দরকার তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। তোমাদের সামনে যে সময় অপেক্ষা করছে, তা তোমরা শেখার জন্য বিনিয়োগ করো। আমি খান একাডেমির সঙ্গে আছি বলে মানুষ কীভাবে শিখতে শিখতে জীবন বদলে ফেলে, এ ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। ২০০৮ সালে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত একজন রোগীর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তখন তার জীবনের মেয়াদ আর মাত্র দুই মাস। কতখানি ইতিবাচক মনোভাব থাকলে মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষ লিখতে পারে, 'আমার অনেক দিনের শখ ছিল ক্যালকুলাস শিখব, এখন খান একাডেমি আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। আশা করি জীবনের শেষ দুই মাসের মধ্যেই আমি ক্যালকুলাস শিখে ফেলতে পারব!' কী অসাধারণ মানসিক শক্তি, কতখানি তীব্র শেখার ইচ্ছা। সেই চিঠি দেখার পর আমি ঠিক করেছি, যতদিন বেঁচে থাকি, কখনো শেখা থামাব না। ১৯৯৮ সালে আমি যখন তোমাদের মতো গ্র্যাজুয়েশন করি, তখন আমার কিছু কাজ নিয়ে একটা কম্পিউটার ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ ছাপা হয়। আমার সেটা নিয়ে খুবই গর্ববোধ হয়েছিল। কিন্তু আমার তেমন কোনো লক্ষ্য ছিল না।

নিজেকে নিয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণাই ছিল না যে, আসলে আমি কী করতে চাই। একটা চাকরি শুরু করার দুই মাসের মধ্যেই আমি আরও বেশি বেতনে আরেকটা চাকরি পাই, আর সেখানে চলে যাই। সেখানে প্রথম তিন দিনেই বস আমাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেন, আমি তাঁর চোখে কতটা অযোগ্য। ব্যাপারটা ভেবে দেখো! মাত্র ২৩ বছর বয়সে সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রি, ম্যাগাজিনে ছাপানো প্রশংসা, সবকিছু নিয়ে রাতের বেলা আবিষ্কার করলাম আমি হোটেল রুমে বসে বসে কাঁদছি। আমি জীবনে আসলেই কী করতে চাই তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সেই রাতে মনে হচ্ছিল চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলছে, সবকিছু অর্থহীন লাগছে। কিন্তু তার পরও পরদিন ভোরে উঠলাম, কাজ করলাম, গত রাতের চেয়ে একটু ভালো লাগল। এক সপ্তাহ পর আরেকটু মানিয়ে নিতে পারলাম, দুই মাসের মধ্যে আবার নতুন এক জায়গায় কাজ করা শুরু করলাম!

যখন সাফল্য আসবে, তাকে উপভোগ করো, কিন্তু এটাও খেয়াল রেখো, তুমি ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছ কি না। যতই বড় হও না কেন, মনে রেখো সবকিছুরই একটা শেষ আছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিও জ্বলতে জ্বলতে একদিন নিভে যাবেই। তাই ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত থেকে সাফল্যকে উদ্যাপন করো। ছোট ছোট খুশির বিষয়কে অবহেলা করো না, আবার দু-একবার হোঁচট খেলেও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পোড়ো না। এখন থেকে ১০-১৫ বছর পর হয়তো এগুলো মনে করেই তুমি হাসবে, ভাববে কী ছেলেমানুষই না ছিলাম!

জীবনকে, এখনকার সময়কে একটা অনন্য সুযোগ হিসেবে দেখো। সাফল্যের পেছনে যতই ছুটে চলো না কেন, এই মানবিক ব্যাপারগুলো ভুলে যেও না। প্রাণ খুলে হাসো। প্রিয়জনদের সময় দাও, তাদের বলো কতটা ভালোবাসো। চারপাশের মানুষের জন্য কিছু করো। মনে করো, এটা তোমার কল্পনা থেকে ফিরিয়ে আনা দ্বিতীয় জীবন। এ জীবন আফসোসের জন্য নয়।

সুমাইয়া কাজি (প্রভাবশালী উদ্যোক্তার

বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০ উদ্যোক্তা



বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রভাবশালী ৫০ উদ্যোক্তার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক তরুণী। নাম তাঁর সুমাইয়া কাজি। সম্প্রতি রয়টার্স ও ক্লাউট ওয়েবসাইট জগতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০ উদ্যোক্তার যে তালিকাটি প্রকাশ করে, সেখানে ১৬ নম্বরে আছেন সুমাইয়া।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স ও ক্লাউট সম্প্রতি বিশ্বের সেরা ৫০ উদ্যোক্তার যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সে তালিকায় ১৬ নম্বরে স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সুমাইয়া আন্দালিব কাজি। তবে ভাবার কারণ নেই, এটিই সুমাইয়ার সাফল্যের শুরু। সুমাইয়ার সাফল্যের শুরু বরং অনেক আগে, সেই ২০০৬ সালে। সে বছর বিজনেস উইক ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছিল অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী সেরা উদ্যোক্তাদের এক তালিকা। সে তালিকাতেও সগৌরবে স্থান করে নেয়েছিলেন সুমাইয়া। পেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অভিনন্দন। এ ছাড়া একই বছর উইক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিশ্বসেরা ৭৫ নারী উদ্যোক্তার মধ্যেও ছিলেন তিনি। পেয়েছেন সিএনএনের 'ইয়ং পারসন হু রকস' এবং কালার লাইট ম্যাগাজিনের সেরা তরুণ উদ্যোক্তা পুরস্কার। কিন্তু সুমাইয়ার উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প বেশ কয়েক বছর আগে থেকে। তখন ২০০৫ সাল। সুমাইয়া সবে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে থেকে মার্কেটিং অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং বিষয়ে উচ্চতর পড়ালেখা শেষ করে যোগ দিয়েছেন সানমাইক্রোসিস্টেমে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে। পাশাপাশি

শুরু করেছেন 'কালচারাল কানেক্ট ডট কম' (টিসিসিসি) নামের একটি অনলাইন মিডিয়া প্রতিষ্ঠার কাজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন সাপ্তাহিক 'দ্য দেশি কানেক্ট', 'দ্য মিডলইস্ট কানেক্ট', 'দ্য লাতিন কানেক্ট', 'দি এশিয়া কানেক্ট' ও 'দি আফ্রিকান কানেক্ট' নামের পাঁচটি অনলাইন ম্যাগাজিন। সময় গড়ায় আর সুমাইয়ার এ ম্যাগাজিনগুলোর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব ম্যাগাজিনের রয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার।

তবে এর মাঝেই সীমায়িত নয় সুমাইয়ার জগৎ। নিজের কর্মজগৎ বিস্তৃত করতে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সুমাজি ডট কম' (www.sumazi.com) নামের আরেকটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক মূলত সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে। অল্প সময়ের মধ্যে এই ওয়েবসাইট এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে সুমাইয়াকে দুটি দেশের আটটি অঙ্গরাজ্যের ১৮ সিটিতে স্থাপন করতে হয়েছে আলাদা অফিস। 'বাংলাদেশেও সুমাজি ডট কমের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ইচ্ছা আছে আমার। আশা করছি, এর মাধ্যমে অলাভজনকভাবে শিক্ষা, দুর্যোগ, চাকরিপ্রাপ্তি ও বিভিন্ন পরামর্শের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে অনেকেই।' ইউনাইটেড নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন সুমাইয়া।

শুরু থেকেই নিজের কাজের ওপর আস্থা থাকায় নিজের দলের সদস্যদেরও অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন সুমাইয়া। টেকক্রান্সের একটি কাজ দ্রুত এবং দারুণভাবে সম্পন্ন করার পর পেয়ে যান নিউজ এজেন্সি অমিদইয়ার নেটওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরামে আমন্ত্রিত হয়ে নারী উদ্যোক্তা বিষয়ে বক্তব্য দেন তিনি। এসব কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে মানবাধিকার, পরিবেশ, শিক্ষা, রক্তদানসহ নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবী কাজের সঙ্গেও যুক্ত আছেন প্রায় ১০ বছর ধরে। প্রতি সপ্তাহে একদল উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
আইডিয়ার বিষয়ে দিচ্ছেন পরামর্শ। এক সময়ে চাকরি করা প্রতিষ্ঠান সান মাইক্রোসিস্টেম সুমাইয়াকে 'সারা বিশ্বের সেরা ২৫ স্বেচ্ছাসেবক' তালিকার একজন নির্বাচিত করে। নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শুরুতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনজন কর্মী, যা বর্তমানে অর্ধশতাধিক হয়েছে। এখন স্বপ্ন দেখছেন আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

২.

সুমাইয়া কাজির পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ফেনী জেলায়। তবে জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। তবে কর্মসূত্রে এখন বসবাস করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে। বাবা ড. নিজাম উদ্দিন কাজি, মা মেরিনা কাজি। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সুমাইয়ার অবস্থান শীর্ষে। এখনো বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি সুমাইয়া। অবসর কাটে কীভাবে, এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'কাজই আমার অবসর।' আর কাজের প্রয়োজনেই ইতিমধ্যে আটবার বাংলাদেশে পা রেখেছেন সুমাইয়া। সর্বশেষ এসেছেন বছর দুয়েক আগে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। 'আগামী দু-এক বছরের মধ্যে আবারও বাংলাদেশে আসব আমি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলব এ দেশের নারীদের সঙ্গে। তাদের আমার কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করতে চাই।' বলেছেন সুমাইয়া কাজি ইউনাইটেড নিউজ টোয়েনটি ফোর ডট কমকে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

জাভেদ করিম(স্টিভ চেনের সঙ্গে মিলে ইউটিউব তৈরি করেন)

ঝুঁকি নাও, সফল হও



বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম ১৯৭৯ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালে সাদ হারলি ও স্টিভ চেনের সঙ্গে মিলে জাওয়াদ করিম জনপ্রিয় ভিডিও বিনিময় ওয়েবসাইট ইউটিউব তৈরি করেন। এই বক্তৃতা তিনি ২০০৭ সালের ১৩ মে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেন।

সবারই সম্ভবত ইউটিউব নিয়ে পছন্দ-অপছন্দের মিশ্র অনুভূতি আছে। কারণটা মনে হয় ইউটিউব নিজেই। একদিকে ইউটিউব যেমন প্রত্যেককে রাত জেগে নতুন সব ভিডিও দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়, রাতের পর রাত এসব ভিডিও দেখার কারণে ইউটিউব তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। আমি এ সুযোগে, ইউটিউবের কারণে যাদের সিজিপিএ গ্রেড কমে গেছে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। অনেকে হয়তো জেনে খুশিই হবে যে ইউটিউব তোমাদের থেকে আমার বেশি সময় নষ্ট করেছে! যে কারও থেকে বেশি সময় ভিডিও দেখার জন্য বেশি সময় নষ্ট হয়েছে। অনেকে খেয়াল করেছ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে যেসব বক্তা আসেন তাদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। খারাপ দিক হলো, বয়সের কারণে আমি তোমাদের জীবন সম্পর্কে গভীর কোনো দর্শনের ধারণা দিতে পারব না। না পারার কারণ হিসেবে বলা যায় আমি নিজেই

সেই ধারণা খুঁজে বেড়াচ্ছি।
ভালো দিক হলো তোমরা এবং আমি বয়সে একই প্রজন্মের। তার মানে দাঁড়ায়, আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যা শিখতে পেরেছি, তা এখনো প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। তিন বছর আগে আমি যে সুযোগ পেয়েছি, যেসব ধারণা প্রয়োগ করেছি তা তোমরা এখনো একইভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ ও সময় পাবে।
মিনেসোটার হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি পৃথিবীর প্রথম জনপ্রিয় ইন্টারনেট ওয়েব ব্রাউজার মোজাইকের কথা শুনি এবং ব্যবহারের সুযোগ পাই। আমি ম্যাপ নিয়ে ইলিনয় খুঁজে বের করি এবং খেয়াল করি জায়গাটা মিনেসোটা থেকে বেশি দূরে নয়। তখনই আমার মাথায় নতুন চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার যদি আমারই বাড়ির আঙিনার লোকজন উদ্ভাবন করে, তাহলে আমি অন্য কোথাও কেন যাব?
সেই সময় আমি কোনো চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমাকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হবে। আমি হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি।
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিলাম কর্তৃপক্ষের চিঠির জন্য। খুব দ্রুতই আমি উত্তর পাই, কিন্তু সে উত্তর ছিল আমার জন্য হতাশাজনক। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলা হয়, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে আমি ভর্তি হতে পারব না। ওই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়াতে আমার ভর্তির সুযোগ নেই। কিন্তু আমি সিরামিকস প্রকৌশল বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাব। আমি বলতে চাই না, সিরামিকস বা মৃৎশিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কিন্তু আমি তো এর জন্য আবেদন করিনি, স্বপ্ন দেখিনি। পুরোপুরি হতাশ হয়েছিলাম আমি। তো আমি তখন কী করতে পারি? আমি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখি এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করা যায় কি না তা জানতে চাই। আমি সেই চিঠিতে লিখেছিলাম, 'কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ থাকবে আমার আবেদনপত্রের কোনো বিষয়ই যেন উপেক্ষা না করা হয়। আমি নিশ্চয়তা দিতে

পারি আমি কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য আগ্রহী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'
আমার আবেদন পুনরায় বিবেচনা করা হয় এবং আমি কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পাই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আমার প্রথম শিক্ষা ছিল কোনো কিছুর প্রতি নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকলে তা চূড়ান্ত ফল আনবেই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরেই আমি এক প্রতিষ্ঠিত ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থ লেনদেনের কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাই। মনে হচ্ছিল, চাকরিটা আমার জন্য বড় একটা সুযোগ। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না পড়াশোনা বাদ দিয়ে কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করা ঠিক হবে কি না? আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে দুসপ্তাহ সময় নিই। পরে পড়াশোনায় বিরতি দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে পেপ্যাল সদর দপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার মতে, যখন ঝুঁকি গ্রহণের সুযোগ পাবে তা অবহেলা করো না।
২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে সুনামি আঘাত আনে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ধারণ করা সুনামির ভিডিওগুলো খুব দ্রুত গতিতে ইন্টারনেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ইন্টারনেটে কোনো সক্রিয় সাইট ছিল না, যেখান থেকে ভিডিওগুলো সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, দেখা যায়। এলোমেলোভাবে বিভিন্ন সাইটে অপরিকল্পিতভাবে ভিডিওগুলো সংরক্ষণ করা হয়, ভিডিও শেয়ার করার কোনো ভালো সাইট ছিল না। ই-মেইলেও সংযুক্ত করে ভিডিওগুলো পাঠানো যেত না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাকে প্রথমেই একটি ভিডিও প্লেয়ার ইন্সটল করতে হতো। ইন্সটলের পর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল বাড়ির লোকজনকে তা চালানো শেখানো। ইন্টারনেটে ভিডিও দেখার এই সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত সময় ছিল তখন। সুনামির দুই মাসের মধ্যেই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি ও পেপ্যালের দুজন সহকর্মী ভিডিও শেয়ার ও সংরক্ষণের একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা করি।
আমরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের দিনে কাজ

শুরু করি। ভ্যালেন্টাইনের দিন বলে কি কাজ বন্ধ থাকবে নাকি? এটাও তো অন্য একটা সাধারণ দিনের মতোই, তাহলে সেদিনই নয় কেন? ২৩ এপ্রিল ইউটিউব ডট কম নামের ওয়েবসাইট আমরা উন্মুক্ত করি। শুরুর দিকে আমাদের ওয়েবসাইট খুব কম জনই ব্যবহার করছে। অন্যদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমরা সাইটটিকে নতুন ধরনের ডেটিং সাইট বলে প্রচার করি। আমরা একটি স্লোগানও ঠিক করি: 'টিউন ইন, হুক আপ'। আমরা কিছু আসল ডেটিং ভিডিও দেখে হতাশ হয়ে উঠেছিলাম। তাই আমরা এখানে সব ধরনের ভিডিও আপলোডের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস ও লাস ভেগাসের মেয়েদের উৎসাহিত করলাম আমাদের সাইটে ভিডিও আপলোডের জন্য। আমরা প্রতি ভিডিওর জন্য তাদের ২০ ডলার পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করলাম। আমাদের এই ঘোষণায় কেউ সাড়া না দিলে পুরস্কার ঘোষণা মাঠে মারা যায়!
আমরা ওয়েবসাইট নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু করলাম। পরে জুন মাসেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক পরিবর্তন আনলাম। সাধারণ একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যেন সব ব্যবহারকারী খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে।
প্রতিষ্ঠার ১৮ মাসের মধ্যেই আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা আলোচিত হই। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা খবরের শিরোনাম হই। তাদের অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল, কীভাবে এ ধরনের আইডিয়া আমরা কোথা থেকে পেলাম। আমি তাদের সব সময় একটাই কথা বলি। চারদিকে সব সময়ই মেধাবী মানুষ থাকে, খুঁজে বের করতে হয় তাদের।
তোমরা যখন এই হল থেকে বের হয়ে যাবে, তখন একটা কথাই মনে রাখবে। পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে নতুন কোনো বড় উদ্যোগ সুযোগ সৃষ্টির জন্য। সবাইকে অভিনন্দন।
সূত্র: ওয়েবসাইট
ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: জাহিদ হোসাইন

www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিল গেটস(মাইক্রোসফট করপোরেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা)

যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালো



বিল গেটস বিশ্বের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট করপোরেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ৩৩ বছর পর ২০০৭ সালের ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ফিরে আসেন ডিগ্রি অর্জনকারীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়া এবং একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি গ্রহণের জন্য। তাঁর ভাষণের বড় অংশজুড়ে ছিল বৈশ্বিক দারিদ্র্য, রোগ-জীবাণুর মতো বিরাট সমস্যা মোকাবিলায় কীভাবে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের; বিশেষ করে তরুণদের সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়। তাঁর এ ভাষণের সংক্ষেপিত অনুবাদ ।

‘বাবা, আমি তোমাকে সব সময় বলেছি, আমি ফিরে আসব, ডিগ্রি অর্জন করব’—৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি অপেক্ষা করছি এই একটি কথা বলার জন্য।

অবশেষে আমার জীবনবৃত্তান্তে একটি কলেজ ডিগ্রি যুক্ত হলো। ব্যাপারটা দারুণ। আজকের ডিগ্রি অর্জনকারীরা আমার চেয়ে সোজা পথে হেঁটে তা অর্জন করেছেন। এ জন্য তাঁদের অভিনন্দন।

দৈনিক ক্রিমসন যে আমাকে ‘হার্ভার্ড থেকে ঝরে পড়া সবচেয়ে সফল’ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে, এতেই আমি খুশি। আমার মনে হয়, এই শব্দগুচ্ছ আমার সমগোত্রীয়দের মধ্যে আমাকে বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে...। যাঁরা ফেল করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালো করেছি।

কিন্তু আমি চাই, লোকে বলুক যে আমার কারণেই স্টিভ বালমার ঝরে পড়েছিলেন। আমার প্রভাব ‘অশুভ’। এ জন্য হয়তো আপনাদের সমাবর্তনে আমাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আপনাদের নবীনবরণের দিনে আমি বক্তৃতা দিলে হয়তো এখানকার অনেকেই আজ এখানে থাকতেন না।

আমার কাছে হার্ভার্ড এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। শিক্ষাজীবনটা ছিল আকর্ষণীয়। এমন অনেক ক্লাসে উপস্থিত হতাম, যেগুলো আমার ছিল না। ডরমিটরির জীবন ছিল দারুণ। সবাই জানতেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার তাড়া নেই আমার; তাই গভীর রাত অবধি বহুজন নানা বিষয়ে আলাপ জমাতেন আমার ঘরে। এমন করে আমি 'অসামাজিক' একদল ছাত্রের নেতা বনে গেলাম। হার্ভার্ডে আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত আসে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে। তখন আমি আলবুকুয়ের্কের এক কোম্পানিকে ফোন করে তাদের কাছে সফটওয়্যার বিক্রির প্রস্তাব করি। সেই সময় কোম্পানিটি পৃথিবীর প্রথম পারসোনাল কম্পিউটার (পিসি) তৈরি শুরু করেছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, তারা হয়তো বুঝে ফেলবে আমি এক ছাত্র আর ফোনটা রেখে দেবে। কিন্তু উল্টো বলল, 'আমরা এখনো প্রস্তুত নই, মাসখানেক পর খোঁজ নিন।' এতে বেশ ভালো হলো। কারণ, তখনো আমাদের সফটওয়্যারটির কাজ শেষ হয়নি। সেই মুহূর্ত থেকে আমি এ প্রকল্পে লেগে পড়ি। এর মধ্য দিয়ে আমার কলেজজীবনের শিক্ষার অবসান ঘটে। মাইক্রোসফটের যাত্রা শুরু হয়।

পৃথিবীতে কী সাংঘাতিক বৈষম্য আছে, সে সম্পর্কে সত্যিকারের কোনো ধারণা না নিয়েই হার্ভার্ড ছেড়েছি। স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুযোগের মর্মান্তিক বৈষম্যের কারণে কোটি কোটি মানুষ নৈরাশ্যের জীবনের দুর্ভোগ পোহায়, সে সম্পর্কে তখনো আমি সচেতন হয়ে উঠিনি।

অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন অনেক চিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে হার্ভার্ডে। বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু মানবজাতির মহত্তম অগ্রগতি কোনো আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত নয়, বরং বৈষম্য কমাতে এসব আবিষ্কার কেমন কাজে লাগে সেটাই বড় কথা। গণতন্ত্র, শক্তিশালী গণশিক্ষা, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা বা বিস্তৃত অর্থনৈতিক সুযোগ—যেভাবেই হোক, বৈষম্য দূর করা হলো সর্বোচ্চ মানবিক অর্জন।

লাখ লাখ তরুণ যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, এ কথা না জেনেই আমি ক্যাম্পাস ছেড়েছি। আমি তখনো জানতাম না, উন্নয়নশীল

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দেশগুলোতে লাখ লাখ মানুষ অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও রোগে ভোগে।
এসব জানতে আমার কয়েক দশক লেগেছে। এখন সময় পাল্টেছে। বিশ্বের বৈষম্য সম্পর্কে আজকের তরুণেরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি জানেন। আশা করি, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে কেমন করে এসবের মোকাবিলা করবেন, সমাধান করবেন—তা চিন্তা করার সুযোগ পান।
আমাদের যে সম্পদ আছে তা দিয়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোত্তম কাজটা কীভাবে করতে পারব—এ বিষয়ে কথাবার্তার সময় মেলিন্ডা ও আমি গরিব দেশগুলোতে হাম, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, হেপাটাইটিস বি এবং ইয়েলো ফিবারের মতো কিছু রোগে প্রতিবছর লাখ লাখ শিশুর মৃত্যুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়ি। আর রোটা ভাইরাসের কথা তো আমি আগে কখনো শুনিনি। এই রোগে প্রতিবছর পাঁচ লাখ লোক মারা যাচ্ছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা শূন্য।
আমরা দুঃখ পেলাম। এই লাখ লাখ শিশুর এমন মৃত্যু রোধ করার জন্য ওষুধ আবিষ্কার ও পৌঁছে দেওয়াকে অগ্রাধিকার হিসেবে নেওয়া দরকার; কিন্তু তা হয়নি। প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান হলে কিছু জীবন বাঁচানো অন্য জীবনের তুলনায় মূল্যবান হিসেবে দেখা অত্যন্ত দুঃখজনক।
নিজেদের মধ্যে কথা হয়, 'এটা হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে যদি তা-ই হয়, তবে এ জায়গাটিই আমাদের দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।'
আমাদের তখন প্রশ্ন, বিশ্ব কেমন করে এসব শিশুদের মরতে দেয়? উত্তরটা সরল ও রূঢ়। বাজার এসব শিশুর জীবন রক্ষার কোনো পুরস্কার দেয় না, আর সরকারও এতে ভর্তুকি দেয় না। তাই এসব শিশু মারা যাচ্ছে। আমরা নানা মানবিক বিপর্যয় দেখেছি, এই সব বিপর্যয়ে মন ভেঙে গেছে কিন্তু তবুও আমরা কিছু করিনি।
আমরা এগুলোকে পরোয়া করিনি এমন নয়, আসলে কী করব তা জানি না বলেই এমন হয়। যদি জানতাম কেমন করে সাহায্য করা যায়, তাহলে আমরা সক্রিয় হতাম।
অতি জটিলতা পরিবর্তন ঘটানোর পথে প্রতিবন্ধকতা। কম পরোয়া করা নয়।
অন্যের প্রতি দরদকে সক্রিয়তায় রূপ দিতে দরকার সমস্যাকে দেখতে পারা, সমাধান দেখতে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

পারা এবং প্রভাব দেখতে পারা। কিন্তু এই তিন পদক্ষেপকেই রুদ্ধ করে জটিলতা। ইন্টারনেট এবং ২৪ ঘণ্টা সংবাদের অগ্রগতি সত্ত্বেও সত্যিকারে সমস্যাকে দেখতে পারার প্রক্রিয়াটি এখনো জটিল। ঠেকানো সম্ভব, এমন লাখ লাখ মৃত্যু নিয়ে আমরা খুব বেশি পড়ার সযোগ পাই না। গণমাধ্যম ব্যস্ত থাকে নতুনের খোঁজে। লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে এটা তো নতুন নয়। তাই পশ্চাৎপটেই থেকে যায়, যা খুব সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। কোনো দুর্দশার পরিস্থিতি যদি এমন জটিল হয় যে কেমন করে আমরা সহায়তা করব, তা না জানি; তাহলে সেই দুর্দশা দেখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। আর তাই আমরা দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিই।

সত্যি সত্যি কোনো সমস্যা দেখতে পারার কাজটি প্রথম পদক্ষেপ, পরের পদক্ষেপ জটিলতা অতিক্রম করে কোনো একটা সমাধানের খোঁজ করা। অন্যের প্রতি আমাদের দরদকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়ার জন্য সমাধান খুঁজে বের করা অপরিহার্য। কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি কেমন করে সহায়তা করতে পারে, এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট ও প্রামাণিক জবাব থাকলে আমরা সক্রিয়তা দেখতে পারি। কিন্তু নানা জটিলতা এমন সব দরদির জন্য সক্রিয়তার পথ চিহ্নিত করার কাজটিকে কঠিন করে তোলে।

জটিলতা অতিক্রম করে সমাধানে পৌঁছার পথটি চার স্তরের—লক্ষ্য স্থির করা, সবচেয়ে কার্যকর উপায় খুঁজে বের করা, সেই উপায়ের জন্য আদর্শ প্রযুক্তি আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে প্রযুক্তি রয়েছে, সেগুলোর জুতসই ব্যবহার করা। এই প্রযুক্তি কোনো ওষুধের মতো জটিল বা মশারির মতো সরলও হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এইডস মহামারির কথা বলা যায়। বড় অর্থে আমাদের লক্ষ্য এই রোগ নির্মূল করা। সবচেয়ে কার্যকর উপায় এ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক। আদর্শ প্রযুক্তি হবে কোনো ওষুধ, যার এক মাত্রা প্রয়োগে সারা জীবনের জন্য এ রোগ হবে না। তাই সরকার, ওষুধ কোম্পানি ও সংস্থাগুলো ওষুধ গবেষণায় অর্থ প্রদান করে। কিন্তু তাদের কাজ সম্পন্ন হতে এক দশকেরও বেশি সময় লাগতে পারে, এ সময়ে আমাদের হাতে যা আছে তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে—আর এখন আমাদের

হাতে সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক উপায় হলো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা।
এ লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো কখনো কাজ ও চিন্তা না থামানো আর জটিলতার কাছে হার না মানা।
শেষ পদক্ষেপটি হলো কর্মকাণ্ডের প্রভাব পরিমাপ এবং সাফল্য-ব্যর্থতা অন্যকে অবহিতকরণ, যাতে এই প্রচেষ্টা থেকে অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে।
পরিসংখ্যান অবশ্যই খুব জরুরি। কতজন শিশু কোন কর্মসূচির আওতায় ওষুধ পেল, কোন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কত কমল—এসব তথ্য যেমন কর্মসূচিতে উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রয়োজন, তেমনি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্যও অপরিহার্য।
কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হলে শুধু সংখ্যার উপস্থাপন করলেই চলবে না। কাজের মানবিক প্রভাবটাও প্রকাশ করতে হবে, যেন অনুভব করা যায় আক্রান্ত পরিবারের কাছে একটি জীবন কতটা মূল্যবান।
কয়েক বছর আগে দাভোসে একটি বিশ্ব স্বাস্থ্য প্যানেলের সদস্য হিসেবে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে আলোচনা হচ্ছিল কেমন করে লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়। লাখ লাখ! মাত্র একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর কথাটা ভাবুন। এবার লাখ লাখ দিয়ে গুণ করুন...। তবু এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ক্লান্তিকর প্যানেল।
একটি সফটওয়্যারের ত্রয়োদশ সংস্করণ বাজারে ছাড়ার অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। এই অনুষ্ঠানে লোকজন উত্তেজনায় লাফাচ্ছিল, চিৎকার করছিল। সফটওয়্যার নিয়ে উত্তেজনা আমাকে আনন্দিত করে। কিন্তু জীবন বাঁচানো নিয়ে আমরা কেন আরও বেশি উত্তেজনা তৈরি করতে পারি না?
তবু আমি আশাবাদী। হ্যাঁ, বৈষম্য সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু জটিলতা নিরসনের নতুন উপাদানগুলো আমাদের ছিল না। আর এ জন্যই অতীত থেকে ভবিষ্যত্ ভিন্নতর হয়। চরম দারিদ্র্যের অবসান ও প্রতিষেধনক্ষম রোগ থেকে মৃত্যু বন্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে বর্তমান সময়ের জৈবপ্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বিস্তৃতি।
৩০ বছর আগে আমার সহপাঠীরা পাস করে বেরোনোর সময় এমন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছিল, যা বিশ্বকে ক্রমাগত ছোট, অধিকতর মুক্ত, অধিকতর দৃশ্যমান, কম দূরত্বের করে তুলছিল।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
স্বল্প-ব্যয়ের পারসোনাল কম্পিউটার শক্তিশালী এক নেটওয়ার্কের উত্থান ঘটায়, যা শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটায়। দূরত্ব কমিয়ে সবাইকে পরস্পরের প্রতিবেশী করে তোলার জাদুকরী ক্ষমতা এই নেটওয়ার্কের।

পাশাপাশি এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ব্যবহারকারীর পাঁচ গুণ। বহু মানুষ প্রযুক্তি হাতে না থাকার ফলে তাদের প্রতিভা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে না। সম্ভবপর সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে এই প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা দরকার। কারণ, মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক এই অগ্রগতি এক বিপ্লবের সূত্রপাত করছে।

আপনাদের সবাই কাজের সময় নিজেকে প্রশ্ন করুন, বড় সমস্যাগুলোর সমাধানে সবচেয়ে মেধাবীদের নিয়োজিত করা উচিত নয় কি? সবচেয়ে সুবিধাভোগীদের কি উচিত নয় সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সম্পর্কে জানা? এগুলো শুধু প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন নয়—এসবের উত্তর আপনাদের নীতিগত অবস্থানের মাধ্যমে দিতে হবে।

আমার মা আমাকে সব সময় অন্যদের জন্য কাজ করার ব্যাপারে চাপ দিতেন। আমার বিয়ের কদিন আগে এক অনুষ্ঠানে মেলিন্ডাকে লেখা তাঁর একটি চিঠি তিনি সশব্দে পড়ে শোনান। তখন আমার মা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে খুব অসুস্থ। অন্যদের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দেওয়ার এ সুযোগটি তিনি কাজে লাগালেন। চিঠিটির শেষে তিনি বললেন, 'যাদের অনেক দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশাও অনেক।'

এখানে সমবেতদের যা দেওয়া হয়েছে—প্রতিভায়, সুযোগে, সুবিধায়; সে বিবেচনায় তাদের বা আমাদের কাছে সীমাহীন প্রত্যাশা করার অধিকার বিশ্বের রয়েছে। ডিগ্রি অর্জনকারী প্রত্যেককে আমি বলব, কোনো একটি বিষয় বেছে নিন, কোনো জটিল সমস্যা, কোনো গভীর অন্যায্যতা এবং সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুন। এটা আপনার পেশাজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলে তা হবে এক বিশাল ঘটনা।

জটিলতা যেন আমাকে থামাতে না পারে। কর্মী হয়ে উঠুন। বড় ধরনের বৈষম্য নিয়ে কাজ করুন। সেটা হয়ে উঠবে আপনার জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতা।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
এক আকর্ষণীয় সময়ে আপনাদের বেড়ে ওঠা। আপনাদের কাছে এমন প্রযুক্তি, যা আমাদের ছিল না। আপনারা বৈষম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আমরা ছিলাম না। এই সচেতনতার সঙ্গে আপনাদের হয়তো আছে সচেতন বিবেক: আপনার সামান্য প্রচেষ্টায় বহু মানুষের জীবন বদলে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু আপনি সে চেষ্টা বাদ দিলে আপনাকে তা দংশন করবে। অনেক বেশি কিছু আছে আপনাদের। জলদি শুরু করুন, চালিয়ে যান আরও দীর্ঘ সময়।

আর আমার আশা, এখন থেকে ৩০ বছর পর আপনি হার্ভার্ডে ফিরে এসে বলবেন, আপনার প্রতিভা আপনার শক্তি দিয়ে আপনি কী করলেন। আশা করি, শুধু পেশাগত সাফল্য দিয়ে নয়, বরং বিশ্বের গভীরতর অসমতাকে আপনি কেমন করে মোকাবিলা করেছেন তা দিয়েও নিজেকে মূল্যায়ন করবেন... এক দুনিয়ার ওপারের মানুষেরা—মনুষ্যত্ব ছাড়া আপনার সঙ্গে যাদের অন্য কোনো মিল নেই, তাদের আপনি কেমনভাবে দেখেছেন, তার ভিত্তিতে নিজেকে বিচার করবেন।

আপনাদের মঙ্গল হোক।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

স্টিভ জবস (অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা)

ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো



স্টিভ জবস বিশ্বখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল ও অ্যানিমেশন স্টুডিও পিক্সারের (টয় স্টোরি, ফাইন্ডিং নিমো, মনস্টার ইনকরপোরেটেড, ওয়াল-ই, আপ-এর মতো অসাধারণ অ্যানিমেশন তৈরি করেছেন) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ২০০৫ সালে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন স্টিভ জবস। সে বছর ১২ জুন এক ঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যে ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটি সত্যিই অসাধারণ।

প্রথমেই একটা সত্য কথা বলে নিই। আমি কখনোই বিশ্ববিদ্যালয় পাস করিনি। তাই সমাবর্তন জিনিসটাতেও আমার কখনো কোনো দিন উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। এর চেয়ে বড় সত্য কথা হলো, আজকেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সবচেয়ে কাছে থেকে দেখছি আমি। তাই বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। কোনো কথার ফুলঝুরি নয় আজ, স্রেফ তিনটা গল্প বলব আমি তোমাদের। এর বাইরে কিছু নয়।

আমার প্রথম গল্পটি কিছু বিচ্ছিন্ন বিন্দুকে এক সুতায় বেঁধে ফেলার গল্প।

ভর্তি হওয়ার ছয় মাসের মাথাতেই রিড কলেজে পড়ালেখায় ক্ষ্যান্ত দিই আমি। যদিও এর পরও সেখানে আমি প্রায় দেড় বছর ছিলাম, কিন্তু সেটাকে পড়ালেখা নিয়ে থাকা বলে না। আচ্ছা, কেন আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লাম?

এর শুরু আসলে আমার জন্মেরও আগে। আমার আসল মা ছিলেন একজন অবিবাহিত তরুণী। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাকে এমন কারও কাছে দত্তক দেবেন, যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। সিদ্ধান্ত হলো এক আইনজীবী ও তাঁর স্ত্রী আমাকে দত্তক নেবেন। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ওই দম্পতির কারোরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই, বিশেষ করে আইনজীবী ভদ্রলোক কখনো হাইস্কুলের গণ্ডিই পেরোতে পারেননি। আমার মা তো আর কাগজপত্রে সই করতে রাজি হন না। অনেক ঘটনার পর ওই দম্পতি প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁরা আমাকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন, তখন মায়ের মন একটু গলল। তিনি কাগজে সই করে আমাকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। এর ১৭ বছর পরের ঘটনা। তাঁরা আমাকে সত্যি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বোকার মতো বেছে নিয়েছিলাম এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যার পড়ালেখার খরচ প্রায় তোমাদের এই স্ট্যানফোর্ডের সমান। আমার দরিদ্র মা-বাবার সব জমানো টাকা আমার পড়ালেখার পেছনে চলে যাচ্ছিল। ছয় মাসের মাথাতেই আমি বুঝলাম, এর কোনো মানে হয় না। জীবনে কী করতে চাই, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা এ ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য করবে, সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। অথচ মা-বাবার সারা জীবনের জমানো সব টাকা এই অর্থহীন পড়ালেখার পেছনে আমি ব্যয় করছিলাম। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মনে হলো যে এবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সিদ্ধান্তটা ভয়াবহ মনে হলেও এখন আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়, এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিগ্রির জন্য দরকারি কিন্তু আমার অপছন্দের কোর্সগুলো নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারলাম, কোনো বাধ্যবাধকতা থাকল না, আমি আমার

আগ্রহের বিষয়গুলো খুঁজে নিতে লাগলাম। পুরো ব্যাপারটিকে কোনোভাবেই রোমান্টিক বলা যাবে না। আমার কোনো রুম ছিল না, বন্ধুদের রুমের ফ্লোরে ঘুমোতাম। ব্যবহৃত কোকের বোতল ফেরত দিয়ে আমি পাঁচ সেন্ট করে কামাই করতাম, যেটা দিয়ে খাবার কিনতাম। প্রতি রোববার রাতে আমি সাত মাইল হেঁটে হরেকৃষ্ণ মন্দিরে যেতাম শুধু একবেলা ভালো খাবার খাওয়ার জন্য। এটা আমার খুবই ভালো লাগত। এই ভালো লাগাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রিড কলেজে সম্ভবত দেশে সেরা ক্যালিগ্রাফি শেখানো হতো সে সময়। ক্যাম্পাসে সাঁটা পোস্টারসহ সবকিছুই করা হতো চমৎকার হাতের লেখা দিয়ে। আমি যেহেতু আর স্বাভাবিক পড়ালেখার মাঝে ছিলাম না, তাই যে কোনো কোর্সই চাইলে নিতে পারতাম। আমি ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেরিফ ও স্যান সেরিফের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে স্পেস কমানো-বাড়ানো শিখলাম, ভালো টাইপোগ্রাফি কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখলাম। ব্যাপারটা ছিল সত্যিই দারুণ সুন্দর, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা আর্ট। আমি এর মধ্যে মজা খুঁজে পেলাম।

এ ক্যালিগ্রাফি জিনিসটা কোনো দিন বাস্তবজীবনে আমার কাজে আসবে—এটা কখনো ভাবিনি। কিন্তু ১০ বছর পর আমরা যখন আমাদের প্রথম ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার ডিজাইন করি, তখন এর পুরো ব্যাপারটাই আমার কাজে লাগল। ওটাই ছিল প্রথম কম্পিউটার, যেটায় চমৎকার টাইপোগ্রাফির ব্যবহার ছিল। আমি যদি সেই ক্যালিগ্রাফি কোর্সটা না নিতাম, তাহলে ম্যাক কম্পিউটারে কখনো নানা রকম অক্ষর (টাইপফেইস) এবং আনুপাতিক দূরত্বের অক্ষর থাকত না। আর যেহেতু উইন্ডোজ ম্যাকের এই ফন্ট সরাসরি নকল করেছে, তাই বলা যায়, কোনো কম্পিউটারেই এ ধরনের ফন্ট থাকত না। আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় না ছাড়তাম, তাহলে আমি কখনোই ওই ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হতাম না এবং কম্পিউটারে হয়তো কখনো এত সুন্দর ফন্ট থাকত না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক

সুতায় বাঁধা অসম্ভব ছিল, কিন্তু ১০ বছর পর পেছনে তাকালে এটা ছিল খুবই পরিষ্কার একটা বিষয়। আবার তুমি কখনোই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে এক সুতায় বাঁধতে পারবে না। এটা কেবল পেছনে তাকিয়েই সম্ভব। অতএব, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একসময় ভবিষ্যতে গিয়ে একটা অর্থবহ জিনিসে পরিণত হবেই। তোমার ভাগ্য, জীবন, কর্ম, কিছু না কিছু একটার ওপর তোমাকে বিশ্বাস রাখতেই হবে। এটা কখনোই আমাকে ব্যর্থ করেনি, বরং উল্টোটা করেছে।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি ভালোবাসা আর হারানোর গল্প।

আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম। কারণ, জীবনের শুরুতেই আমি যা করতে ভালোবাসি, তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার বয়স যখন ২০, তখন আমি আর ওজ দুজনে মিলে আমাদের বাড়ির গ্যারেজে অ্যাপল কোম্পানি শুরু করেছিলাম। আমরা পরিশ্রম করেছিলাম ফাটাফাটি, তাই তো দুজনের সেই কোম্পানি ১০ বছরের মাথায় চার হাজার কর্মচারীর দুই বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হয়। আমার বয়স যখন ৩০, তখন আমরা আমাদের সেরা কম্পিউটার ম্যাকিন্টোস বাজারে ছেড়েছি। এর ঠিক এক বছর পরের ঘটনা। আমি অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুত হই। যে কোম্পানির মালিক তুমি নিজে, সেই কোম্পানি থেকে কীভাবে তোমার চাকরি চলে যায়? মজার হলেও আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাপল যখন বড় হতে লাগল, তখন কোম্পানিটি ভালোভাবে চালানোর জন্য এমন একজনকে নিয়োগ দিলাম, যে আমার সঙ্গে কাজ করবে। এক বছর ঠিকঠাকমতো কাটলেও এর পর থেকে তার সঙ্গে আমার মতের অমিল হতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ তার পক্ষ নিলে আমি অ্যাপল থেকে বহিষ্কৃত হলাম। এবং সেটা ছিল খুব ঢাকঢোল পিটিয়েই। তোমরা বুঝতেই পারছ, ঘটনাটা আমার জন্য কেমন হতাশার ছিল। আমি সারা জীবন যে জিনিসটার পেছনে খেটেছি, সেটাই আর আমার রইল না।

সত্যিই এর পরের কয়েক মাস আমি দিশেহারা অবস্থায় ছিলাম। আমি ডেভিড প্যাকার্ড ও বব নয়েসের সঙ্গে দেখা করে পুরো ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইলাম। আমাকে তখন সবাই চিনত, তাই এই চাপ আমি আর নিতে পারছিলাম না। মনে হতো, ভ্যালি ছেড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম, আমি যা করছিলাম, সেটাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। চাকরিচ্যুতির কারণে কাজের প্রতি আমার ভালোবাসা এক বিন্দুও কমেনি। তাই আমি আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথমে মনে না হলেও পরে আবিষ্কার করলাম, অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুতিটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ঘটনা। আমি অনেকটা নির্ভার হয়ে গেলাম, কোনো চাপ নেই, সফল হওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি রকমের কৌশল নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। আমি প্রবেশ করলাম আমার জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল অংশে। পরবর্তী পাঁচ বছরে নেক্সট ও পিক্সার নামের দুটো কোম্পানি শুরু করি আমি, আর প্রেমে পড়ি এক অসাধারণ মেয়ের, যাকে পরে বিয়ে করি। পিক্সার থেকে আমরা পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার অ্যানিমেশন ছবি টয় স্টোরি তৈরি করি, আর এখন তো পিক্সারকে সবাই চেনে। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল অ্যানিমেশন স্টুডিও। এরপর ঘটে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা। অ্যাপল নেক্সটকে কিনে নেয় এবং আমি অ্যাপলে ফিরে আসি। আর লরেনের সঙ্গে চলতে থাকে আমার চমৎকার সংসার জীবন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এগুলোর কিছুই ঘটত না, যদি না অ্যাপল থেকে আমি চাকরিচ্যুত হতাম। এটা ছিল খুব বাজে, তেতো একটা ওষুধ আমার জন্য, কিন্তু দরকারি। কখনো কখনো জীবন তোমাকে ইটপাটকেল মারবে, কিন্তু বিশ্বাস হারিয়ো না। আমি নিশ্চিত, যে জিনিসটা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আমি যে কাজটি করছিলাম, সেটাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম। তোমাকে অবশ্যই তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পেতে হবে, ঠিক যেভাবে তুমি তোমার

ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে বের করো। তোমার জীবনের একটা বিরাট অংশজুড়ে থাকবে তোমার কাজ, তাই জীবন নিয়ে সত্যিকারের সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন কাজ করা, যে কাজ সম্পর্কে তোমার ধারণা, এটা একটা অসাধারণ কাজ। আর কোনো কাজ তখনই অসাধারণ মনে হবে, যখন তুমি তোমার কাজটিকে ভালোবাসবে। যদি এখনো তোমার ভালোবাসার কাজ খুঁজে না পাও, তাহলে খুঁজতে থাকো। অন্য কোথাও স্থায়ী হয়ে যেয়ো না। তোমার মনই তোমাকে বলে দেবে, যখন তুমি তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পাবে। যেকোনো ভালো সম্পর্কের মতোই, তোমার কাজটি যতই তুমি করতে থাকবে, সময় যাবে, ততই ভালো লাগবে। সুতরাং খুঁজতে থাকো, যতক্ষণ না ভালোবাসার কাজটি পাচ্ছ। অন্য কোনোখানে নিজেকে স্থায়ী করে ফেলো না।

আমার শেষ গল্পটির বিষয় মৃত্যু।

আমার বয়স যখন ১৭ ছিল, তখন আমি একটা উদ্ধৃতি পড়েছিলাম—'তুমি যদি প্রতিটি দিনকেই তোমার জীবনের শেষ দিন ভাব, তাহলে একদিন তুমি সত্যি সত্যিই সঠিক হবে।' এ কথাটা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং সেই থেকে গত ৩৩ বছর আমি প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করি—আজ যদি আমার জীবনের শেষ দিন হতো, তাহলে আমি কি যা যা করতে যাচ্ছি, আজ তা-ই করতাম, নাকি অন্য কিছু করতাম? যখনই এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কয়েক দিন 'না' হতো, আমি বুঝতাম, আমার কিছু একটা পরিবর্তন করতে হবে। পৃথিবী ছেড়ে আমাকে একদিন চলে যেতে হবে, এ জিনিসটা মাথায় রাখার ব্যাপারটাই জীবনে আমাকে বড় বড় সব সিদ্ধান্ত নিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। কারণ, প্রায় সবকিছুই যেমন, সব অতি প্রত্যাশা, সব গর্ব, সব লাজলজ্জা আর ব্যর্থতার গ্লানি—মৃত্যুর মুখে হঠাত্ করে সব নেই হয়ে যায়, টিকে থাকে শুধু সেটাই, যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কিছু হারানোর আছে—আমার জানা মতে, এ চিন্তা

দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, সব সময় মনে রাখা যে একদিন তুমি মরে যাবে। তুমি খোলা বইয়ের মতো উন্মুক্ত হয়েই আছ। তাহলে কেন তুমি সেই পথে যাবে না, যে পথে তোমার মন যেতে বলছে তোমাকে?

প্রায় এক বছর আগের এক সকালে আমার ক্যানসার ধরা পড়ে। ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই আমার। প্রায় নিশ্চিতভাবে অনারোগ্য এই ক্যানসারের কারণে তাঁরা আমার আয়ু বেঁধে দিলেন তিন থেকে ছয় মাস। উপদেশ দিলেন বাসায় ফিরে যেতে। যেটার সোজাসাপটা মানে দাঁড়ায়, বাসায় গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। এমনভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করো, যাতে পরিবারের সবার জন্য বিষয়টা যথাসম্ভব কম বেদনাদায়ক হয়।

সারা দিন পর সন্ধ্যায় আমার একটা বায়োপসি হলো। তাঁরা আমার গলার ভেতর দিয়ে একটা এন্ডোস্কোপ নামিয়ে দিয়ে পেটের ভেতর দিয়ে গিয়ে টিউমার থেকে সুঁই দিয়ে কিছু কোষ নিয়ে এলেন। আমাকে অজ্ঞান করে রেখেছিলেন, তাই কিছুই দেখিনি। কিন্তু আমার স্ত্রী পরে আমাকে বলেছিল, চিকিৎসকেরা যখন এন্ডোস্কোপি থেকে পাওয়া কোষগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে পরীক্ষা করা শুরু করলেন, তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। কারণ, আমার ক্যানসার এখন যে অবস্থায় আছে, তা সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। আমার সেই সার্জারি হয়েছিল এবং দেখতেই পাচ্ছ, এখন আমি সুস্থ।

কেউই মরতে চায় না। এমনকি যারা স্বর্গে যেতে চায়, তারাও সেখানে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মরতে চায় না। কিন্তু মৃত্যুই আমাদের গন্তব্য। এখনো পর্যন্ত কেউ এটা থেকে বাঁচতে পারেনি। এমনই তো হওয়ার কথা। কারণ, মৃত্যুই সম্ভবত জীবনের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। এটা জীবনের পরিবর্তনের এজেন্ট। মৃত্যু পুরোনোকে ঝেড়ে ফেলে 'এসেছে নতুন শিশু'র জন্য জায়গা করে দেয়। এই মুহূর্তে তোমরা হচ্ছ নতুন, কিন্তু খুব বেশি দিন দূরে নয়, যেদিন তোমরা পুরোনো হয়ে যাবে এবং তোমাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আমার অতি নাটুকেপনার জন্য দুঃখিত, কিন্তু এটাই

আসল সত্য।
তোমাদের সময় সীমিত। কাজেই কোনো মতবাদের ফাঁদে পড়ে, অর্থাত্ অন্য কারও চিন্তাভাবনার ফাঁদে পড়ে অন্য কারও জীবনযাপন করে নিজের সময় নষ্ট কোরো না। যাদের মতবাদে তুমি নিজের জীবন চালাতে চাচ্ছ, তারা কিন্তু অন্যের মতবাদে চলেনি, নিজের মতবাদেই চলেছে। তোমার নিজের ভেতরের কণ্ঠকে অন্যদের শেকলে শৃঙ্খলিত করো না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজের মন আর ইনটুইশনের মাধ্যমে নিজেকে চালানোর সাহস রাখবে। ওরা যেভাবেই হোক, এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে, তুমি আসলে কী হতে চাও। এ ছাড়া আর যা বাকি থাকে, সবই খুব গৌণ ব্যাপার।
আমি যখন তরুণ ছিলাম, তখন দি হোল আর্থ ক্যাটালগ নামের অসাধারণ একটা পত্রিকা প্রকাশিত হতো; যেটা কিনা ছিল আমাদের প্রজন্মের বাইবেল। এটা বের করতেন স্টুয়ার্ড ব্র্যান্ড নামের এক ভদ্রলোক। তিনি তাঁর কবিত্ব দিয়ে পত্রিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। স্টুয়ার্ট ও তাঁর টিম পত্রিকাটির অনেক সংখ্যা বের করেছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, আমার বয়স যখন ঠিক তোমাদের বয়সের কাছাকাছি, তখন পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিদায়ী সেই সংখ্যার শেষ পাতায় ছিল একটা ভোরের ছবি। তার নিচে লেখা ছিল—ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এটা ছিল তাদের বিদায়কালের বার্তা। ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এবং আমি নিজেও সব সময় এটা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আজ তোমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে আরও বড়, নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, আমি তোমাদেরও এটা মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো।
তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

চলে যাওয়া মানে রেখে যাওয়া

পৃথিবীর অন্যসব মানুষের তুলনায় স্টিভ জবস বেঁচে ছিলেন কম সময়। মাত্র ৫৬ বছর। জবস পাল্টে দিয়েছেন মানবসভ্যতার তিনটি 'C'—কীভাবে মানুষ 'Connect', 'Communicate' ও 'Consume' করে। অথচ টাকা-পয়সার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারেননি। আরেক স্টিভ, স্টিভ ওজনিয়াকের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাপল ইনকরপোরেট!

ঢাকার আগারগাঁওয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে পুরোনো দিনের মেইন ফ্রেম কম্পিউটার দেখা যায়। ঢাউস কম্পিউটারগুলো দেখলে বোঝা যায়, একসময় কম্পিউটার কেমন ছিল! আর এখন তো আমাদের পকেটেই কম্পিউটার থাকে! সাভারের পরমাণু শক্তি কমিশনে এই অঞ্চলের প্রথম কম্পিউটারটি বসানো হয়েছিল সেই ষাটের দশকে। সেটির আকার ছিল একটি কক্ষের সমান।

অ্যাপল কম্পিউটার শুরু করার পর স্টিভ জবসের কাজ ছিল বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে বেড়ানো। পলো আলটোতে জেরক্স কোম্পানির একটি গবেষণাগারে জবস প্রথম এমন একটা বস্তু দেখেন, যা এখন মাউস নামে পরিচিত। দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর দেখতে পাওয়া মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, এই ছোট্ট যন্ত্র এবং এর সঙ্গে কম্পিউটারের পর্দায় ছবি দিতে পারলেই সাধারণ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে। সেটি ছিল ম্যাকিন্টোশ কম্পিউটারের চিন্তা। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে পর্দায় ছবি আর মাউস নিয়ে ম্যাকের আবির্ভাবের পর থেকে পাল্টে গেছে কম্পিউটারের জগৎ।

সব মুদ্রারই অপর পিঠ থাকে। ১৯৮৫ সালে ছেড়ে দিতে হয় অ্যাপল। একটি রেখে অ্যাপলের সব শেয়ার বিক্রি করে দেন তিনি। হাতে ২০ কোটি ডলার নিয়ে শুরু করেন নতুন যাত্রা—নেক্সট নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মের অপারেটিং সিস্টেম বানানো। জবসের উদ্দেশ্য ছিল, কম্পিউটারকে নানা রকম অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে মানুষে মানুষে সংযুক্তি আর যোগাযোগ হয় সহজসাধ্য এবং সর্বজনীন। সে সময় আকস্মিকভাবে তিনি যুক্ত হন পিকচার নামের একটি অ্যানিমেশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। জবসের হাত ধরে পিকচার থেকে সূচিত

হয় অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র। এখানে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীর। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ গভীরে ঢোকার বৈশিষ্ট্যই পিকচারের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে অনেকখানি। সে কারণে টয় স্টোরির গল্প শুধু গল্পই থাকে না, হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের বাঁকবদলের ক্ষণ।

অন্যদিকে নেক্সটের ফলাফল নিয়ে ১৯৯৭ সালে প্রবলভাবে অ্যাপলে ফিরে আসেন জবস। শুরু হয় অ্যাপলের নবযাত্রা। আইম্যাক, আইপড, আইফোন কিংবা আইপ্যাড—সবটাতেই আমরা জবসের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমটি হলো অতৃপ্তি! জবস সব সময় একটি সম্পূর্ণ পণ্য তৈরি করতে চান। শুরু থেকে জবসের গভীরে ঢোকার অভ্যাস ছিল। সেটিই পূর্ণতা পায় দ্বিতীয়বার অ্যাপলে এসে।

জবসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল—ব্যবহারকারীর হাত আর চোখ দিয়ে পণ্যকে বিচার করা। এ কারণে সব ধরনের নতুন পণ্য তিনি ব্যবহার করতেন। ভাবতেন, কীভাবে বিষয়গুলো আরও সহজ করা যায়। আইফোনে যদি কোনো সুইচ না থাকত, তাহলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কিন্তু প্রকৌশলীরা তাঁকে বুঝিয়েছেন, কমপক্ষে একটি সুইচ বা বাটন থাকা অপরিহার্য।

অ্যাপল স্টোর চালুর পর ইকোনমিস্ট পত্রিকায় শিরোনাম করে, 'দুঃখিত স্টিভ। তোমার ম্যাজিক এখানে কাজে লাগবে না।' কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছানোয় স্টিভ ম্যাজিক অনেক বেশি মাইলেজ দিয়েছে অ্যাপলকে।

গ্যারেজ থেকে উঠে আসা অ্যাপল ইনকরপোরেটেড বাজার মূলধন এখন ইন্টেল আর মাইক্রোসফটের সম্মিলিত বাজার মূলধনের চেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাপী অ্যাপলের রয়েছে কয়েক লাখ কর্মী। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, অ্যাপল তার মিউজিক স্টোরের মাধ্যমে বিশ্বের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এখন নিজেদের দিন বদলের রাস্তা খুঁজে নিচ্ছেন।

স্টিভ জবসের জন্ম না হলে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দাদের অনেকেরই কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করা সম্ভব হতো না

ভিন্ট কার্ফ (ইন্টারনেটের উদ্ভাবক)

সবার জন্য ইন্টারনেট



ভিন্ট কার্ফকে বলা হয়ে থাকে ইন্টারনেটের উদ্ভাবক। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ভিন্ট কার্ফ ১৯৪৩ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের কানিক্টিকাটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালের ৭ এপ্রিল, ইন্টারনেট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে 'স্পিচ টু কম্পিউটারস, ফ্রিডম অ্যান্ড প্রাইভেসি কনফারেন্স'-এ তিনি এই বক্তব্য দেন। ইন্টারনেট সবার জন্য। কথাটা বলা আসলে যতটা সহজ, কিন্তু এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ঠিক ততটা সহজ নয়। সবার আগে বুঝতে হবে এই লক্ষ্যে আমরা কত দূর এগিয়েছি। সামনের দিনগুলোতে হয়তো ইন্টারনেটের অনেক চাহিদা তৈরি হবে টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও, সংবাদপত্র থেকে শুরু করে সব গণমাধ্যমে। তখন তথ্য আর শুধু কিছু মানুষের হাতের নাগালে থাকবে না, সবার কাছে সব তথ্য পৌঁছে যাবে নিমেষেই। ইন্টারনেট কোনো তথ্য বা সাধারণ কোনো বার্তাকে যেভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে আর কোনো মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। ইন্টারনেট আসলে কাজ করে মেগা ফোনের মতো, প্রয়োজনমতো সামান্য শব্দও ছড়িয়ে দিতে পারে ব্যাপক আকারে। গণতন্ত্র চর্চাকে আরও বেশি বিকশিত করছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোটও দেওয়া সম্ভব এখন। সামাজিকতাকেও নতুন মাত্রা দিয়েছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ নিজের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারছে সারা বিশ্বে, গবেষণার জন্য যা খুব বেশি জরুরি। ইন্টারনেট আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে পাড়ি জমিয়েছে অন্তরিক্ষে। নাসা ল্যাবরেটরিতে মঙ্গল অভিযানের বাহন নিয়ে কাজ চলছে। এই কাজ ইন্টারনেট ছাড়া সম্ভব নয়।

সবার জন্য ইন্টারনেট- তত দিন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যত দিন না আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমাতে পারব। কারণ ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খরচ একটা অনেক বড় বাধা। সে জন্য আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে ইন্টারনেটের খরচ কমিয়ে আনার জন্য।

সবার জন্য ইন্টারনেট- এটা শুধু তখনই সম্ভব যখন সব দেশের সরকার এই ইন্টারনেটের ব্যবহারের ওপর থেকে সব ধরনের আইনি বাধা তুলে নেবে। ইন্টারনেট হবে নিরবচ্ছিন্ন ও বাধামুক্ত। মানুষ হিসেবে আমাদের সবার কথা বলার ও কথা শোনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- সম্ভব হবে না যদি আমরা এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না উঠতে পারি। এ জন্য ইন্টারনেট সেবাদাতাদের আরও সচেতন হতে হবে দ্রুত কারিগরি উন্নয়নের জন্য। এ জন্য ইন্টারনেট আর্কিটেকচার বোর্ড, ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টিয়ারিং গ্রুপ, ইন্টারনেট রিসার্চ টাস্কফোর্স এবং ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্কফোর্সকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে সবাইকে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- বাস্তব রূপ পাবে না যতক্ষণ না সারা বিশ্বের মানুষের ঘরে ঘরে, সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছবে। আমি স্বপ্ন দেখি, এমন একটা দিন আসবে যেদিন কোনো বাধা ছাড়াই যেকোনো সময়, যে কেউ, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে, যেকোনো ভাষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- এই প্রয়াস ব্যর্থ হবে যদি না ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হয়। ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টা সবাইকে জানতে হবে। নিরাপদ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। প্রযুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যেন প্রযুক্তির মাধ্যমেই ইন্টারনেটের

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ব্যবহার নিরাপদ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত করা যায়। ইন্টারনেটকে এই স্থানে নিয়ে যেতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সবার জন্য ইন্টারনেট- তখন পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিভাবক ও শিক্ষকেরা নিজেরা যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন এর যাবতীয় ব্যবহার সম্পর্কে। অভিভাবক ও শিক্ষকদের জানতে হবে ইন্টারনেটের সীমাহীন বিশাল জগতের সব কিছুই কিন্তু শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে ইন্টারনেটে যা কিনা শিশুর জন্য মোটেই উপযোগী নয়। শিশুদের অনুপযোগী বিষয়গুলো যেন শিশুরা ব্যবহার না করে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। শিশুদের জন্য যেকোনো ধরনের শঙ্কামুক্ত, নিরাপদ ইন্টারনেট জগৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

সবার জন্য ইন্টারনেট- বাস্তব করতে হলে আমাদের আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। ইন্টারনেটকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মতো করে চিন্তা করতে হবে। আমরা যেমন নিজের সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট থাকি, ঠিক তেমনটিই করতে হবে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও। এমন কিছু মানুষ আছে যারা ইন্টারনেটের অপব্যবহার করতে চেষ্টা করে সব সময়। তারা ইন্টারনেট অপব্যবহার করে আমাদের বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হতে হবে। আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা সে সব দুষ্কৃতকারীদের সহজেই শাস্তির আওতায় আনতে পারি।

আমি আশা করি সারা দুনিয়ার সব ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়ার মিশনে ইন্টারনেট সোসাইটি এবং এ ধরনের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগ দেবেন। নতুন দিনের আমাদের সব কাজের বাহন হবে ইন্টারনেট। এর চেয়ে দারুণ আর কী হতে পারে বলুন!

তবে মনে রাখবেন, সবার জন্য ইন্টারনেট— তত দিন পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যত দিন না আমরা নিজেরা এটাকে সম্ভব করব।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

টিম বার্নাস লি (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের /www জনক)

বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়



স্যার টিম বার্নাস লি ১৯৫৫ সালের ৮ জুন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ) জনক। তাঁর কারণেই আজ আমরা ঘরে বসেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দুনিয়া চষে বেড়াতে পারি

১৯৮০ সালের দিকে আমি তখন সুইজারল্যান্ডের ইউওএনআরে কাজ করতাম। ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চে (ইউওএনআর) আমার কাজ ছিল তথ্য বিভাগে। ওখানকার কাজটা যে খুব কঠিন ছিল, তা নয়, কিন্তু তবু আমি মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়ে যেতাম। কারণ, দেখা যেত একই ধরনের সমস্যা নিয়ে একই ধরনের তথ্য জানতে চাইছে সবাই। বারবার একই প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা খুবই একঘেয়েমি ছিল। কিন্তু ওই একঘেয়েমি থেকেই আসলে নতুন এক ইতিহাসের শুরু হয়েছিল। হাজারো বার একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজতাম আমি সব সময়। তখন আমার মাথায় প্রথম আসে, এমনটা যদি হতো যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে না এসে বা আমাদের ফোন না করে, ঘরে বসেই যদি সব তথ্য পাওয়া যায় বা সব প্রশ্নের উত্তর মেলে, তাহলে মন্দ হয় না।

অনেক প্রতিষ্ঠানই লিফলেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করত। সে ক্ষেত্রে বারবার নতুন লিফলেট ছাপতে হতো। যার মানে সময়, অর্থ—দুইয়ের অপচয়। এতে আসলে শেষ পর্যন্ত সমস্যা কমে না বাড়ে, সেটা বোঝাও দায়।

এসব চিন্তা করতে করতেই আমার মনে হলো, এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য একটা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারবে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা, তাহলে তা দারুণ হয়। এভাবেই ১৯৮৯ সালের দিকে আমার প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের নিয়ে আমি তৈরি করে ফেলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা সংক্ষেপে ওয়েব।

অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করার সময় ওখানকার নেটওয়ার্ক প্রিন্টার হ্যাক করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম একবার, তখন আমার শাস্তিও হয়েছিল। কিন্তু সেই শাস্তিও আমাকে যেন আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেল। আমার মনে ইচ্ছা করতে থাকল, আমার যদি নিজের একটা কম্পিউটার থাকে, তাহলে মন্দ হয় না। তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমি একটা করাতকলে কাজ করছিলাম। ওখানে ক্যালকুলেটরের মতো একটা বড় অকেজো যন্ত্র খুঁজে পেলাম একদিন। এরপর করাতকলের মালিকের অনুমতি নিয়ে ওই অকেজো যন্ত্রটা নিজের বাসায় নিয়ে এলাম। ওই ক্যালকুলেটরের বোতাম সব তুলে ফেলে কম্পিউটারের মতো বোতাম লাগিয়ে ফেললাম খুব সহজেই। এরপর কম্পিউটারের মনিটরের জন্য একটা পুরোনো টিভির দোকানে গেলাম। গিয়ে মাত্র পাঁচ পাউন্ড দিয়ে একটা টিভি কিনে ফেললাম। এরপর অক্সফোর্ডের এক বন্ধুর কাছ থেকে টিভি কীভাবে কাজ করে, সেটা বুঝে নিয়ে ওই যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলাম, আর তাতেই আমি পেয়ে গেলাম আমার নিজের একটা কম্পিউটার। তখন সবাই অবাক হতো আমার কাণ্ড দেখে। তবে এসব ব্যাপারে আমি কখনোই আটকাইনি।

আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন গণিতবিদ। আমরা ছিলাম চার ভাই। আমি ছিলাম সবার বড়। আমরা সব জায়গায়ই গণিতের মজা খুঁজে ফিরতাম। একটা পুডিং বানাতে গেলেও গণিতের হিসাব-নিকাশ করতাম মজা করার জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়কার কথা। অন্যরা যখন দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াত, আমরা তিন বন্ধু তখন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা

করতাম। চুম্বক নিয়ে মজার কাণ্ড ঘটাতে চাইতাম। সেই ছোট্ট বয়সেই আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমরা বিজ্ঞান নিয়ে একটা বই লিখব। বইটা যেহেতু হবে গবেষণামূলক, তাই বিভিন্ন বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করার জন্য আমাদের বাসার পেছনে মাটির নিচে একটা গবেষণাগার বানানোর চিন্তাও এসেছিল আমাদের মাথায়!

সায়েন্স ফিকশন পড়ার অভ্যাস আমার খুব ছোটকাল থেকেই। আর্থার সি ক্লার্ক, আগাথা ক্রিস্টি, জন উইন্ডহ্যাম ছিলেন আমার প্রিয় লেখক। আমি যখন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আমাদের স্কুলটা ছিল দুই রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। তখন স্টেশনে ট্রেন থামলেই আমি খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করতাম ট্রেনের ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিগুলো। আমার মনে হয়, ছোটবেলার এসব অভিজ্ঞতাই আজ আমাকে বিজ্ঞানী বানিয়েছে।

অনেকে আমাকে বলে, আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্যবহার করে অনেক বড়লোক হতে পারতাম। আমি নিজেও সেটা জানি। আমি যদি আমার আবিষ্কার সবার জন্য উন্মুক্ত না করে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমি আজ অনেক পয়সা কামাতে পারতাম, রাজকীয় জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ওয়েব এভাবে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারতাম না। আমি সব সময় চেয়েছি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যেন দুনিয়ার সব মানুষের কাজে আসে। আর তা আজ সত্যি হয়েছে। ওয়েব এখন আর শুধু কয়েকটি কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক নয়, ওয়েব এখন অসংখ্য মানুষের নেটওয়ার্ক। আমি চাই না মানুষ আমাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উদ্ভাবক হিসেবে মনে রাখুক। আমি চাই, সবাই আমাকে মনে রাখুক একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই। আমি একজন সাদাসিধে কম্পিউটার প্রোগ্রামার ছিলাম, আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলাম, যেটা মানুষের কাজে লেগেছিল। এবং আমি যদি সেই প্রোগ্রামটা তৈরি না করতাম, তাহলে অন্য কোনো মানুষ করত সেটা।

সূত্র: ইন্টারনেট। ইংরেজি থেকে অনূদিত।

মার্ক জুকারবার্গ(ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা

২৬ বছরেই বিশ্বসেরা মার্ক জাকারবার্গ



বাদামি চুলের ২৬ বছর বয়সী এক যুবক। কথাবার্তা কিংবা চলনে-বলনে তাঁকে আর দশজন থেকে আলাদা করে ঠাওর করা যায় না। সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর জীবনযাপন। মার্ক জাকারবার্গ নামের এ যুবকটিই টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে এ বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হয়েছেন।

ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্কের জন্ম নিউইয়র্কের হোয়াইট প্লেইনসে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে। মনোবিজ্ঞানী মা এবং দন্তবিশেষজ্ঞ বাবার একমাত্র ছেলে মার্ক শৈশব থেকেই প্রোগ্রামিংয়ের দারুণ ভক্ত। দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাটত তাঁর কম্পিউটারের সামনে। আর্ডসলে হাইস্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন মার্ক। ফেঞ্চ, হিব্রু, লাতিন ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন অল্প সময়ের মধ্যে। শুরুর দিকে পড়াশোনার বিষয় হিসেবে বেছে নেন সাহিত্য। তবে প্রোগ্রামিংই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। বাবাও এ ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করতেন না। শিক্ষক ডেভিড নিউম্যানের কাছে কম্পিউটার পাঠ নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে পরিপক্ক করে তোলেন মার্ক। করতে থাকেন নানা রকম গেম তৈরি এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের উন্নতির কাজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে এ চর্চা বেড়ে যায় আরও কয়েক গুণ। এ সময় তাঁর পড়াশোনার বিষয় ছিল কম্পিউটার বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। পড়াশোনার বাইরে প্রোগ্রাম তৈরির কাজেই নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখতেন মার্ক। এ সময় তাঁর তৈরি দুটি প্রোগ্রামের নাম কোর্টম্যাচ

ও ফেইসম্যাস। ফেইসম্যাসের কাজ ছিল ভোট দিয়ে হার্ভার্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিক্ষার্থী নির্বাচিত করা। প্রোগ্রামটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও মার্ককে হতে হয় সমালোচনার শিকার। অনেকেই বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করতে শুরু করে অন্যের ছবি। মার্ক শুধু এ দুটো প্রোগ্রাম তৈরি করেই থেমে থাকেননি। হার্ভার্ড থেকে বিতাড়িত এ যুবক ভাবেন এমন একটি সাইটের কথা, যেখানে মানুষ নিজেদের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে খুব সহজেই। নিজেদের ভাবনা, সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলতে পারবে বন্ধুদের সঙ্গে। অবলীলায় বিনিময় করতে পারবে নানা তথ্য। পরিচিত হবে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে। একে অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেবে বন্ধুত্বের হাত। এমন সব ভাবনা থেকেই ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম ফেসবুকের। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম সেরা এ সাইটটির ব্যবহারকারির সংখ্যা এখন ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ। প্রতিদিনই গড়ে এক লাখ ৫০ হাজার মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট খুলে যোগ দেয় ফেসবুকে। এ সংখ্যাটা বেড়েই যাচ্ছে দিনকে দিন। ২০০৯ সালে এর রাজস্ব আয় ছিল ৮০ কোটি ডলার। এই অর্থের বেশির ভাগই এসেছে বিজ্ঞাপন এবং নানা ধরনের গেম থেকে। মার্ক লাল ও সবুজ রঙের ফারাক বুঝতে পারেন না। তাই ফেসবুককে সাজাতে তিনি নীল রংই বেছে নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কম বয়সী বিলিয়নিয়র মার্ক জাকারবার্গ। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬৯০ কোটি ডলার। এক সময়ের সহজ-সরল এ মানুষটিই এখন তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। তাই ২০১০ সালের অক্টোবরে তাঁর জীবনের ওপর ভিত্তি করে ডেভিড ফিঞ্চারের পরিচালনায় নির্মিত হয় চলচ্চিত্র দি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী এ মেধাবী যুবককে তুলনা করা হয় বিল গেটসের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে আচরণ ও মেধার দিক থেকে রয়েছে দারুণ মিল। মানবসেবায়ও মার্কের রয়েছে দারুণ অবদান। শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সাহায্য করে যাচ্ছেন নিজের সাধ্যমতো। শিক্ষার

উন্নতির জন্য নিউইয়র্ক পাবলিক স্কুলকে দিয়েছেন ১০০ মিলিয়ন ডলার। ফেসবুকের ২৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে মার্কের দখলে। ইয়াহুর ফেসবুককে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েও এ সাইটটি নিয়ে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন মার্ক জাকারবার্গ। ফেসবুকের উন্নতির জন্য একদল মেধাবী কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তাঁরা এর ব্যবহারকারীদের দিচ্ছেন নিত্যনতুন সুযোগ-সুবিধা। তরুণেরা সফল হয়ে উঠুক নিজেদের কাজ দিয়ে—এটাই তাঁর চাওয়া। মার্কের অগ্রযাত্রা কখন শেষ হবে তা জানা নেই কারও। বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব এ যুবকের এগিয়ে যাওয়ার গতিটা দেখে এমনটা কল্পনা করাও হবে অনুচিত।

কাজকে ভালোবেসেই এত দূর জুকারবার্গ



গল্পের শুরু ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তাঁর বয়স তখন ২০ বছর, ছাত্র। ঠিক চার বছর পর সেই ছেলেটিকে টাইম ম্যাগাজিন ঘোষণা করল দুনিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী তরুণ হিসেবে। ফোর্বস-এর প্রতিবেদনে তাঁকে বলা হলো নিজ উদ্যোগে হয়ে ওঠা তরুণ ধনকুবেরদের মধ্যে তিনিই 'ইয়াঙ্গেস্ট বিলিয়নিয়ার'। কলেজের হোস্টেল কক্ষ থেকে একটি কম্পিউটার নিয়ে যে উদ্যোগ তিনি শুরু করেছিলেন, তার বদৌলতেই তিনি মালিক হন দেড় শ কোটি ডলারের। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা তরুণ মার্ক এলিয়ট জুকারবার্গ। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী।

২০০৮ সালে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জুকারবার্গ বলেছিলেন, 'অনেক আগে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবস একটি

বক্তৃতায় বলেছিলেন, ুযা করছ তা ভালোবেসে করো।” এই একটি কথাই হয়তো আমার জীবনটাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যখন যা করি আমার মন থেকে করি, আমার পুরোটা দিয়ে করি। সেটা ফেসবুকের শুরু থেকেই।’
ফেসবুক অনেক পরে আলোর মুখ দেখলেও এমন একটা কিছু করার স্বপ্নটা তাঁর ছেলেবেলাতেই ছিল। যদিও এটা নিয়ে ব্যবসা হবে, তা ভাবেননি তিনি। জুক একবার স্কুল পরিবর্তন করার সময় সেই স্কুলের সব শিক্ষার্থীকে একটা স্মরণিকা দেওয়া হয়েছিল। স্মরণিকাটির নাম ‘ফেসবুক’। এখানে সবার ছবি ও যোগাযোগের ঠিকানা ছিল। তখনই জুকারবার্গ অনুধাবন করেন, তাঁর ছেড়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ কতটা প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন থেকেই স্বপ্নের শুরু। মাথায় গেঁথে যায় ‘ফেসবুক’।
স্কুলজীবনের মাঝামাঝি থেকেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতেন জুকারবার্গ। স্কুলের পাট চুকানোর আগেই তিনি হয়ে উঠলেন দুর্দান্ত পিএইচপি প্রোগ্রামার। কাজ করতেন কম্পিউটার গেম ও যোগাযোগের টুকিটাকি নিয়ে। দুষ্টুমি করে আরেকটা কাজ করতেন তিনি—কম্পিউটার হ্যাকিং। তবে যোগাযোগের বিষয় নিয়ে তাঁর ঝোঁকটা ছিল সবচেয়ে বেশি। ওই সময়ই তিনি তাঁর বাবার অফিসে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে দেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডের ছাত্র তখন তিনি। হোস্টেলের কক্ষেই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ফেসবুকের কাজ শুরু করেন। সামনে পরীক্ষা। বন্ধুরা জুকারের পাগলামি ছেড়ে চোখ ডোবালেন বইয়ে। কিসের পরীক্ষা, জুক ফেসবুক নিয়েই আছেন। প্রথমেই হোস্টেলের প্রতিবেশী কক্ষের শিক্ষার্থী এবং পরে কলেজের আরও কয়েকজন সদস্য হলেন ফেসবুকের। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তাঁর পাগলামির কথা। মাত্র দুই সপ্তাহে হার্ভার্ডসহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলল ভিন্ন মাত্রার এই সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট। শুরুতে ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক করার পরিকল্পনা থাকলেও

জুক বুঝতে পারলেন, এর চাহিদা আছে। ফেসবুক উন্মুক্ত হলো সবার জন্য। গল্পের পরের অংশটা সবার জানা। ফেসবুকে এখন সক্রিয় সদস্য ৪০ কোটি। প্রতিদিন নতুন করে নাম লেখাচ্ছে গড়ে ১৫ লাখ সদস্য। ২০০৭ সালে ২৪ কোটি ডলারে ফেসবুকের ১ দশমিক ৬ শতাংশ মালিকানা কেনে মাইক্রোসফট, তখন ফেসবুকের দাম উঠেছিল দেড় হাজার কোটি ডলার।

এই দাম এক দিনে ওঠেনি। ফেসবুক যখন শুরুর দিকে তখন থেকেই আকর্ষণীয় দামে কেনার প্রস্তাব দেন অনেকে। জুকারবার্গ তাঁর লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। জুকারবার্গ বলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নে আস্থা ছিল। আর আমি কাজটা ভালোবাসতাম। ফেসবুক বিফল হলেও আমার ভালোবাসাটা থাকত। জীবনে একটা স্বপ্ন থাকতে হয়, সেই স্বপ্নকে ভালোও বাসতে হয়।'

অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্ভাবনা বাড়ায়



ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৯৮৪ সালের ১৪ মে। তিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে চালু করেন সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তিনি লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। ফোর্বস সাময়িকী ঘোষিত ৩০-এর কম বয়সী সফল ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছে (২০১১) জাকারবার্গের নাম।

ফেসবুক নিয়ে আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে আরও উন্মুক্ত, আরও সংযুক্ত করা। ব্যাপারটা এমন, যখন মানুষ তার কাছের সব

মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর পুরো প্রক্রিয়াটা এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যে তারা নিজেদের মনের সব কথা, নতুন চিন্তাচেতনা তার চোখে প্রিয় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে। ফলে অসংখ্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। মানুষ নতুন জিনিস শিখবে, তার চারপাশে ঘটে যাওয়া নতুন ঘটনা, নতুন প্রযুক্তি, নতুন গান, সিনেমা—সবকিছু নিয়েই ভাববিনিময় হবে। মানুষ যখন একে অন্যের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করবে, তখন একটা বিশাল সম্ভাবনার সূচনা হবে। তাই আমাদের ফেসবুক মিশনের একটা বড় অংশ ছিল কীভাবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংযুক্ত করতে পারি। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে ৮০ কোটির বেশি মানুষ এখন ফেসবুক ব্যবহার করছে। প্রতি মাসেই এ সংখ্যা বাড়ছে। যদি সাত বছর আগের কথা চিন্তা করেন, যখন আমরা শুরু করেছিলাম—তখন আজকের এই অবস্থান আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

মজার বিষয় হলো, আমি যখন কলেজে ছিলাম, আমরা বন্ধুরা মিলে এসব নিয়েই কথা বলতাম। আমরা প্রতি রাতে পিৎজা খেতে যেতাম আর আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতাম। ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা ভাবতাম, ভবিষ্যতে হয়তো এমন কিছু একটা আসবে, যেটা দিয়ে মানুষ তার কাছের মানুষের সঙ্গে সহজেই ভাববিনিময় করতে পারবে, যেটা একটা সামাজিক নেটওয়ার্কের মতো হবে। আমরা ভাবতাম, এ রকম নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য নতুন কোনো প্রযুক্তি আসবে। আশ্চর্যের কথা হলো, আমরা নিজেরাই সেই সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরিতে বিশাল অবদান রাখতে পেরেছি।

সব মানুষেরই নিজেকে প্রকাশ করার একটা অন্তর্নিহিত ইচ্ছা থাকে। সব সময়ই। এটা মানুষের একটা অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলা চলে। আপনার বন্ধু বা কাছের মানুষদের জীবনে কী ঘটছে বা আপনার প্রিয় মানুষটির চারপাশের বিষয়গুলো আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেন, তাই না? যেসব মানুষ সম্পর্কে আপনি আগ্রহ দেখান

বা যাঁদের নিয়ে দেখান না, সবাই কোনো না কোনোভাবে আপনার সামাজিক বৃত্তে আবদ্ধ। ফেসবুক আসার আগে আপনি তাঁদের সম্পর্কে খুব বেশি একটা কিছু জানতেন না। ভেবে দেখুন, গত পাঁচ বছরে সামাজিক যোগাযোগ কতটা সহজ হয়েছে। এখন আপনি দ্রুত বুঝতে পারছেন কোন জিনিসটা জানা জরুরি। নতুন গান, নতুন ভালো সিনেমা দেখতে পারছেন; আপনার বন্ধুরা কী দেখেন সেটাও জানতে পারছেন। সব মিলিয়ে আপনার নিজের জীবনযাপনের ধরনই পাল্টে যাচ্ছে। এই সেবাগুলো সামনের দিনগুলোতে আরও পাল্টে যাবে, পাঁচ বছর পরে এই সেবার কতটা উন্নতি হবে, সেটা ভাবতেই আমি শিহরিত হই।

আমি মনে করি, মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর। এখানে কোনো নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা বলা যায় না। আমরা আমাদের ফিচারগুলো এমনভাবে তৈরি করছি, যাতে আপনি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সেই ছোট ছোট গ্রুপের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ রাখতে পারেন। ৩০ থেকে ৪০ কোটি মানুষ তাদের কিছু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবারের জন্য হলেও ফেসবুক ব্যবহার করে। আর পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সবার সঙ্গে শেয়ার করার মতো উপায়ও এখন আমরা দিচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি সব ধরনের প্রয়োজন মেটাতে।

আমার অনেক বন্ধুর ছোট ভাইবোন এখন হাইস্কুল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাদের জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হলো, প্রোগ্রামিং শেখার চেষ্টা করো। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে শুধু প্রকৌশলীদেরই নয়, প্রায় সব পেশাতেই কিছু না কিছু প্রোগ্রামিংয়ের জ্ঞান দরকার হবে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন একজন কম্পিউটার প্রকৌশলীর বেতন যা ছিল, তা এখন ৫০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণও হয়েছে। অর্থনীতির ধরন বদলে যাচ্ছে আর প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যারভিত্তিক কোম্পানিগুলোই সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ফেসবুক শুরুর গল্পের দুটো ব্যাপার উল্লেখ করার মতো। এটা নিয়ে আমার বড়সড় কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার টাকা-পয়সাও তেমন ছিল না। আমি আক্ষরিক অর্থেই আমার ডরমিটরির রুমে বসে ফেসবুকের কোড লিখেছিলাম। ওখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল ফেসবুক। মাত্র ৮৫ ডলারে আমি সার্ভার ভাড়া নিয়েছিলাম আর সে ভাড়াও দিতাম একটা বিজ্ঞাপন থেকে। পুরো ব্যাপারটারই শুরু খুব ছোট্ট একটা চিন্তা থেকে। তারপর আস্তে আস্তে সেটা বড় হয়ে উঠেছে। তাই আমি বলব, দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করা, যাঁরা নিজেদের ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবেন। আর দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তাগুলোকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া। ঐতিহ্যগতভাবেই যুক্তরাষ্ট্র এ দুটো দিকেই খুব ভালো। এ দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নতুন কিছু করার ঝুঁকি নিতে উৎসাহ ও স্বাধীনতা দিয়েছে।

আপনি কি এভাবে চিন্তা করেছেন, আপনি প্রতিদিন যা যা করেন, সব কাজের মধ্যে কোন কোন কাজ আরও আনন্দ নিয়ে, ভালোভাবে করা যায়, যখন আপনি সেগুলো অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে করেন? নিশ্চয় সব নয়, কিন্তু অনেকগুলোই করেন। আমরা মনে করি, ঠিক এই জায়গাটাতেই ফেসবুক ভূমিকা রাখতে পারে। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে আপনি আপনার চারপাশের বন্ধুরা কে কী করছে তা দেখতে পারেন। আমরা ফেসবুককে এভাবেই গড়ে তুলছি।

ফেসবুকের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, আমরা গ্রাহকদের ব্যাপারে সেই তথ্যগুলোই জানি, যা তাঁরা জানাতে চান। বেশির ভাগ মানুষই নিজের সবকিছু শেয়ার করতে চান না, কিন্তু তাঁদের হাতে যদি সেই নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় যে তাঁরা শুধু তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে, অথবা পরিবারের সঙ্গে, অথবা খুব সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, তবে তাঁরা সেটাই করেন।

মানুষের শেখার একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। যখন সামাজিক যোগাযোগ প্রথম শুরু হলো, কিছু

www.facebook.com/tanbir.ebooks
মানুষ খুব অল্প তথ্য অনেক বিস্তৃত আকারে প্রচার করত। আমি মনে করি, ফেসবুকের জনপ্রিয়তার এটাও একটা কারণ। ফেসবুকের 'প্রাইভেসি অপশন' এখন সবাই ব্যবহার করছে এবং ফেসবুকই প্রথম কোম্পানি, যারা এ ধরনের প্রাইভেসি চালু করেছে, যাতে কিছু বিষয় আপনি শুধু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন অথবা আপনার ছুটির ছবিগুলো শুধু আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।

ফেসবুক ব্যবহারকারীদের আচরণও কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে। আমরা হার্ভার্ডে ছোট পরিসরে যেটা শুরু করেছিলাম, সেটাই এখন ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ ব্যবহার করছে। এর মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কম্পিউটারে শুধুই ফেসবুক ব্যবহার করেন, কম্পিউটার চালনায় তাঁরা খুব দক্ষ নন। এ ধরনের মানুষের পক্ষে ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রাইভেসি কন্ট্রোলের পদ্ধতি বোঝাটা বেশ কঠিন। তাই আমরা কয়েক বছর ধরে এটাকে এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে আপনি যা-ই শেয়ার করুন তার প্রাইভেসি সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই ঠিক করে দেওয়া যায়। আপনি যদি এটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে সেখানে একটি গ্লোব আসে, যাতে 'পাবলিক' কথাটি লেখা থাকে এবং আপনি যদি অল্প কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করেন, তাহলে সেটিতে 'ফ্রেন্ডস' কথাটি লেখা থাকে। এবং মাত্র একটি ক্লিকেই আপনি এই অপশনটি যেকোনো পোস্টের জন্য যেকোনো সময় পরিবর্তন করতে পারেন।

আমি মনে করি, কাজ করা এবং শেখার বেলায় আপনি যত বেশি মানুষের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন, আপনার শেখার মাত্রাও তত বাড়বে। আমার মনে হয়, এটাই সব সময় সত্যি। আমি ফেসবুককে সচল রাখার জন্য সবকিছুই করি আর নিজের জীবনযাপনকে যতটা সম্ভব সাধারণ রাখি।

৭ নভেম্বর ২০১১ চার্লি রোজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

শেরিল স্যান্ডবার্গ

(ফেসবুকের চিফ অপারেটিং অফিসার)

সাফল্যের জন্য চাই নিজের ওপর আস্থা



শেরিল স্যান্ডবার্গ ফেসবুকের চিফ অপারেটিং অফিসার।

শেরিল ১৯৬৯ সালের ২৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ বক্তব্যটি তিনি বার্নার্ড কলেজের সমাবর্তনে প্রদান করেন ২০১১ সালের ১৭ মে।

ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক অভিনন্দন সবাইকে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করে বেরিয়েছি প্রায় ২০ বছর হলো। আমার কাজের জায়গাটি অবশ্য আমার প্রতিটি দিনকে মনে করিয়ে দেয়। আর এটি যেন আমাকে অনেক বেশি বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। মার্ক জুকেরবার্গ একদিন বলছিলেন, 'শেরিল, মধ্যবসয়ী সংকটগুলো কবে নাগাদ দেখা দেয় বলো তো? তোমার যখন বয়স ৩০ পেরিয়েছে তখন? আসলেই অনেক বয়স তো হয়ে গেল, আর এ জীবনটাতে এমন সব দিনলিপিতে ভরে গেছে, যেগুলো আমি মনেও রাখিনি। আজকের দিনটি অবশ্য ভুলে যাওয়ার নয়, তোমাদের হয়তো মনেও থাকবে না, আমি কী বলে গেলাম। সমাবর্তনের এই বক্তার নামও হয়তো মনে থাকবে না।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আজ এই যে তোমরা নিউইয়র্কের বার্নার্ড কলেজ ছেড়ে যাচ্ছ, তোমরা কি শুধু এখান থেকে অর্জিত শিক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ? না, তোমরা পৃথিবীর অন্যতম একজন সৌভাগ্যবান হিসেবেও এ ক্যাম্পাস ছেড়ে পেশাজীবনে প্রবেশ করছ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো এমন পরিবার থেকে এসেছ, যেখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেউ কেউ এমনও আছো, যারা অনেক লড়াই করে আজকে এখানে আসতে পেরেছ, কেউ হয়তো তাদের পরিবারের মধ্যে প্রথম স্নাতক। কী অসাধারণ অর্জন এটি, তাই না? তোমরা যেভাবেই শিক্ষাজীবন শুরু করো না কেন, আজ তোমরা সবাই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত স্নাতকদের দলে। এমনটা বলছি কারণ, তোমাদের সামনে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, তোমরা তোমাদের এ অর্জনকে নিয়ে কী করবে ভবিষ্যতে?

আজ পৃথিবীতে কী রয়েছে বদলে দেওয়ার? সেটি বদলে দেওয়ার জন্য তোমাদের পরিকল্পনাগুলো কেমন?

যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক উন্নত দেশে আইনের দৃষ্টিতে আমরা (নারী-পুরুষ সবাই) সম-অধিকার ভোগ করি। অথচ এ প্রতিশ্রুতি তো সবখানে সমান নয়। এই যে আজ আমরা নীল পোশাকে সমাবর্তনে বসে আছি, আমাদের মানতেই হবে পুরুষেরাই পৃথিবী শাসন করছে। ১৯০ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র নয়। সারা পৃথিবীর সংসদগুলোয় নারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৩ জন। যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট জগতে শতকরা ১৫ জন নারী, যা বিগত নয় বছরে বদলাইনি। অধ্যাপকের মধ্যে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র শতকরা ২৪ জন নারী অধ্যাপক রয়েছেন। আমি স্বীকার করি, আমাদের অতীত প্রজন্মের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে নারীদের জীবনে। আমার মায়ের সমাবর্তনের দিন তাঁর মনে হয়েছিল সেবিকা কিংবা শিক্ষকতা করার দুটি পথ খোলা আছে তাঁর। মা আমাকে আর আমার বোনকে বড় করেছেন এই বিশ্বাসকে ধারণ করে যে আমরা পৃথিবীর সবকিছু অর্জন করার সুযোগ পাব। কিন্তু আমার কষ্ট হয় ভাবলে যে আমাদের প্রজন্ম কী করছে নারীদের পথ খুলে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দেওয়ার জন্য?

৩০ বছর আগে ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ স্নাতক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। ৩০ বছরে সেই স্নাতকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার টেবিলে আমাদের স্থান কোথায়? পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা কি সমান সুযোগ পাই? তাই আজ থেকে এ দায়িত্ব পালনের ভার রইল তোমাদের। তোমরাই আরও সমান একটি বিশ্ব গড়ার প্রতিশ্রুতি নেবে। তোমরাই আমাদের ভরসা। আমি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি, যখন আমরা জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে পারব, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারব, তখনই আমরা সরকারব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ অর্জন করতে পারব। আমাদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন—প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমান অবস্থান। নারীদের উপদেশ কিংবা ভুলে যাওয়া নয়, পৃথিবীর গতিকে বদলে দিতে, আমাদের কথোপকথনের ধরন বদলে দিতে। প্রতিটি নারীর কথা শোনা এবং শোনানোর জন্য প্রয়োজন তোমাদের। তাই আমার আশা, এখানে উপস্থিত প্রত্যেক স্নাতককে নিয়ে, যা বদলে দেবে পৃথিবী।

তো, জীবনে তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে কী উপদেশ দেব তোমাদের? প্রথমে আমি যা বলে তোমাদের উৎসাহিত করতে চাই তা হলো, চিন্তার জগৎ বিস্তৃত করো। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীদের চেয়ে পুরুষেরা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। স্নাতক হওয়ার দিন থেকে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম জীবনের প্রতিটি দিন অতিবাহিত করে। আমরা তো কখনোই সফলতা অর্জনের শূন্যতার কাছে পৌঁছাতে পারব না, যদি আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষার শূন্যতা পূরণ না করি। কিন্তু যদি আজ থেকে আমরা সব স্নাতক নারীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এগিয়ে না যাই, তবে কেমন করে বড় কিছু অর্জনে আমরা সফল হব। নেতৃত্বপ্রদানের সুযোগ তাদের হাতেই আসে, যা নেতৃত্বপ্রদানের জন্য এগিয়ে যায়। আর তোমাদের সবার সামনে আজ নেতৃত্ব গ্রহণের দিন এসেছে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
সফলতার পরবর্তী ধাপ হলো নিজের ক্ষমতা এবং সম্ভাবনায় বিশ্বাস করা যে একদিন তুমি পারবেই। দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা তাঁদের কর্মক্ষমতায় কম আস্থা রাখেন। যদি তুমি একজন পুরুষকে তার সফলতার কারণ জিজ্ঞেস করো, সে সফলতার জন্য তার নিজেকেই তুলে ধরবে, কিন্তু নারীরা বলবে কঠোর পরিশ্রম, অন্যদের সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়কে। নারীরা বলবে, "আমি ভাগ্যবান, আমি পরিশ্রম করেছি, অনেকের সাহায্য পেয়েছি।" পুরুষেরা বলবে, "কী অদ্ভুত প্রশ্ন, আমি যোগ্য এবং আমি অসাধারণ।" তাই নারীদের শিখতে হবে পুরুষদের থেকে, যাতে তারা তাদের সফলতাকে নিজের করে ধারণ করতে পারে। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল।

যদি তুমি অনেক বড় কিছু স্বপ্ন দেখো, নিজের সফলতাকে নিজের মাঝে ধারণ করে নাও, যদি তুমি নেতৃত্ব দাও, তাহলে বাইরে অনেক কিছুর মূল্য চুকিয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও কিছুটা বিসর্জন দিতে হয়। পুরুষদের অবশ্য নারীদের চেয়ে অনেক কম ত্যাগ করতে হয় পেশাদার ও ব্যক্তিগত জীবনে সফল হওয়ার জন্য। পুরুষদের দিনের যতটুকু সময় কাজ করতে হয়, নারীদের তার থেকে দ্বিগুণ কাজ করতে হয় এবং তাদের থেকে তিনগুণ বেশি পরিবারের খেয়াল রাখতে হয়। তাই নারীদের ক্ষেত্রে কর্মজীবনের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়—তুমি কি জীবনসঙ্গী চাও না? চাইলে সে কে? যদি তুমি এমন কাউকে বেছে নাও যে তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সব বোঝা এবং সুখ ভাগাভাগি করবে, তাহলে তুমি জীবনে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। পৃথিবীটা হয়তো তাহলে আরও অনেক সুন্দর হবে, যদি পুরুষেরা সংসারের অর্ধেক দায়িত্বের ভার নেয় আর নারীরা কর্মক্ষেত্রের অর্ধেক দায়িত্বের ভার নেয়।

আমার ছয় বছরের একটি ছেলে এবং তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। তাদের ঘিরে আমার স্বপ্নের শেষ নেই। আমি চাই আমার ছেলে ও মেয়ে উভয়েই তাদের পরিবারে এবং বাইরে সমান দায়িত্ব পালন করবে। কাজ আর সংসারের ভারসাম্য করে কীভাবে তারা চলবে,

Web: http://tanbircox.blogspot.com

সেটা বলা কঠিন। কারণ, জীবনে উত্থান-পতন আছেই। জীবনের নানা মোড়ই আমাদের সম্ভাবনা তৈরি করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছু করে যাও, যাতে ওই দিন তোমরা সফলভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো। তাহলে, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কী বেছে নেবে—প্রতিযোগিতা না অন্যের সংজ্ঞায়িত সফলতাকে? চেষ্টা করে যাও শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছ, যতক্ষণ তুমি এমন একটা কাজ পাচ্ছ, যা তোমার ও সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তোমার আবেগ এবং কর্মদক্ষতাকে মিলিয়ে দাও। সাফল্য আসবেই। আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় আছি। আমি জানি, এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। অনেক ভীতিপ্রদ। তাই বাসায় গিয়ে রাতে চিন্তা করো, আমি যদি ভয় না-ই পাই, তাহলে করব কীভাবে এ দায়িত্ব পালন।' এরপর এগিয়ে যাও পৃথিবী জয়ের জন্য। অভিনন্দন সবাইকে।

সূত্র: ওয়েবসাইট। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: শিখতী সানী

যোগাযোগ আনে সাফল্য



ফেসবুকের সিওও শেরিল স্যান্ডবার্গের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৯ সালের ২৮ আগস্ট। ফেসবুকের আগে তিনি গুগলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ২০১২ সালের ২৫ মে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে তিনি বক্তব্যটি দেন। এখানে বক্তব্য দেওয়ার কথা যখন ডিন নোরিয়া আমাকে বললেন, আমি তখন ভাবলাম, আমার চেয়েও আশাবাদী কিছু তরুণের সামনে আমাকে কথা বলতে হবে। আমার অবশ্য তরুণদের সান্নিধ্য সব সময়ই পছন্দের। তবে মাঝেমধ্যে তারা যখন খুব অবাক হয়ে জানতে চায়, ইন্টারনেট ছাড়া আমরা আমাদের সময়

কীভাবে পার করেছি, তখন আমি বিব্রত বোধ করি।
১৭ বছর আগে আমি এখানে (হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল) পড়তাম। খুব বেশি দিন হয়নি, যখন আমি তোমাদের জায়গায় ছিলাম। কিন্তু এই অল্প দিনেই পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। আমি ছিলাম সেকশন বি-তে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের শ্রেণীকক্ষকে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রথম অনলাইন শ্রেণীকক্ষে পরিণত করতে। আমরা একটি চ্যাটরুম ব্যবহার করতাম, যেখানে একটি ডায়াল সার্ভিস চালু ছিল। আমরা ছদ্মনামের একটা তালিকা তৈরি করতাম। কারণ, তখন ইন্টারনেটে আসল নাম ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। আমাদের এই পদ্ধতি প্রায়ই ঠিকমতো কাজ করত না। কারণ, ওটা ৯০ জনের একসঙ্গে কাজ করার মতো উপযোগী ছিল না। কিন্তু তখন আমরা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলাম এর সম্ভাবনাটা। আমরা বুঝতে পারতাম, ভবিষ্যৎটা এমন হবে, যেখানে প্রযুক্তি সহজেই আমাদের বন্ধু, পরিবার ও সহকর্মীদের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করবে। একটা সময় ছিল, যখন শুধু খ্যাতিমান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারতেন। এখন সময় বদলেছে। সাধারণ মানুষেরও এখন মতামত প্রকাশের জায়গা আছে। ফেসবুক ও টুইটার ব্যবহার করে যে কেউ এখন যেকোনো বিষয়ে আওয়াজ তুলতে পারছে। এটা বদলে দিচ্ছে ক্ষমতা বা কাজের গতানুগতিক ভাবনা। এখন ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে এবং ক্ষমতাবানের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। মতামত এখন খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে।
ফেসবুকে যোগ দেওয়ার পর আমাকে এর ব্যবসায়িক দিকটাও দেখতে হতো। আমি চাইতাম ফেসবুকের নিজস্ব ধরনটাকে বাধাগ্রস্ত না করে আমার কাজ চালিয়ে যেতে। একজন উপযুক্ত নেতা বুঝতে পারেন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সব কর্মী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তাই নেতারই দায়িত্ব কর্মীদের কাজে উৎসাহিত করা।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
তোমারা আজ গ্র্যাজুয়েট। নিজেকে একবার প্রশ্ন করো, তুমি কি সহজ-সরল ভাষায় কথা বলো? তুমি কি সততার খোঁজ করো? তখন তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? যেহেতু যোগাযোগকে আরও সহজ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি, সেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের আরও বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আমি কাজে বিশ্বাসী। যাদের সঙ্গে কাজ করি, তাদের গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমেই আমার প্রেরণার সৃষ্টি হয়। যদি আমরা কাউকে গুরুত্ব দিতে চাই, তাহলে তাকে অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে। আমি এটা বিশ্বাস করি না যে সোম থেকে শুক্রবার শুধু কাজ নিয়েই থাকব, নিজের জন্য শুধু বাকি দুই দিন ব্যবহার করব। কর্মক্ষেত্রকেও নিজের উপযোগী করে নিতে হবে। নিজের ভালো লাগা ও খারাপ লাগা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এতে করে কর্মক্ষেত্রে কাজের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মূল কথা হচ্ছে, তুমি যা, নিজেকে সেভাবেই উপস্থাপন করো।

সম্প্রতি আমি কর্মক্ষেত্রে নারীদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছি। একজন নারী হয়েও আমি আমার কাজ করেছি অন্য সবার মতোই। এটা কখনো বলো না, আমি মেয়ে। আমি এটা কখনো বলিনি। ১৯৯৫ সালে আমি যখন হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করি, তখন ভেবেছিলাম, আমাদের ব্যাচ থেকে কেউ একজন এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। তবে সেদিন আমি আমার কথা মোটেও ভাবিনি। আমরা কর্মক্ষেত্রে সমতা অর্জন করতে চাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে লিঙ্গবৈষম্য এখনো নেতৃত্বদানের কাজে নারীদের জন্য একটা বিশাল প্রতিবন্ধকতা। উচ্চপর্যায়ের কাজে নারীর সংখ্যা এখনো ১৫ থেকে ১৬ শতাংশে থেমে আছে। নারীদের সফলতাকে এখনো নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই এটা বেশি খেয়াল রাখতে হবে, নারীরা যাতে নিজেদের ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন না করেন। নারীদের কাজে উৎসাহিত করতে হলে ভিন্নধর্মী শিক্ষা দিতে হবে, তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত

Web: http://tanbircox.blogspot.com

করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম আমি বিকেল পাঁচটায় অফিস ছাড়ি, যাতে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে একসঙ্গে রাতের খাবার খেতে পারি। আমি খুবই অবাক হয়েছি, যখন দেখলাম সংবাদপত্রগুলো এটা অনেক ফলাও করে প্রচার করেছে। আমার এক বন্ধু এতে মজা করে বলেছে যে আমি যদি কুঠার দিয়ে কাউকে হত্যা করতাম, তবুও হয়তো এত সংবাদের শিরোনাম হতে পারতাম না! এটাই প্রমাণ করে যে এই সমস্যাটা এখনো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। তা না হলে এ ব্যাপারে কেন এত লেখালেখি হবে? সবচেয়ে জরুরি হলো, কীভাবে মেয়েদের উচ্চপদের কাজগুলোর প্রতি উৎসাহিত করে তোলা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ব্যবধান ঘোচাতে পারব না, ততক্ষণ পর্যন্ত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের ব্যবধান কমাতে পারব না। কয়েক সপ্তাহ আগে বার্নার্ড কলেজের সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছিলেন যে শুধু টেবিলে বসার জন্য নারীদের প্রয়োজন নয়, নারীরা এখানে তাদের সঠিক জায়গাটা করে নিক, তা-ই আমরা চাই।

তোমরা সহপাঠীরা কয়েক দিন পরই কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যোগাযোগটা সব সময় রেখো।

সবশেষে তোমাদের আমি চারটি বিষয়ে কথা বলতে চাই:

⇨ ফেসবুকের মাধ্যমে একটা যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি কোরো।

⇨ সব সময় সত্যের পথে চলবে।

⇨ নিজের কাছে বিশ্বস্ত থাকবে।

⇨ আমরা যা করতে পারিনি, আশা করি, তোমরাই তা অর্জন করবে। আমাদের এমন একটা পৃথিবী উপহার দেবে, যেখানে আমাদের অর্ধেক পরিবার পুরুষ দিয়ে এবং অর্ধেক প্রতিষ্ঠান নারী দিয়ে পরিচালিত হবে। আর এমনটা যদি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তবে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবীর সন্ধান পাব।

সবার জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।

ল্যারি পেইজ(গুগলের উদ্ভাবক)

স্বপ্ন কখনো হারায় না



ইন্টারনেট জগতে সার্চ ইঞ্জিন গুগলকে কে না চেনে। ল্যারি পেইজ এই গুগলের উদ্ভাবক। আজ থেকে ১২ বছর আগে ১৯৯৮ সালে ল্যারি ও তাঁর বন্ধু সার্জি ব্রিন মিলে গুগলের যাত্রা শুরু করেন। গুগলের স্বপ্নদ্রষ্টা লরেনস ল্যারি পেইজ ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৯ সালের ২ মে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তৃতাটি দেন।

অনেক দিন আগের কথা। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে বিভিন্ন কাজ থাকত। তারই একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রান্নাঘরের দেয়াল ও ছাদ থেকে ময়লা পরিষ্কার করা। আর ওই ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে মা ও বাবার পরিচয়। সুতরাং আমার আসা সেখান থেকেই। আমার বাবা এই মিশিগানেই কম্পিউটার যোগাযোগ বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। কিন্তু এটা তিনি করেছেন ৪৪ বছর আগে। বাবা ও মা নিজেদের পোশাকগুলো নিজেরাই তৈরি করেছেন। আমার বাবার পোশাক আমি পরেছি, আমার পোশাক আমার ছোট ভাই পরেছে। আরও কত কী!

আমি এগুলো বলছি কারণ, এটাই হচ্ছে আমার এত দূর আসার পথ। আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না যে এখানে আসতে পেরে আমি কতটা গর্বিত।

স্বপ্নপূরণের জন্য আমার একটি গল্প আছে। অথবা সত্যিকারের স্বপ্ন খুঁজে পাওয়ার জন্যই আমার গল্পটি আমাকে সহায়তা করে।

তুমি কি জানো, মধ্যরাতে রঙিন স্বপ্ন দেখে

কীভাবে জেগে উঠতে হয়? এবং তুমি কি জানো, তোমার বেডের পাশে কাগজ আর কলম না থাকলে ওই স্বপ্ন তুমি কীভাবে মনে রাখবে? আমার যখন ২৩ বছর বয়স, তখন এ রকম স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম। হঠাৎ করে যখন আমি জেগে উঠলাম, 'তখন চিন্তা করছিলাম, আমরা কি পুরো একটি ওয়েব পেজ ডাউনলোড করতে পারি শুধু এর লিংকটা দিয়ে?'

তখনই আমি একটি কলম ও খাতা নিয়ে লেখা শুরু করে দিলাম। মাঝেমধ্যে এভাবে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে জেগে উঠতে হয়। আমি মধ্যরাত পর্যন্ত সময় ব্যয় করেছি চিন্তাভাবনা করতে। আমি আমার উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি ব্যাপারটি নিয়ে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তুমি চালিয়ে যাও, তুমি পারবে।' কখনো চিন্তা ছিল না আমরা একটি 'সার্চ ইঞ্জিন' তৈরি করতে পারব। কিন্তু আমাদের চেষ্টা দিয়ে সফল হলাম। এভাবেই গুগলের জন্ম।

যখন আমি মিশিগানে ছিলাম, তখন চিন্তা করতাম, কীভাবে স্বপ্নকে বাস্তবে আনা যায়। আমি বিভিন্ন কর্মশালায় গিয়ে নিজেকেই নিজে অনুপ্রাণিত করেছি। আমি মনে করি, স্বপ্ন কখনো হারায় না। সাময়িকভাবে লুকিয়ে থাকে মাত্র। যদি আমরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারি, আর সেই পরিশ্রম যদি কোনো লক্ষ্য ঠিক রেখে করা যায়, তবে সমাধান আসবেই আসবে।

আমি মনে করি, উচ্চাশা সফল করা সম্ভব। সফল করতে অনেক বেশি উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে তোমার সঙ্গে মৃদু প্রতিযোগিতা করতে হবে প্রতিনিয়ত। সর্বোচ্চ ভালো মানুষেরা বড় বড় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কাজ করতে চান। যেমনটি গুগলে হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সব তথ্য একত্র ও বিশ্বজনীন করা এবং সহজে যাতে ব্যবহার করা যায়। আমি ও আমার সহযাত্রীরা যখন গুগলে কাজ শুরু করলাম, তখন ভীষণ চিন্তায় ছিলাম, আমার পিএইচডি থমকে না যায়! কিন্তু আমি পিএইচডি সম্পন্ন করেছি। সুতরাং তোমাকে তোমার মূল রাস্তায় থাকতে হবে, তারপর তোমার কাজ। এটা অনেকটা বৃষ্টির সময়ের

মতো। মানে, বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটার সময় তোমাকে ছাতার চেয়ে নিচের দিকে খেয়াল বেশি রাখতে হবে; না হলে গর্তে পড়ে তোমার শরীর নোংরা পানিতে ভিজে যাবে।

প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সবাই অনেকটা অলস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনই উপযুক্ত সময় তোমার আলোড়িত হওয়ার। তুমি কি পারো তা দেখিয়ে দিতে। সুতরাং স্বপ্নে বসবাস করার ইচ্ছে বাদ দিলে চলবে না। কারণ তোমাকে পৃথিবীর দরকার।

কোনো এক সকালে তুমি অনেক আত্মবিশ্বাসী হবে। কিন্তু সৃষ্টির নেশা যদি থাকে, তবে তাকে ভুলে যাওয়া যাবে না। তুমি তোমাকে অন্যের থেকে আলাদা ভাববে এবং মনে করবে, তুমি যে সুযোগ পেয়েছ, কেউ তা পায়নি। সুতরাং তোমাকে এটা শেষ করতে হবে। তোমাকে পার্থক্য করতে হবে অন্যের থেকে তোমার কাজের মাধ্যমে। তারপর তোমার জীবনই তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

১৯৯৬ সালের মার্চে বাবা মারা গেলেন। বাবা মারা যাওয়ায় আমি অত্যন্ত হতাশার মধ্যে পড়ি। কিন্তু আমি আমার অস্তিত্বকে খুঁজে পাই বাবার মধ্যে। বাবা বলতেন, 'আমরা পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তার মধ্যে এক নম্বর হলো অটোমেশন বা স্বনিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক ব্যবস্থা, দুই. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষা থাকবে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে। আমাদের একটা অংশকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে বিজ্ঞানের উন্নয়নে, মেডিসিনে এবং শিল্প খাতে, না হলে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যাবে। এর মাধ্যমেই একটি জাতির ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে তার আগামী প্রজন্মকে। যদি আমেরিকার সব যুবক শিক্ষার মধ্যে তাদের খুঁজত, তবে আমেরিকা আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতো।

গুগলের যাত্রাপথে অনেক বাধার সম্মুখীন আমরা হয়েছি; কিন্তু আমরা তার সমাধান করে সামনে চলে এসেছি। আমি মনে করি, আমি যতটুকু না পেরেছি, তার চেয়ে বেশি পেরেছে আমার বয়সটা। আমার ওই ২৩-২৪ বয়সটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং আমি মনে

করি, তোমরা স্বপ্ন দেখো অনেক বড় হওয়ার কিংবা বড় কিছু করার। সঙ্গে সেই স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তার চিন্তা তোমাকেই করতে হবে। আর যদি তা করতে পারো, তবেই তুমিই সাফল্যের গায়ে তিলক আঁকতে পারবে। আর আমি যদি পারি, তোমরাও পারবে। এখন হাতের নাগালে প্রযুক্তির ছোঁয়া। সুতরাং চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর চেষ্টা চালাও অনেক ভালো স্বপ্ন দেখতে। যে স্বপ্নের মধ্যে থাকবে তোমাকে আলাদা করার ক্ষমতা।

বিজ স্টোন(টুইটারের সহপ্রতিষ্ঠাতা)

সুযোগ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে



টুইটারের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিজ স্টোন। তাঁর জন্ম ১৯৭৪ সালের ১০ মার্চ, যুক্তরাষ্ট্রে। ১৪ মে, ২০১১ সালে ব্যবসন কলেজের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন।আজকে এখানে আসতে পেরে আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। গ্র্যাজুয়েটদের অনেক অভিনন্দন। তোমরা নিঃসন্দেহে বিশেষ কিছু অর্জন করেছ এবং তোমাদের যাত্রা মোটে শুরু হলো।

যখন আমি ছোট্ট শিশু, তখন আমার মাকে বলেছিলাম, আমি বড় হয়ে ব্যবসনে একজন ব্যবসায়ী হতে যাব। কিছুটা অবিশ্বাস্যভাবেই আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের সঙ্গে। এখানে আসার জন্য আমি আমার একান্ত নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছিলাম।

আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে সুযোগ, সৃজনশীলতা, ব্যর্থতা ও সহানুভূতি সম্পর্কে চারটা গল্প বলব। এ গল্পগুলোর অন্তর্গত বোধ আমার ব্যবসা, আনন্দ এবং সাফল্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে রঙিন করে তুলেছে।

সুযোগ: প্রথম গল্পের বিষয়

আমার বয়স যখন ছয় থেকে দশ, তখন মা আমাকে বয় রেঞ্জার নামে একটা কর্মসূচিতে দিল। এটা বয়স্কাউটের পূর্ববর্তী পর্যায়। স্থানীয় মার্কিন আদিবাসীরা আমাদের আদর্শ ছিল।

সেখানে আমরা এক ধরনের পুঁতি ও পালক দিয়ে মাথার মুকুট তৈরি করতাম। দড়িতে গিঁট দেওয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক কৌশলও আমরা শিখেছিলাম। এসব করে আমার সময়ই হতো না সমবয়সীদের সঙ্গে বেসবল, ফুটবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলায় অংশ নেওয়ার।
হাইস্কুলে উঠে আমি আমাদের ক্রীড়া দলে যোগ দিতে চাইলাম। কিন্তু বাস্কেটবল কোর্টের সব লাইন দেখে অবিশ্বাস্য রকমের আতঙ্কিত হতাম। খেলার নিয়মকানুনও বেশ কঠিন লাগত, যদিও সবার কাছে সেসব ছিল খুবই সহজ। আমার এই আতঙ্কের কারণে আমি কোনো দলেই সুযোগ পেলাম না। সে সময় আমি নিজেই এক ধরনের গবেষণা শুরু করলাম। দেখলাম, 'ল্যাক্রোস' নামের খেলাটা আমাদের স্কুলে খেলা হয় না। যদি কেউই খেলতে না জানে, তবে আমার মতো সবারই অসহায় অবস্থা হবে। তাই স্কুল প্রশাসনের কাছে গিয়ে বললাম, যদি কোচ ও শিক্ষার্থী জোগাড় করতে পারি, তবে কি আমি ল্যাক্রোস টিম শুরু করতে পারি? তারা রাজি হলো। ল্যাক্রোস টিম যাত্রা শুরু করল। যখন আমার আতঙ্ক কেটে গেল, তখন দেখা গেল এই খেলায় আমি খুবই ভালো করছি এবং একসময় আমি দলের অধিনায়ক হয়ে গেছি।
এ অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে কী করে সুযোগ তৈরি করে নেওয়া যায়। কোনো কাজ করার জন্য যে সঠিক পরিস্থিতির দরকার, তার জন্য অপেক্ষা না করে তুমি নিজেই সেই পরিস্থিতি তৈরি করে নিতে পারো।

সৃজনশীলতার গল্প

হাইস্কুল শেষে কলেজে আমি শিল্পকলা বিষয়ে পড়তে লাগলাম। পাশাপাশি বেকন হিলের এক প্রকাশনা সংস্থায় একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম। একদিন যখন পুরো আর্ট ডিপার্টমেন্ট দুপুরের খাবার খেতে বাইরে গেছে, তখন কম্পিউটারে আমি একটা বইয়ের প্রচ্ছদ ডিজাইন করে ফেললাম। অন্য প্রচ্ছদগুলোর সঙ্গে সেটাও অনুমোদন করার জন্য রেখে দিলাম। শিল্প পরিচালক নিউইয়র্ক থেকে ফিরলেন। প্রচ্ছদগুলো দেখার সময় আমারটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে করেছে? আমি

জানালাম যে এটা আমার করা। তিনি ভীষণ অবাক হলেন। শুধু যে আমার প্রচ্ছদটাই নির্বাচিত হলো তা না, আমাকে বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনার চাকরির প্রস্তাব করা হলো। একজন বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারার দারুণ সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাই আমি একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম—কলেজ ছেড়ে কাজ শেখার এই দুর্লভ সুযোগকে কাজে লাগালাম। এভাবেই আমার গ্রাফিক ডিজাইন শেখা শুরু। এ শেখাটাই আমাকে নতুন ধরনের চিন্তার জগতে নিয়ে এল।

কখনো ভেবো না, তোমার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা নেই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এ সম্পদটা আছে।

আমার তৃতীয় গল্পের বিষয় ব্যর্থতা

১৯৮৭ সালে একটা জার্মান রোমান্টিক ফ্যান্টাসি সিনেমা দেখেছিলাম। নির্দেশক ছিলেন উইম ওয়েনডার্স। এই সিনেমার আমেরিকান ভার্সনটা হলো উইংস অব ডিজায়ার। কাহিনির সময়টা ১৯৮০-র দশক, যখন পশ্চিম বার্লিনে গৃহযুদ্ধ প্রায় শেষ। দুজন দেবদূতকে (ক্যাসেল ও ড্যামিয়েল) রাখা হয়েছে বার্লিন শহরের দিকে খেয়াল রাখার জন্য। মানুষজন ও শহর গড়ে ওঠার আগে থেকেই তারা সেখানে ছিল। তাদের মৃত্যু নেই। সেখানকার জনগণের চিন্তাভাবনা বোঝা, কথা শোনা এসবই ছিল তাদের কাজ। কিন্তু তারা বাস্তবজগতে ছিল অদৃশ্য, কেউ তাদের দেখতে পেত না বা তাদের কথাও শুনতে পেত না।

সবকিছুই তো আর পরিকল্পনামতো চলে না। একসময় ড্যামিয়েল এক প্রতিভাসম্পন্ন, সুদর্শনা সার্কাস আর্টিস্ট ম্যারিওনকে ভালোবেসে ফেলে। তার চিন্তায় বারবার আনাগোনা করতে থাকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অনুভূতি কেমন হতে পারে। একদিন অবিশ্বাস্য একটা কাজ করে ফেলে সে। তার অসীম অমর জীবন ত্যাগ করে একা পৃথিবীতে চলে আসে। বহু ত্যাগ স্বীকারের পর ম্যারিওনকে পায়।

আমার তৃতীয় উপদেশ অনেকটা ড্যামিয়েলের সিদ্ধান্তের মতো। কোনো আকর্ষণীয় সাফল্য অর্জনের জন্য তোমাকে অবশ্যই তৈরি থাকতে

হবে আকর্ষণীয় কোনো ব্যর্থতার জন্য। লক্ষ্য অর্জনে মৃত্যুর জন্য হাসিমুখে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বলছি না তোমাদের সত্যিই মরতে হবে। আমার কথার মানে হলো, ব্যর্থতাকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

সহানুভূতি: আমার চতুর্থ গল্প

মানুষকে বুঝতে পারা ও তার অনুভূতিগুলো ভাগ করে নেওয়াই হলো সহানুভূতি। আমাদের প্রায় সবার মধ্যেই এই গুণটা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে তা আমরা অনেকেই জানি না। ১০ বছর ধরে আমি বড় পরিসরে সামাজিক যোগাযোগ প্রসারের পরিকল্পনা করছি। যেমনটা হচ্ছে এখনকার সময়ে টুইটার।

নিজে বিত্তশালী হওয়ার পরে অন্যকে সাহায্য করতে হবে—এমনটা ভাবা ঠিক নয়। ডোনার চুজ সংস্থার মাধ্যমে আমি ও আমার স্ত্রী বেশ অনেক বছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে আসছি। এর মূল্য যদিও অনেক কম, তবে প্রতিদান অনেক বেশি। আমরা ছোট্ট শিশুদের হাতে লেখা ধন্যবাদসূচক প্রচুর চিঠি পাই। এগুলো সত্যিই অনেক মূল্যবান।

পৃথিবীতে সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি, একজন অন্যজনের ওপর নির্ভর করি। যখন আমরা একে অপরকে সাহায্য করি, পরোক্ষভাবে নিজেদেরই সাহায্য করা হয়। তাই আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো, তুমি যত তাড়াতাড়ি অন্যদের প্রতি তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া শুরু করবে, তুমি তোমার জীবনে তত বেশি এর প্রতিদান পাবে।

সবশেষে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি, তোমরা নিজেরা নিজেদের সুযোগ তৈরি করো, তোমাদের ভেতরকার অসীম সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলো, ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করো এবং সহানুভূতিশীল হও। নিজেকে জ্ঞান ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে গড়ে তোলো। এতে তুমি শুধু পৃথিবীকেই বদলাবে না, তুমি নিজেও আনন্দ পাবে এবং থাকবে প্রশান্তিতে। আমি তোমাদের জন্য গর্বিত। ধন্যবাদ।

সূত্র: ওয়েবসাইট

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মারুফা ইসহাক

মাইকেল ডেল (Dell প্রতিষ্ঠাতা)



এখন থেকে ২৯ বছর আগে মাইকেল ডেল নামের এক তরুণ উদ্যোক্তা গড়ে তুলেছিলেন একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। এই দীর্ঘ ২৯ বছরে মাইকেল ডেলের গড়ে তোলা সেই প্রতিষ্ঠানই পরিণত হয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পিসি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে। নিজের নাম ব্যবহার করেই মাইকেল ডেল তার প্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছিলেন 'ডেল'। মাইকেল সল ডেল একজন মার্কিন শিল্পোদ্যোক্তা যিনি ডেল ব্র্যান্ডের কম্পিউটার কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা। সেই সাথে তার আরও একটি পরিচয় হলো, ফোর্বস ৪০০-এর তালিকা (২০১০) অনুযায়ী তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সম্পদশালী ব্যক্তিদের একজন। তার আনুষ্ঠানিক পরিচয় তিনি ডেল ইনকর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী। ছোটবেলায় জমানো ১ হাজার ডলার মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। ১৯৮৪-এ কম্পিউটার উৎপাদনের লাইসেন্স গ্রহণ করেন তিনি। এরপর মাত্র ২৪ বছর বয়সে প্রধান নির্বাহী হিসেবে যোগ দেন নিজের প্রতিষ্ঠানেই। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে (২০১১) তার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার। মাত্র দুই যুগে তিনি ডেলকে পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় কম্পিউটার ব্র্যান্ড-এ উন্নীত করেছেন তিনি। মাইকেল ডেল বর্তমানে ডেলের চেয়ারম্যান এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবেও কর্মরত রয়েছেন। তার নেতৃত্বেই ২৯ বছরে ডেল শুধু বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পিসি নির্মাতাতেই পরিণত হয়নি মাইকেল ডেলকেও পরিণত করেছে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিকে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পিসি নির্মাতা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সংকটেই রয়েছে ডেল। আর তার ফলে এর বিক্রি হয়ে যাওয়া নিয়েও আলোচনা চলছিল প্রযুক্তি বিশ্বে। টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফটও

একে কিনে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছে কিছুদিন আগে। মাইক্রোসফটের প্রস্তাবে ডেলের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সম্মতি লক্ষ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত ডেলকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন খোদ প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ডেল। পুনরায় ডেলকে নিজের মালিকানায় নিয়ে আসছেন তিনি। ২৪.৪ বিলিয়ন ডলারে এবারে ডেলকে আবার কিনে নিয়েছেন তিনি। তার সাথে অবশ্য অংশীদার হিসেবে রয়েছে টেকনোলজি ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম 'সিলভার লেক'। পাশপাশি টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট একে কিনে নিতে না পারলেও এতে ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে ঋণ হিসেবে। এর ফলে শেয়ার বাজার থেকে পাবলিক কোম্পানির তালিকা থেকে ডেল বাদ পড়তে যাচ্ছে। আর ডেলের শেয়ারধারী যারা রয়েছেন, তাদের শেয়ারগুলোর সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পেতে যাচ্ছেন। মাইকেল ডেল অবশ্য এখনও ডেলের প্রায় ১৪ শতাংশ শেয়ারের মালিক। ডেলকে কিনে নিতে পেরে বেশ খুশিই হয়েছেন মাইকেল ডেল। এই বিষয়ে তিনি জানান, 'আমার বিশ্বাস, ডেল এবং আমাদের গ্রাহক ও সদস্যদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নতুন এক যুগের সূচনা করবে। আমাদের স্টকহোল্ডার যারা রয়েছেন তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদি কৌশল অবলম্বন করে ডেলের সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিত করতে পারব।' ডেলকে কিনে নেওয়ার পরেও মাইকেল ডেলই এর চেয়ারম্যান এবং সিইও হিসেবে কর্মরত আছেন।

এক ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পথচলার সময় অবশ্যই মনে রাখবে, তুমি কোত্থেকে এসেছ। যে জায়গায় আমাদের জন্ম, সেখানকার ধুলোবালি আর স্বপ্ন সবাই আমরা লালন করি।' পুরো পথেই নিজেকে প্রশ্ন করবে তুমি, 'আমি কেন এই পথে? এর একটা উত্তর আমি তোমাদের বলতে পারি। সেটা হলো, জিততে। এই জেতাটা হচ্ছে নিজের সম্ভাবনাময় শক্তির জয়। এই জেতাটা হলো শ্রেষ্ঠ হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী অথবা শিক্ষক হওয়ার যে সম্ভাবনা

www.facebook.com/tanbir.ebooks
তোমার মধ্যে আছে, সেটার জন্য নিজেকে বিশ্বাস করা। অন্য কারও সাফল্য দেখে নিজের সফলতাকে বিচার করো না।

আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি আমার আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছে সম্পর্কে সন্দেহাতীত ছিলাম জীবনের শুরু থেকেই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম। কিন্তু কম্পিউটারের সব বইপত্র, যন্ত্রপাতি আমাকে খুব টানত। হলে আমার রুমমেটও সে রকমই বলত। ১৯ বছর আগে (১৯৮৪), আমার বয়স তখন ১৯। আমি ডেল নিয়ে কাজ শুরু করি, হলের ওই ঘরেই।

কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশি—এটা অনেক মানুষই অনেক পরে জানতে পারে। আবার কেউ কেউ আছে, যারা এটা কখনোই জানতে পারে না। এরই মধ্যে তুমি যদি তোমার লক্ষ্যটাকে স্থির করে থাকো অথবা খুঁজছ এমন হয়, মনে রেখো, কৌতূহলই এনে দেবে তোমার জীবনের সফলতা। স্বপ্ন সত্যি করতে তোমার ভেতরে যে 'তুমি' আছে, তার কথা শুনতে হবে। আকাঙ্ক্ষা যদি বড় হয়, তোমার স্বপ্ন সত্য হবেই। সততা, নৈতিকতা ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে হবে। যদি তোমার স্বপ্নের সঙ্গে আপস না করো, তুমি সফল হবেই।'

Web: http://tanbircox.blogspot.com

রিড হফম্যান

(‘লিঙ্কড ইন’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা)

চাকরি নয়, নিজেই হও উদ্যোক্তা



ব্যবসাভিত্তিক অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ‘লিঙ্কড ইন’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা রিড হফম্যানের জন্ম ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কড ইনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন সারাবিশ্বে এক কোটি ৭৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

আজ আমি বক্তৃতা শুরু করব ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি বলেছেন, ‘সব মানুষই আসলে উদ্যোক্তা হয়ে জন্ম নেয়। মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখন তারা সবাই ছিল এক অর্থে উদ্যোক্তা। তারা নিজেরাই খাবার সংগ্রহ করত, নিজেদের কাজের সংস্থানও করত। এভাবে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই মানব ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। সভ্যতার সূচনালগ্নে বেকার বলে কোনো শব্দ ছিল না। কিন্তু সময় যত পেরিয়েছে, আমরা আমাদের সহজাত উদ্যোক্তাসুলভ মনোভাবকে তত দমিয়ে ফেলেছি। আমরা উদ্যোক্তা থেকে পরিণত হয়েছি শ্রমিকে। আমাদের মগজে পাকাপাকিভাবে এই ধারণা ঢুকে গিয়েছে যে আমাদের চাকরি করতে হবে।’

আমি এই উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম, কারণ উদ্যোক্তারা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আজ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের অধিকাংশই অভিবাসী কিংবা অভিবাসীদের বংশধর। তাদের পূর্বপ্রজন্ম মহাসাগরের ওপার থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একদিন এই নতুন ভূখণ্ডে এসেছিল। আজকে অনেক বড় বড় কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা একদিন অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা ফেলেছিলেন, তাঁদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলতে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন বলতে আজ এটিই বোঝায়, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর মেধার সমন্বয়ে নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে গড়ে তোলা। উদ্যোক্তারা হলো সেসব হাতেগোনা মানুষ যারা সমাজের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নিজেদের পথ নিজেরাই সৃষ্টি করে নেয়। তাঁরা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং অন্যদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এর সবকিছুই সমাজকে এগিয়ে নিতে অপরিহার্য। এখন বেকারত্বের হার কত একটু ভেবে দেখো। আজ যদি আমাদের মধ্যে আরও অনেক উদ্যোক্তা থাকতেন, আরও নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে উঠত! তা হলে বেকারত্ব দূর করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। এই আধুনিক সমাজে ব্যবসায় উদ্যোগ শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আর মানুষের কর্মসংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্যোগী মনোভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজ প্রায় সব পেশাতেই দরকার। নিঃসন্দেহে এটি একটি নতুন ব্যাপার। পৃথিবী এখন বিশ্বায়ন আর প্রযুক্তির কল্যাণে যত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। গত দশকে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে ধাপে ধাপে তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলত। কর্মক্ষেত্রে তার কাজের একটি নির্দিষ্ট বিভাগ থাকত, ক্যারিয়ারের পথ ছিল সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। যে কোম্পানিতেই কাজ করুক না কেন, সে সেই ছকের ভেতরে থেকেই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেত। পরিশ্রম এবং কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পেলে ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়ন যেখানে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছে, সেখানে তোমাদের মতো তরুণদের ক্যারিয়ার-ভাবনাও বদলে ফেলতে হবে। আগে ক্যারিয়ার ছিল একটি সোজা ওপরে উঠে যাওয়া সিঁড়ি, এখন তা পরিণত হয়েছে গোলকধাঁধার মতো এক পাহাড়ি এলাকায়। এখানে ওপরে উঠে যেতে হলে তোমাকে কখনো নিচেও নামতে হতে পারে, অনেক চড়াই-উতরাই পাশ কাটিয়ে যেতে হতে পারে বুদ্ধি করে, কখনো কখনো ঝুঁকি নিয়ে লাফ দিতেও হতে পারে। আবার সময়ের প্রয়োজনে হয়তো তোমাকে পাহাড়ের পাদদেশে নেমেও আসতে হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে পাহাড়ের গা ঘেঁষে তুমি সুন্দর

www.facebook.com/tanbir.ebooks
একটা খেলার জায়গা বানিয়ে ফেলেছ! কিছুই আসলে একরকম থাকবে না, কখনো থাকে না। যা আছে তা বদলায়, কখনো বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি হয়, কখনো আগে যা ছিল তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। আধুনিক ক্যারিয়ার, যা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তার এভাবেই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনকেই তোমাদের একমাত্র স্থায়ী ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে। আশপাশের সবকিছুই বদলে যাবে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তোমার দক্ষতা ও সামর্থ্যকেও দ্রুত বদলে ফেলতে হবে। বর্তমান সময়ে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন কৌশল। আর সেই কৌশলটি হলো, উদ্যোক্তাদের মতো চিন্তা করা। বসে বসে দীর্ঘ পরিকল্পনা করে জীবন পার করে দিলে চলবে না, কাজে নেমে পড়তে হবে। নিজের কাজ, নিজের ক্যারিয়ার নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হবে। তোমাদের মধ্যে খুব কমই নিজের ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান শুরু করবে, কিন্তু তার পরও প্রত্যেকেরই উদ্যোক্তাদের মতো চিন্তা করা উচিত। কীভাবে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে বা নিজের ভেতরে উদ্যোগী-ভাবনা জাগিয়ে তুলবে, তা নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। কিন্তু আমার কাছে যদি একটিমাত্র পরামর্শ চাওয়া হয় এ ব্যাপারে তা হলে আমি বলব, নিজের 'নেটওয়ার্ক' তৈরি করো। তোমার পরিচিতজনেরাই তোমাকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তোমার নেটওয়ার্ক যত শক্তিশালী হবে, তুমি তত বেশি তথ্য পাবে, ব্যবহারিক জ্ঞান পাবে। তোমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তোমাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এমনভাবে সাহায্য করবে, যা তুমি হয়তো চিন্তাও করতে পারবে না। মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন, সেটা তোমার সফল হওয়ার পেছনে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তোমার নেটওয়ার্ক থেকে তুমি যেমন মূল্যবান তথ্য আর প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে পারো, তেমনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা তোমার একার পক্ষে কখনোই মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না, তাও তুমি সামাল দিতে পারো। অনেক অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা আর দুর্যোগকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারো, অনেক নতুন সম্ভাবনাও খুঁজে বের করতে পারো, শুধু তোমাকে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। আজ যেখানে তোমরা সমাবর্তনের জন্য হাজির হয়েছ, এখানেও

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
তোমাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। আমাকে প্রথম চাকরি দিয়েছিল আমার এক বন্ধুর রুমমেট, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আমি 'পেপাল'-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড মেম্বার, সেটিও হয়েছিল আমার এক কাছের বন্ধুর মাধ্যমে যে কোম্পানিটির সহপ্রতিষ্ঠাতা। আসলে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক শুধু যারা তোমার পরিচিত তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, একটা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে। যাদের সঙ্গে তোমার সুসম্পর্ক তারা, তাদের পরিচিত মানুষেরা, এমনকি সেই মানুষদেরও পরিচিত মানুষেরা—সবাই এক অদৃশ্য সুতায় জড়িয়ে আছে। জীবন একটি দলগত খেলা, যেখানে একাকী তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার আশপাশের সবকিছু, তোমার দলের সবাইকে নিয়েই 'তুমি'। উদ্যোক্তাদের অদম্য মনোভাব থেকে যেকোনো পেশার মানুষই তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা নিতে পারে। আজকের পৃথিবী খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তাই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা আর নতুন কিছু আবিষ্কার করার তাগিদও দিন দিন বাড়ছে। এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে হলে উদ্যোক্তাদের মতো ভাবতে হবে, তারাই নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন, আমাদের উদ্যোক্তা প্রয়োজন।

২০১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা, ভুলে যেয়ো না তোমরাই আমাদের নেতা, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তোমাদের মধ্যে থেকেই নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, তোমরাই সমাজকে বদলে দেবে। তোমরা শুধু নিজেরা উদ্যোক্তা হয়েই থেমে যেয়ো না। তোমাদের মতো আরও অসংখ্য উদ্যোক্তা যাতে সৃষ্টি হতে পারে, বিকাশ লাভ করতে পারে, এ সমাজে তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে এগিয়ে এসো। জেনে রেখো, একজন মানুষ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেই পরিবর্তন ফলপ্রসূ হয় তখনই যখন আরও অসংখ্য মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। আজ থেকে তোমরা এক নতুন পথে পা বাড়ালে, এখনই সময় নতুন কিছু করে দেখানোর। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

সূত্র: ওয়েবসাইট

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

Web: http://tanbircox.blogspot.com

জেফ বিজোস (amazon.com.inc-এর প্রতিষ্ঠাতা)

নিজের সিদ্ধান্তই নিজের পরিচয়



মার্কিন উদ্যোক্তা জেফ বিজোস amazon.com.inc-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। অনলাইনভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বই ও অন্যান্য পণ্যের বিশাল এক বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ২০১০ সালের ৩০ মে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন। ছোটবেলায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটত টেক্সাসে আমার দাদাবাড়িতে। সেখানে পশুর খামারে ঘুরে বেড়াতাম আমি। বিভিন্ন কাজে সাহায্যও করতাম। যেমন—বায়ুকল ঠিক করা, গবাদিপশুদের টিকা দেওয়া ইত্যাদি। প্রত্যেক বিকেলে যেতাম যাত্রা দেখতে, বিশেষ করে ডেইজ অব আওয়ার লাইফস। আমার দাদা-দাদি ক্যারাভান ক্লাবের সদস্য ছিলেন, যাঁরা ঘুরে বেড়াতেন আমেরিকা ও কানাডার নানা জায়গা। প্রায় প্রত্যেক গ্রীষ্মে আমরা সেখানে যোগ দিতাম। এমনি করে ঘুরে বেড়াতে আমি খুবই মজা পেতাম। একবার এ রকম এক ভ্রমণে আমি খেয়াল করলাম পুরো সময়টাতে আমার দাদি সিগারেট টেনে চলেছেন, সিগারেটের সেই গন্ধ আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। অল্প বয়স থেকেই আমি টুকটাক অঙ্ক কষতাম আর বিভিন্ন বিষয়ে অনুমান করার চেষ্টা করতাম। ধূমপান নিয়ে একটা প্রচারণা শুনেছিলাম আমি। মূলত সেখানে বলা হয়েছিল, সিগারেটের প্রতিটি টান জীবন থেকে দুই মিনিট করে সময় নিয়ে নেয়। যে হারেই হোক না কেন, ভাবলাম দাদিকে নিয়ে হিসাবটা করি। প্রতিদিন ধূমপানের জন্য তাঁর সিগারেটের সংখ্যা, প্রতিটি সিগারেটে টান দেওয়ার সংখ্যা ইত্যাদি অনুমান করে দাদিকে বললাম, ‘প্রতি টানে দুই মিনিট করে তোমার জীবনের নয় বছর তুমি হারিয়ে ফেলছ।’ স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি, এরপর কী হয়েছিল। পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা

ঘটে গেল। ভেবেছিলাম, আমার বুদ্ধি ও গাণিতিক যুক্তির জন্য প্রশংসিত হব। কিন্তু তেমনটা হলো না। আমার দাদি খুব করে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি বুঝতেই পারছিলাম না কী করব। দাদা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হাইওয়েতে গাড়ি সাইড করে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে বললেন। আমি কি কোনো বিপদে পড়লাম? দাদা বেশ জ্ঞানী ও চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ। কখনোই তিনি আমার সঙ্গে কঠিন করে কথা বলেননি। কিন্তু যদি এবারে বলেন? যদি বলেন গাড়িতে ফিরে দাদির কাছে ক্ষমা চাইতে? এমনি নানা চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। দাদা আমার দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'জেফ, একদিন তুমি বুঝতে পারবে যে বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে স্নেহশীল হওয়াটা কঠিন।'

আজকে আমি তোমাদের সহজাত গুণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই দুয়ের মধ্যে কী পার্থক্য তা নিয়ে বলতে চাই। বুদ্ধিমত্তা হলো একটা সহজাত গুণ, অপরদিকে স্নেহশীল হওয়া হচ্ছে এক ধরনের সিদ্ধান্ত। আর এই সিদ্ধান্তের কাজটিই কিছুটা কঠিন। তুমি যদি সচেতন না হও, তবে তুমি তোমার সহজাত গুণ থাকা সত্ত্বেও ভুল পথে পা দিতে পারো; যেটা তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে।

আমি নিশ্চিত তোমরা যারা এখানে আছো তারা বহু গুণসম্পন্ন, তোমাদের রয়েছে দারুণ বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক। তা না হলে এ পর্যন্ত তোমরা আসতে পারতে না।

আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে আমি 'আমাজন' তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম। আমি জেনেছিলাম যে ওয়েবের ব্যবহার প্রত্যেক বছরে শতকরা দুই ২,৩০০ হারে বাড়ছে। এর মতো এত দ্রুত হারে কোনো কিছুর ব্যবহার বাড়তে আমি কখনোই দেখিনি বা শুনিনি। অনলাইন বুকস্টোর তৈরি করার চিন্তা আমার জন্য দারুণ রোমাঞ্চকর ছিল। কারণ, সে সময়ে এ ধরনের কিছু ছিল না। তখন আমার বয়স ৩০। মোটে এক বছর হয়েছে বিয়ে করেছি। আমার সহধর্মিণী ম্যাককেঞ্জিকে বললাম যে আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাচ্ছি আর নতুন একটা কাজে

নিজেকে জড়াতে যাচ্ছি, যার ভবিষ্যৎ আমার জানা নেই। ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে উদ্ভাবন করার মানসিকতা ছিল। আমি সব সময়ই উদ্ভাবক হতে চেয়েছি। ম্যাককেঞ্জির কাছ থেকে আমি উৎসাহ ও সমর্থন পেলাম। আমি আমার আগ্রহের দিকে এগিয়ে যাই, সেটাই সে চেয়েছিল।

নিউইয়র্ক সিটিতে আমি একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলাম। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শ্রদ্ধা করার মতোই বুদ্ধিমান ছিলেন। একদিন তাঁকে বললাম যে ইন্টারনেটে আমি বই বিক্রির একটা কোম্পানি শুরু করতে চাই। সেন্ট্রাল পার্কে বেশ অনেকক্ষণ আমরা হাঁটলাম। আমার সব কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর বললেন, এটা নিঃসন্দেহে খুব দারুণ একটা চিন্তা। তবে যার কোনো ভালো চাকরি নেই তার জন্যই এই চিন্তাটা অনেক বেশি ভালো। তাঁর যুক্তি আমাকে কিছুটা ভাবনার জগতে ঠেলে দিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও দুই দিন আমাকে ভেবে দেখতে বললেন।

সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বেশ কঠিন ছিল আমার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হলাম। আমার মনে হলো, চেষ্টা করা ও ব্যর্থতা বরণ করা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই বা হবে না। কম নিরাপদ পথটাকেই আমি বেছে নিলাম, যে পথে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আমার সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমি গর্বিত।

আগামীকাল থেকে তোমাদের নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হবে, যে জীবনের রচয়িতা তুমি নিজে।

তোমার বয়স যখন ৮০ বছরের মতো হবে, একটা নীরব মুহূর্তে তুমি তোমার জীবনের প্রতিচ্ছবি তোমার সামনে দেখবে। তোমার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোকেই সবচেয়ে অর্থপূর্ণ মনে হবে। আমরা হচ্ছি আমাদের সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন। নিজেই নিজের মহৎ গল্প তৈরি করো। তোমাদের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ।

জেরি ইয়াং(ইয়াহু!-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা)

জীবনটাকে নিতে হবে হালকাভাবে



জেরি ইয়াং ইয়াহু!-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ২০০৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তব্যটি দেন।

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই চ্যান্সেলরকে। সম্মানিত অতিথি, শিক্ষকেরা ও গ্র্যাজুয়েটদের আলোহা (শুভেচ্ছা)! অনেক কঠিন পড়াশোনা শেষ করে, অসংখ্য পরীক্ষা দিয়ে মনেপ্রাণে পড়াশোনা করে, আজ যারা এ পর্যায়ে এসেছে, তাদের সামনে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে—এর কারণ শুধু এই নয় যে আমি এ এলাকার পুরোনো বাসিন্দা। এর কারণ হলো ইয়াহুর সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা। ১৯৯৪ সালে আমি যখন আমার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ প্রকৌশলের ওপর পিএইচডি গবেষণা করছিলাম, তখনই আমি ইয়াহু শুরু করি। মানে, আমার আসলে পিএইচডি ডিগ্রি নেই। এর পরও আমি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে যাচ্ছি আজ কোনো গবেষণা কাজ ছাড়াই! অসাধারণ!আজ আমাকে ডাকা হয়েছে তোমাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর জন্য। নিজের জীবনের কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য। আজ আমি তোমাদের পাঁচটা বিশেষ পরামর্শ দেব।

প্রথমটি হলো: পত্রিকার শিরোনাম দেখেই নিরাশ হবে না।

‘বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েই চলেছে’, ‘চাকরির বাজার কমে আসছে অর্থনৈতিক মন্দায়’। তোমরা মনে করছ, এসব হেডলাইন হয়তো আজকের পত্রিকার। কিন্তু আসলে তা না, এগুলো সেই ১৯৯০ সালের কয়েকটি পত্রিকার হেডলাইন। সে সময় আমিও মনের মতো চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমি মার্ক টোয়েনের একটা কথা কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন, ‘মানুষ সুখী হওয়ার জন্য একেবারে

শূন্য থেকে অজানার পথে পাড়ি দেয়।' একটা বিষয় সব সময় মনে রাখবে তোমরা, তা হলো শূন্য থেকেই অসীমের শুরু হয়। তোমরা বরং একদিক থেকে ভাগ্যবান যে, এই অর্থনৈতিক মন্দার সময় পড়াশোনা শেষ করে চাকরির বাজারে ঢুকছ। এ কারণেই তোমরা সুযোগ পাবে অর্থনীতি পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করার।

দ্বিতীয় কথা: জীবনে যা করবে তাই-ই ফেরত পাবে।

শুধু মেধা থাকলেই সাফল্য পাওয়া যায় না। সাফল্য পেতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'যেকোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হলে ওই বিষয়ে অন্তত ১০ বছর অথবা ১০ হাজার ঘণ্টা সময় দিতে হবে।' একজন শিল্পী আর আরেকজন গুণী শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় কিন্তু এই পরিশ্রমই।

আমি তাইওয়ান থেকে আমার মায়ের হাত ধরে ছোটবেলায় আমেরিকায় এসেছিলাম। ১০ বছর বয়সী আমি তখন শুধু 'শু' মানে জুতা কথাটি ইংরেজিতে বলতে পারতাম। কিন্তু আমি মোটেই ভেঙে পড়িনি। আমি অনেক পরিশ্রম করতাম, অনেক বেশি পড়াশোনা করতাম। হ্যাঁ, এটা সত্যি, এর অনেক দিন পর ইয়াহু শুরু করার সময় ভাগ্যের সহায় অবশ্যই পেয়েছিলাম। কিন্তু এই ভাগ্য সহায় হয়েছিল আমার প্রবল পরিশ্রমের কারণেই। সেই সঙ্গে আমার পরিবার ও বন্ধুদের উৎসাহ তো ছিলই। এমনকি আমি যখন আমার মাকে বললাম, আমি আর পিএইচডির গবেষণা করব না, ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনের একটা কাজ শুরু করব, তখন তিনি আমার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দিহান থাকলেও কোনো আপত্তি না করে সমর্থন দেন। আর এত বছর পর আমার সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো অভিযোগ করার সুযোগও এখন খুঁজে পান না আমার মা।

তৃতীয় কথা: যত প্রতিকূলতাই আসুক, নিজের কাছে যা ভালো মনে হয়, তাই-ই করো।

আমি আর ডেভিড ফ্লিও তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসের কাজ করছিলাম। আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল, কীভাবে

কম্পিউটার চিপস আরও শক্তিশালী করা যায়। সে সময়ই আমরা ওয়েব জগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। আর সত্যি সত্যিই এর প্রেমে পড়ে যাই। আমরা আমাদের গবেষণার সব কাজ ফেলে রেখে ইয়াহু তৈরিতে লেগে পড়ি।

আমরা কখনো ভাবিনি, একদিন ইয়াহু এত বড় একটা বিজনেস জায়ান্ট হয়ে যাবে। তখন আমাদের এটা ভেবে মজা লাগত যে কত মানুষ আমাদের ইয়াহু ব্যবহার করছে! খুবই ভালো লাগত তখন।

যদি দেখো, কোনো কিছু তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে, অথচ এটা তোমার সাধ্যের বাইরে হবে, তাহলে একটাই উপদেশ—সেই কাজটি অবশ্যই করো, প্রচুর পরিশ্রম করে হলেও।

চতুর্থ কথা: বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে হবে।

বিশ্ব ভ্রমণ করে যেমন বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি ইন্টারনেটে লগইন করেও তা জানা যায়। পৃথিবী দেখতে হবে, জানতে হবে মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে। সুতরাং বেরিয়ে পড়ো, পৃথিবীটা দেখো। পৃথিবীকে চেনো, পৃথিবীর মানুষকে জানো। মনীষী অগাস্টিন বলেছেন,'পৃথিবী হলো একটা বিশাল বই, আর যারা পৃথিবী ঘুরে দেখেনি, তারা এই বইয়ের শুধু একটা পাতা পড়েছে।'

পাঁচ নম্বর কথা: জানার কোনো শেষ নেই।

জানার কোনো শেষ নেই—তাই সবকিছু সম্পর্কেই জানতে হবে। যত জানবে জীবনের সফলতার পথে তত এগিয়ে যাবে। আমি কলেজে পড়ার সময় মুঠোফোন ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। ভাবতেও অবাক লাগে, তখন কীভাবে দিন পার করতাম, পড়াশোনা করতাম! আমার দুটো ছোট মেয়ে আছে। আকাশ কেন নীল, সেটা জানার জন্য ওরা আর আমাকে জিজ্ঞেস করে না। কারণ, এখন ওদের হাতে আছে ইন্টারনেট। দুনিয়া এখন ওদের নখদর্পণে। কোনো কিছু না জানার অজুহাত ওরা আর এখন দিতে পারবে না।

গুপ্তধনের ভান্ডার তোমাদের সামনে! তথ্যপ্রযুক্তি পাল্টে দিচ্ছে দুনিয়াকে। তোমাদের হাতের কাছে

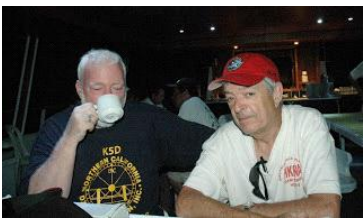
কী আছে, সেটা তোমরা বুঝতেই পারছ। তোমরা জানার আগ্রহ কখনো হারাবে না। জানতেই থাকবে, শিখতেই থাকবে।

শেষ এবং সবচেয়ে জরুরি কথা: জীবনটাকে হালকাভাবে নাও।

তোমরা কি জানো, 'ইয়াহু' নামটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? যদি ডিকশনারিতে খুঁজে দেখো, তাহলে এর অর্থ পাবে 'নেতিবাচক অন্য রকম কিছু'। আমি আর ডেভিড ফ্লিও তো আমাদের থিসিসের কাজ ছেড়ে এ রকম কিছুই করছিলাম ইয়াহু তৈরির সময়। তাই আমরা এটার নাম দিয়েছিলাম 'ইয়াহু!' এমনকি এখনো আমাদের ইয়াহু অফিসের সাজসজ্জা দেখলে যে কেউ অবাক হবে। একেবারে হালকা চিন্তাভাবনা নিয়ে সাজানো আমাদের অফিস। আমি মনে করি, জীবনটাকে যদি হালকাভাবে নিতে না পারো, তবে তুমি জীবনটাকে নষ্ট করছ। আজ থেকে তোমাদের নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু হচ্ছে। সামনের জীবনটা অনেক সুন্দর। কিন্তু তোমাদের মনে নিশ্চয় অনেক জিজ্ঞাসা আর সংশয় রয়েছে। জীবনটা কী, সেটা জানার চেষ্টা রয়েছে। তাহলে তোমাদের বিখ্যাত মনীষী রালফ ওয়ালডো এমারসনের একটা কথা শোনাই, 'জীবন হলো অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয়, যে বিষয়গুলো জানতে পুরো জীবন পার করতে হবে।'তাহলে আর ভাবনা কিসের! জীবন তো অনেক বড়! তোমার দায়িত্ব হলো এই জীবনের অচেনা-অজানা পথে হেঁটে যাওয়া। ভাবনামুক্ত থাকো, শিখতে থাকো, জানতে থাকো। তবে জীবনের এ যাত্রায় তোমার কাছের মানুষদের কথা কখনো ভুলে যেয়ো না। কারণ, তারা জানে তুমি কে, তুমি কী করতে পারো। তুমি তাদের কাছে অনেক কিছু। জীবনের পথে যাদের পাশে পেয়েছ তাদের কখনো ভুলে যেয়ো না।এবার তাহলে বিদায় জানাই গ্র্যাজুয়েটদের। ভালো থাকো। মাহালো! (ধন্যবাদ)

স্টিভ বলমার(মাইক্রোসফটের সিইও)

নতুন চিন্তাকে গুরুত্ব দাও



মাইক্রোসফটের সিইও স্টিভ বলমার ১৯৫৬ সালের ২৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা অবস্থায় ১৯৮১ সালে মাইক্রোসফটে যোগ দেন। ২০১১ সালের ১৩ মে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তব্য দেন স্টিভ বলমার

২০১১ সালের স্নাতকদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার নিজের কথাগুলো শুরু করব। সবাই অনেক ভাবের কথা বলবে যে এটা পথচলার শুরু, নতুন জীবনের শুরু—এই সব। কিন্তু আমার কাছে এটা হলো আনন্দ উদ্যাপনের উপলক্ষ। কারণ এটা তোমাদের প্রাপ্য ছিল এবং তোমাদের পরিবারের সদস্যরাও এই কৃতিত্বের অংশীদার।

দুই বছর আগেও আমি তোমাদের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া সম্পর্কে কিছু জানতাম না। আমি এখানে কোনো দিন আসিওনি। দুই বছর আগে এখানে এসেছিলাম আমার সন্তানের গ্র্যাজুয়েশনের দিন। একটা গল্প বলি তোমাদের। কিছুদিন আগের কথা, আমি এখানে আসছিলাম, তখন আমার এক বন্ধুর ছেলে আমাকে দেখিয়ে বলল, ইউএসসি (ইউনিভার্সিট অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া) ভুয়া, আর ওর নিজের ইউসিএলএ (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস) হলো সেরা। আমি তখন নিমেষের মধ্যে পকেট থেকে আমার উইন্ডোজ মুঠোফোন বের করে ওকে দেখিয়ে দিলাম যে র‍্যাংকিংয়ে ইউএসসির অবস্থান হলো ২৩ আর ইউসিএলএর অবস্থান ২৫। হাহ্ হাহ্ হাহ্!

আমরা এখন বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার আবিষ্কারের ৬০ বছর পার করে এসেছি। আজ প্রযুক্তি ছাড়া যে বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি

তা ভাবতেই অবাক লাগে। শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, যোগাযোগ—সবকিছুতেই আজ প্রযুক্তি ঢুকে গেছে। আমি আমার সামনে উপবিষ্ট অভিভাবকদের প্রশ্ন করব, আপনারা কি ছাত্রজীবনে কখনো ওয়ার্ড প্রসেসর, কম্পিউটার এসবের সাহায্যে কোনো টার্ম পেপার বা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছেন?

আমি যখন মাইক্রোসফটে যোগ দিই তখন আমার পড়াশোনা শেষ হয়নি। আমি তখন এমবিএ পড়ছিলাম। তখন আমার এক বন্ধু, ওর নাম বিল গেটস, আমাকে বলল, 'আ রে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমার সাথে যোগ দাও না কেন?' পড়াশোনা বাদ দেওয়াটা আমার বাবা-মা সহজে মেনে নেবেন না এটা জানতাম। যা-ই হোক, বাসায় গিয়ে এ কথা তুলতেই আঁতকে উঠল বাবা-মা। বাবা-মার জেরা শুরু হলো, 'পড়াশোনা বাদ দিয়ে কার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ? কী করে ওরা?' আমি বলি, 'সফটওয়্যার তৈরি করে।' মা বলে, 'সফটওয়্যার জিনিসটা কী?' ভেঙে বলি আমি। শুনে মা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'মানুষ কম্পিউটার নিয়ে কী করবে? এটার আবার কী দরকার!' সময়টা ছিল আশির দশক। আর এখন কী অবস্থা দেখো। এখনো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি তোমাদের শুধু তিনটা বিষয় নিয়েই ভাবতে বলব।

প্রথমত, নতুন ভাবনা, মৌলিক চিন্তাকে গুরুত্ব দাও।

মাইক্রোসফট কিন্তু শুধু একটা মৌলিক চিন্তাকে, নতুন ভাবনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিল গেটস আর পল অ্যালেনের অসাধারণ নেতৃত্ব যা আর কোনো প্রতিষ্ঠান পেয়েছে কি না সন্দেহ। মাইক্রো প্রসেসর চালানোর মতো সফটওয়্যার দিয়েই কম্পিউটার হলো। সেই কম্পিউটার ছড়িয়ে গেল সবখানে। গবেষণাগারে, অফিসে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। এরপর প্রতিটি বাসায় স্থান করে নিল এই প্রযুক্তি। এখন এই প্রযুক্তি তো পকেটেও চলে এসেছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে টেলিভিশনেও। আর এ সবই কিন্তু একটা ছোট্ট ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়েই হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুপ্ত আগ্রহ। এটা কিন্তু খুব সহজ জিনিস নয়। অনেকেই মনে করে, এটা হয়তো নিজে থেকেই চলে আসে। অনেকের ধারণা, এটা যার থাকে তার এমনিতেই থাকে, আবার যার থাকে না তার থাকেই না। আমি তোমাদের বলব, এই ধারণাটা ভুল ছাড়া আর কিছুই না। নিজে মন, প্রাণ, মস্তিষ্ক দিয়ে খাটলে এটা কিছুই না। নিজের আসল আগ্রহ কিসে সেটা তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। এমন কিছুর সঙ্গে জড়িত হও, কাজ করার সময় নিজের পছন্দের ক্ষেত্র এমনভাবে বেছে নাও, যেন দুর্দিন এলেও মাথা উঁচু করে বলতে পারো, 'যত সমস্যাই হোক না কেন, আমি আমার নিজের কাজ ভালোবাসি।'

এবং শেষটি হলো, লেগে থাকতে হবে সব সময়। কোনো কিছুতে হার মানা যাবে না। চলার পথ কখনোই সহজ হবে না। কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। লেগে থাকতে হবে সব সময়। আমাদের কথাই ধরো, আমাদের সময় শুধু মাইক্রোসফট একা নয়, একই সময় আরও অনেক প্রতিষ্ঠান বাজারে এসেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই আজ ধুলোয় মুছে গেছে। অথচ আজও মাইক্রোসফট টিকে আছে। এর কারণ একটাই, আমরা কখনো হার মানতে রাজি ছিলাম না। আমাদের অনেক কঠিন সময় এসেছে, যখন মনে হয়েছে বাজার থেকে ছিটকে পড়তে হবে আমাদের, কিন্তু আমরা ঠিকই ফিরে এসেছি আবার। কারণ আমরা সব সময় আমাদের কাজের পেছনে সময় দিয়েছি, দিন-রাত লেগে থেকেছি কাজের পেছনে। ঠিক একই ধরনের ইতিহাস অ্যাপল, গুগল, ফেসবুকেরও রয়েছে।

কথাগুলো শুধু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করবে তাদের বলছি না। যারা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করবে, ব্যবসায় ক্যারিয়ার গড়বে, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবে, তাদের সবাইকে বলছি কথাগুলো। কখনো হার মেনে বসে থাকা যাবে না। সব সময় চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, লেগে থাকতে হবে নিজের কাজের পেছনে। আমি জানি তোমরা পারবে। বিদায়।

ল্যারি স্যাঙ্গার(দার্শনিক ও উইকি এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা)

জীবনের মানে কী



কথাগুলো ক্লিশে, তাই সাবধান করে দিচ্ছি—আমি পড়াশোনা করেছি দর্শনশাস্ত্রে। তাই মূল কথায় পৌঁছানোর আগে একটু অন্য প্রসঙ্গেও ঘোরাফেরা হতে পারে।

১৯৮৯ সালে আমি রিড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলাম। আমার নির্বোধ মস্তিষ্কে একটা ব্যাপার ঢুকে গেল। বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের অফিসে ঢুকে পড়তাম আর বিনা ভূমিকায় তাঁদের প্রশ্ন করে বসতাম—জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কী? মোটামুটি সবার কাছ থেকেই জবাব পেয়েছি। তবে দু-একজন যে বিস্মিত হয়ে তাকাতেন না, তা নয়। কয়েকজন আমাকে বাঁধাধরা উত্তরটাই দিয়েছেন—সুখ। সবশেষ যাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মারভিন লেভিচ, পরে আমার থিসিস অ্যাডভাইজর হয়েছিলেন। তাঁর সেই 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ'—দৃষ্টি এখনো মনে পড়ে। বিড়বিড় করে বললেন তিনি—জ্ঞান। তবে তাতে দৃঢ়তা ছিল না। শেষমেশ আমার উত্তরটাই বললাম—সততা। অধ্যাপকও মেনে নিলেন।

আমি এখনো মনে করি, সততা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্লিশে প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জীবনের অর্থ কী?

আপনারা উত্তর দেবেন সুখ, সে সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু তাতে আসলে কিছু বোঝা যায় না। কারণ, সব মানুষ তো একই জিনিসে সুখী হয় না। আমরা তাই খুঁজি কোন জিনিসটি আমাকে সুখী করবে।

উত্তর তো পাওয়া গেল। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েই যায়। জীবনের মানে নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রসঙ্গটা তো শেষ হচ্ছে না। আমার মনে হলো, অধ্যাপক হতে পারলেই আমি সবচেয়ে সুখী হব। তখনো কিন্তু আমি জীবনের অর্থ খুঁজতেই

থাকব।
'জীবনের অর্থ কী' প্রশ্নটা তোলাই বোধহয় বিব্রতকর। জীবনের তো একটা লক্ষ্য থাকতেই হবে। যে লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনি সারা দিন কাজ করবেন। আপনার প্রশ্ন তোলার মানেই হলো এমন কোনো লক্ষ্য আপনার জীবনে নেই। দিশেহারা, ভাসমান জীবন আপনার।
ঠিক আছে, জীবনের লক্ষ্য নিয়ে না-ই ভাবলাম। মানুষ কেন জীবন দেয়, সেটা ভেবে দেখুন। যেসব বীর যুদ্ধে বা কাউকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ দেন, তাঁদের কথাই ধরুন। তবুও কেউ বলে না তাঁদের জীবন অর্থহীন। বরং তাঁদের ত্যাগটাই যেন জীবনকে নতুন অর্থ দেয়। আমি বুঝতে পেরেছি, শেষ পর্যন্ত আসলে আমি অন্যের জন্যই ভাবি। আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, বন্ধু। আমার মনে হয় বাকিরাও আমার মতো করেই ভাবে। আমি অবশ্য বলছি না যে আসলে এটাই হওয়া উচিত। যা সাধারণত হয়, তা-ই বলছি। এ কথাগুলো আশ্চর্য শোনাতে পারে। কারণ, মানুষ আগে নিজের কথাই ভাবে—এমন ধারণা প্রচলিত। আমি মনে করি, ব্যাপারটা উল্টো। আমাদের আশপাশের মানুষের জীবন আরও সুন্দর হবে কীভাবে—এটাই আমাদের তাড়না। আমরা আসলে কাছের মানুষদের জন্যই কাজ করি। বিয়ের পর, সন্তান হওয়ার পর আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম।
প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে বিবেকহীন, ক্ষমতালোভী মানুষের বেলায় কী হয়? তাঁরা কার জন্য ক্ষমতা চান? অবশ্যই তাঁদের নিজেদের জন্য। কিন্তু তাঁদের কাছেও অন্য কারও খুশি গুরুত্বপূর্ণ। এই 'অন্য কেউ'টা থাকতেই হবে। কে-ই বা শুধু নিজের জন্য ক্ষমতা চান না। এটা জ্ঞান অন্বেষণকারী বা শিল্পীদের জন্যও প্রযোজ্য। সমাজের মানুষ, শ্রোতা ছাড়া তাঁদের কাজটা তো বৃথাই হয়ে যায়।
তো জীবনের অর্থ কী? আমার উত্তর হলো, আমার কাছের মানুষদের সুখী করার জন্য কাজ করা।
আমাদের সবার চোখেই বড় স্বপ্ন থাকে। বাস্তবতা একসময় হানা দেয়, যা আমরা হতে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
চাই তা আর হয়ে ওঠা হয় না। আমার বেলায় এমনই হয়েছে। দর্শনের অধ্যাপক হওয়ার কথা ছিল, এখন এনসাইক্লোপিডিয়া ওয়েবসাইট পরিচালনা করছি। এটা ভালো বা খারাপ যা-ই হোক, যা করেছি তা আসলে করব বলে ভেবে রাখিনি।

বয়স যখন কম, তখন আসলে আমরা বুঝতে পারি না কোন জিনিসটা আমাকে বা আমাদের কাছের মানুষকে সুখী করবে। আমার কথায় আহত হবেন না। আমাদের কাছের মানুষ আসলে কারা, সেটাই হয়তো তখনো বোঝা হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য ছুটতে পারি, একটা সময়ে এসে মনে হবে এ কাজটা তো আমি ঘৃণা করি। মানুষের চাওয়া, মূল্যবোধ, আগ্রহ সময়ের সঙ্গে বদলায়। এই বদলটা যদি বুঝতে না পারি, তাহলেই কিন্তু নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে।

এই সময়ের জীবনযাত্রা আমাদের এমনটাই বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। তার কারণ হলো, জীবনটা এখন চিত্রনাট্যের মতো হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে তার ফর্মুলা যেন বলে দেওয়া আছে এই চিত্রনাট্যে। আমরা এই চিত্রনাট্যই অনুসরণ করে যাই। আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চাই। কিন্তু এ জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। চিত্রনাট্য অনুযায়ী চলে আমরা পেতে পারি শিক্ষা, ভালো বেতনের চাকরি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, সুখী পরিবার। মন্দ নয় ব্যাপারটা। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই, যখন আপনি আবিষ্কার করবেন এ কাজগুলো আসলে আপনার নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এখানেই প্রয়োজন সততার।

শেষটা আমি এভাবে বলতে চাই। সারা জীবন আমাদের উচিত বারবার ভাবা—প্রিয়জনদের সুখী করার জন্য আমার কী করা উচিত। সততার সঙ্গে বাঁচা খুব কঠিন কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়, যাতে আমরা একটা অর্থপূর্ণ জীবন পেতে পারি। আর আপনাদের আমি সেই শুভকামনা জানাই।

সূত্র: ওয়েবসাইট। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: রুহিনা তাসকিন

Web: http://tanbircox.blogspot.com

সারজি ব্রিন(গুগল'র বর্তমান সভাপতি)



গুগল প্রযুক্তির বর্তমান সভাপতি এবং সহ প্রতিষ্ঠাতা সারজি ব্রিন প্রযুক্তি জগতের এক বরেন্য ব্যাক্তিত্ব। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীন সারজি ব্রিন ইন্টারনেট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি ল্যারি পেইজের সঙ্গে মিলে তৈরি করেন বিজ্ঞানভিত্তিক টেক্সট যা ওয়েব সাইটে সহজে পাঠানো যায়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক করার সময় ল্যারি পেইজের সাথে মিলে একটি খসড়া তৈরি করেন যার নাম দেন 'বৃহৎ আকারের হাইপারটেক্সটচুয়াল ওয়েব সার্স ইঞ্জিন'।বর্তমান গুগল প্রযুক্তির ভিত্তি তখন থেকেই গড়ে উঠে।

প্রযুক্তি জগতের অন্যতম এই কর্ণধার ১৯৭৩ সালে ২১ আগস্ট রাশিয়ার মস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। গণিতবিদ ও অর্থনীতিবিদ বাবা মাইকেল ব্রিন ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন। সারজী ব্রিনের যখন ছয় বছর বয়স তখন তারা অভিবাসি হয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। ১৯৭৩ সালে ব্রিন ম্যারিল্যান্ডের পেইন্ট মন্টেসুরি স্কুলে পড়াশোনা জীবন শুরু করেন। ছোট কাল থেকে ব্রিনের গণিতের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। পরিবার তাকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। ১৯৯০ সালে ব্রিন ভর্তি হন কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গণিতে। ১৯৯৩ সালে মে মাসে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন সায়জি ব্রিন। ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা চলিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পিএইডডি করার জন্য

প্রস'তি নেন। যদিও তিনি পরে পিএইচডি লাভে ব্যর্থ হন। সারজি ব্রিন বিখ্যাত ডি এমপ্রিসা ইনস্টিটিউট থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। সারজি ব্রিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম ধনী এবং তার স্থান ছাব্বিশতম । তার সম্পদের পরিমাণ আঠারো দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ল্যারি পেইজের সাথে মিলে ব্রিন বোয়িং ৭৬৭ বিমান ক্রয় করেন। এটি তাদের ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক দুই কাজেই ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে ডিজাইনকৃত এই বিমানটি পঞ্চাশ জন যাত্রী বহনে সক্ষম।

বিখ্যাত চলচিত্র 'ব্রোকেন অ্যারো' এর নির্বাহী প্রযোজক ব্রিন এর মিডিয়াতেও রয়েছে সরব উপসি'তি। ২০০৪ সালে এবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ সারজি ব্রিনকে 'পারসন অফ দি উইক' ঘোষণা করে। ২০০৫ সালে ব্রিন অন্যতম 'ইয়াং গ্লোবাল লিডার' হিসাবে মনোনীত হন। টেসলা মটরের অন্যতম কর্ণধার সারজী ব্রিন ইলেকট্রিক চালিত যানের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৭ সালের মে মাসে অ্যানি ইউজসিকিকে বিয়ে করেন এই বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ।

লিনাস টরভেল্ড(লিনাক্স' অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবক)



ইউনিক্স এর মতো গোপনীয় আর জটিল অপারেটিং সিস্টেমকে সহজ আর মুক্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লিনাস টরভেল্ড 'লিনাক্স' অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবন করে প্রযুক্তি জগতে বিপ্লবের সূচনা করেন। লিনাস টরভেল্ড এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলেছে অপারেটিং সিস্টেম এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি।

লিনাস বিশ্বাস করেন, ওপেন সোর্স হচ্ছে সফটওয়্যার ব্যবহারের সবচেয়ে সঠিক পন্থা। যদিও তিনি নন – কারন্যাল ডাটাবেজকে সমর্থন করেন না।

কম্পিউটারের সঙ্গে লিনাস টরভেল্ড এর প্রথম সখ্য গড়ে উঠে কমোডোর ভিক -২০ নামক

কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে। এরপর সিনক্লিয়ার কিউএল নামক কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে অপারেটিং সিস্টেম এর ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং লেখার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেন। এই সময় তিনি কিছু কম্পিউটার গেইমও তৈরি করেন। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে ৮০৩৮৬ ভিত্তিক আইবিএমের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি লিনাস অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কাজ শুরু করেন।

বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেলেও লিনাস টরভেল্ড ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিং শহরে জন্ম গ্রহণ করেন ঊনিশ ঊনসত্তর সালের আটাশে ডিসেম্বর । পিতা আননা টরভেলস এবং মাতা নীলস টরভেলস দু'জনেই সাংবাদিক ছিলেন। আর দাদা ওলি টরভেলস ছিলেন বিখ্যাত কবি। আমেরিকার বিখ্যাত রসায়নবিদ এবং নোবেল বিজয়ী লিনাস পাউলিং এর নামানুসারে বাবা-মা তার নাম রাখেন 'লিনাস'। তবে লিনাস মনে করেন তার নাম রাখা হয়েছে বিখ্যাত কমিকস বই 'চীনাবাদাম এর চরিত্র লিনাস অনুসারে । ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত টরভেল্ড হেলসিংকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর স্নাতকোত্তর থিসিসের শিরোনাম ছিল 'লিনাক্স, একটি গ্রহণযোগ্য অপারেটিং সিস্টেম।' পরের তিন বছর তিনি কাজ করেন লিনাক্স এবং ইউনিক্স এর জন্য একটি আর্দশ বাইনারি ফরম্যাট তৈরি করতে।

কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য টাইম ম্যাগাজিন কর্তৃক নির্বাচিত সেরা একশ' ব্যক্তিত্বের মধ্যে ষোলতম হয়েছিলেন লিনাস। বিজনেস উইক ম্যাগাজিনের জরিপে সেরা ব্যবস্থাপক হিসাবেও স্বীকৃতি পান তিনি।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হন লিনাক্স টরভেল্ড।

ড. ক্রেইগ আর ব্যারেট(ইন্টেলের চেয়ারম্যান)



বিশ্বের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ইন্টেল। এই প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ আর ব্যারেট। তিনি যে কেবল ইন্টেলের চেয়ারম্যান তাই নয় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সংগঠকও।ক্রেইগ ব্যারেটের জন্ম ১৯৩৯ সালে সানফ্রান্সিসকোতে। তিনি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি লাভ করেন বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি যোগ দেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও প্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক হিসেবে। তিনি এই বিভাগে যুক্ত ছিলেন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। সে সময় তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করছিলেন।

ব্যারেট ১৯৭২ সালে ডেনমার্কের ড্যানিশ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুলব্রাইট ফেলো লাভ করেন। এর আগে ১৯৬৪-৬৫ সালে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরি থেকে লাভ করেন এনএটিও পোষ্ট-ডক্টোরাল ফেলো। তিনি তার শিক্ষকতা জীবনে ম্যাটেরিয়াল প্রোপার্টিজের উপর মাইক্রোস্ট্রাকচারের প্রভাব নিয়ে প্রায় ৪০ টির মতন গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ম্যাটেরিয়াল সাইন্সের উপর তার লেখা একটা বই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

১৯৭৪ সালে তিনি ইন্টেল কর্পোরেশনে টেকনোলজি ডেভোলপমেন্ট অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদা লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯০ সালে হন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদন্নতি পান।

BarrettIcon১৯৯২ সালে তিনি ইন্টেলের পরিচালক পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৩ সালে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৯৭ সালে তিনি ইন্টেলের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনিত হন। ১৯৯৮ সালে প্রধান নির্বাহি

কর্মকর্তা বা চিফ এক্সিকিউটিভ আফিসার পদ লাভ করেন। ২০০৫ সালের ১৮ই মে তিনি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন।

ড. ব্যারেট ইন্টেল ছাড়াও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। জাতিসংঘের গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভোলপমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ট্রেড পলিসি এন্ড নেগোশিয়েশনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কমিটি এবং আমেরিকান হেলথ ইনফরমেশন কমিউনিটির অন্যতম সদস্য ড. ব্যারেট।

এছাড়াও তিনি বিজনেস কোয়ালিশন ফর স্টুডেন্ট এচিভমেন্ট এবং ন্যাশনাল ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ লিডারশিপ কাউন্সিলের যুগ্ম-চেয়ারম্যান এবং ইউএস কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল এর ট্রাস্টি বোর্ডের একজন মেম্বার।

এখানেই শেষ নয়, 'ইনোভেশন আমেরিকা' নামের ন্যাশনাল গভার্নরস এসোসিয়েশন টাস্ক ফোর্স, ন্যাশেনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এডভাইজরি কাউন্সিল এবং সাইন্টিফিক কমিউনিকেশন এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির একজন সদস্য এবং ইউএস সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাষ্ট্রি এসোসিয়েশন, ন্যাশেনাল কাউন্সিল ফর মাইনোরিটিস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, দি ন্যাশনাল ফরেষ্ট ফাউন্ডেশন, আর্কাইভ এবং টেকনেকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের একজন সদস্য।

শিক্ষাবিদ এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা হবার কারনে ড. ব্যারেট সবসময় চেষ্টা করেছেন ছাত্রদের জন্য নতুন কিছু করতে। এজন্য তিনি স্কুলগুলোর মান উন্নত করা এবং বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষার পথ উম্মুক্ত করতে চেষ্টা করে গেছেন সর্বদা।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি সব সময় পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষার বিভিন্ন দিক সর্ম্পকে। বিভিন্ন স্কুলগুলোর মান বাড়ানোর বিষয়ে ওকালতিতে তার জুড়ি ছিল না।

তার ব্যাক্তিগত উদ্যেগে ২০০০ সালে বোষ্টনে চালু হয় কম্পিউটার ক্লাব-হাউস নেটওয়ার্ক। এই ক্লাবের লক্ষ্য সমাজে প্রযুক্তিগত মতপার্থক্য কমিয়ে আনা। এর পরপরই সাড়া বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত দেশগুলোতে চালু হয় ক্লাবহাউস সংস্কৃতির। এসব ক্লাবহাউসগুলো কাজ করে যাচ্ছে মূলত একটা

www.facebook.com/tanbir.ebooks
নিরাপদ পরিবেশে তরুন মেধাবীদেরকে উন্নতমানের প্রযুক্তিগত সেবা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মেধাবিকাশে সাহায্য করা। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে তার গৃহিত অন্য উদ্যেগগুলোর মধ্যে আছে -

১. ইন্টেল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ অ্যাওয়ার্ড স্কলারশিপ। যার অন্য নাম 'জুনিয়র নোবেল প্রাইজ'।

২. ২০০১ সালে চারটি স্থানে ইন্টেলের অলাভজনক ক্লাবহাউস তৈরি করেন।

৩. শিক্ষায় অবদানের জন্য ন্যাশেনাল অ্যালায়েন্স অফ বিজনেস অনার্স ঘোষণা।

৪. ২০০১ সালে ইন্টেলের সকল 'কে-১২' শিক্ষক এবং প্রি-সার্ভিস ফ্যাক্যাল্টির জন্য টিচার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রসার বাড়ান।

৫. ২০০১ সালে এডুকেশনাল লিডারশিপের জন্য অনার্স ঘোষণা।

তার আরও অবদান

ক্রেইগ ব্যারেট ছিলেন আমেরিকান সেমিকন্ডাক্টর শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি এই শিল্পের উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করেন। তার এই গবেষণা ব্যবস্থা অনুসারেআমেরিকার প্রায় ডজনখানেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাটেরিয়াল, স্ট্রাকচার, সার্কিট, সিস্টেম, সফটওয়্যার, ইন্টারকানেক্ট, ডিজাইন এবং এগুলো পরীক্ষনে ভবিষ্যতে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেই সব বিষয়ে গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যাবস্থা করেন।

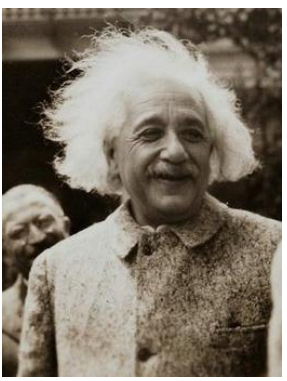
ড. ব্যারেট বিশ্বাস করেন যে 'কম্পিউটার যাদু করতে পারে না, তবে শিক্ষকরা পারেন'। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি একটি প্রকল্প হাতে নেন যেই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২৫ টি দেশের কমপক্ষে দশ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে যেন তারা শ্রেনীকক্ষে প্রযুক্তি ব্যাবহার করার মাধ্যমে শিক্ষার মান বাড়াতে পারেন

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)

ALBERT EINSTEIN

জার্মানির একটি ছোট শহর উলমে এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম (১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ)।পিতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। মাঝে মাঝেই ছেলেকে নানা খেলনা এনে দিতেন। শিশু আইনস্টাইনের বিচিত্র চরিত্রকে সেই দিন



উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি তার অভিভাবক, তার শিক্ষকদের। স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই অভিযোগ আসত পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া ছেলে, অমনোযোগী, আনমনা। ক্লাসের কেউ তার সঙ্গী ছিল না। সকলের শেষে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতেন।

শুধু একমাত্র সঙ্গী তার মা। তার কাছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নানা সুর শোনেন। আর বেহালায় সেই সুর তুলে নেন। এই বেহালা ছিল আইনস্টাইনের আজীবন কালের সাথী। বাবাকে বড় একটা কাছে পেতেন না আইনস্টাইন। নিজের কারখানা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। আনন্দেই কাটছিল তার জীবন।

সেই আনন্দে ভরা দিনগুলোর মাঝে হঠাৎ কালো ঘনিয়ে এল। সেই শৈশবেই আইনস্টাইন প্রথম অনুভব করলেন জীবনের তিক্ত স্বাদ। তারা ছিলেন ইহুদি। কিন্তু স্কুলে ক্যাথলিক ধর্মের নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। স্কুলের সমস্ত পরিবেশটাই বিষাদ হয়ে যায় তার কাছে। দর্শনের বই তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত। পনেরো বছর বয়সের মধ্যে তিনি কান্ট, স্পিনোজা, ইউক্লিড,



নিউটনের রচনা পড়ে শেষ করে ফেললেন। বিজ্ঞান, দর্শনের সাথে পড়তেন গ্যেটে, শিলার, শেক্সপিয়ার। অবসর সময়ে বেহালায় বিটোফোন, মোতসার্টের সুর তুলতেন। এরাই ছিল তার সঙ্গী বন্ধু, তাঁর জগৎ।এই সময় বাবার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। তিনি স্থির করলেন মিউনিখ ছেড়ে মিলানে চলে যাবেন। তাতে যদি ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। সকলে মিউনিখ ত্যাগ করল, শুধু সেখানে একা রয়ে গেলেন আইনস্টাইন।সুইজারল্যান্ডের একটি পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথমবার তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পরীক্ষায় পাস করলেন। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছে। আইনস্টাইন অনুভব করলেন সংসারের দায়-দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিত নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতার জন্য বিভিন্ন স্কুলে দরখাস্ত করতে আরম্ভ করলেন। অনেকের চেয়েই শিক্ষাগত যোগ্যতা তার বেশি ছিল কিন্তু কোথাও চাকরি পেলেন না। কারণ তার অপরাধ তিনি ইহুদি।আইনস্টাইন যখন দুই বছর বয়স নিরুপায় আইনস্টাইন খরচ চালানোর প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। এই সময় আইনস্টাইন তার স্কুলের সহপাঠিনী মিলেভা মারেককে বিয়ে করলেন। তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। মিলেভা শুধু আইনস্টাইনের স্ত্রী ছিলেন না, প্রকৃত অর্থেই তার জীবনসঙ্গী ছিলেন। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন শিক্ষকতার কাজ পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অফিসে ক্লার্কের চাকরি নিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের খাতার পাতায় সমাধান করতেন অঙ্কের জটিল তত্ত্ব। স্বপ্ন দেখতেন প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করার। তার এই গোপন সাধনার কথা শুধু মিলেভাকে বলেছিলেন, 'আমি এই বিশ্বপ্রকৃতির স্থান ও সময় নিয়ে গবেষণা করছি।' আইনস্টাইনের এই গবেষণায় ছিল না কোনো ল্যাবরেটরি, ছিল না কোনো যন্ত্রপাতি। তার একমাত্র অবলম্বন ছিল খাতা-কলম আর

তার অসাধারণ চিন্তাশক্তি। অবশেষে শেষ হলো তার গবেষণা। তখন তার বয়স মাত্র ২৬ বছর। একদিন ত্রিশ পাতার একটি প্রবন্ধ নিয়ে হাজির হলেন বার্লিনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Annalen der physik-এর অফিসে।
এই পত্রিকায় ১৯০১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত আইনস্টাইন পাঁচটি রচনা প্রকাশ করলেন। এসব রচনায় প্রচলিত বিষয়কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আইনস্টাইনের নাম বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কোনো সুরাহা হলো না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে বাড়িতে ছাত্র পড়ানোর কাজ নিলেন। একদিকে অফিসের কাজ, মিলেভার স্নেহভরা ভালোবাসা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবশেষে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হলো তার চারটি রচনা-প্রথমটি আলোর গঠন ও শক্তি সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি অ্যাটমের আকৃতি-প্রকৃতি। তৃতীয়টি ব্রাউনিয়াম মুভমেন্টের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। চতুর্থটি তার বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। যা বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করল। এই আপেক্ষিকতা বলতে বোঝায় কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর তুলনা। আইনস্টাইন বললেন আমরা যখন কোনো সময় বা স্থান পরিমাপ করি তখন আমাদের অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। তিনি বলেছেন আলোক বিশ্বজগৎ, কাল এবং মাত্রা আপেক্ষিক। আমাদের মহাবিশ্বে একটি মাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয়, অন্য কোনো গতির সঙ্গেও এর তুলনা হয় না-এই গতি হচ্ছে আলোকের গতি। এই গতি কখনোই পরিবর্তন হয় না। এই সময় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো আইনস্টাইনকে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য। ১৯০৭ সালে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এরই সাথে পেটেন্ট অফিসের চাকরিও করেন।

বিজ্ঞান জগতে ক্রমশই আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজ্ঞানী কেলভিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

এখানে তাকে অনারারি ডক্টরেট উপাধি দেয়া হলো। এরপর তার ডাক এল জার্মানির সলসবার্গ কনফারেন্স থেকে। এখানে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সামনে তার প্রবন্ধ পড়লেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন কোনো এক তত্ত্ব পাব যা আলোর কণাতত্ত্ব এবং তরঙ্গ তত্ত্বকে সময়ের বাঁধনে বাঁধতে পারবে।

আইনস্টাইনের এই উক্তির জবাবে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক বললেন, আইনস্টাইন যা চিন্তা করছেন সেই পর্যায়ে চিন্তা করার সময় এখনো আসেনি। এর উত্তরে আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের t=mp2 উৎপত্তিটি আলোচনা করে বোঝালেন তিনি যা প্রমাণ করতে চাইছেন তা কতখানি সত্য।

১৯০৮ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ সৃষ্টি করা হলো। রাজনৈতিক মহলের চাপে এই পদে মনোনীত করা হলো আইনস্টাইনের সহপাঠী ফ্রেডরিখ এডলারকে। ফ্রেডরিক নতুন পদে যোগ দিয়েই জানতে পারলেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনের পরিবর্তে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তার তুলনায় আমার জ্ঞান নেহাতই নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উপলব্ধি করতে পারলেন ফ্রেডরিখের কথার গুরুত্ব। অবশেষে ১৯০৯ সালে আইনস্টাইন তার পেটেন্ট



অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করলেন। জুরিখে এসে বাসা ভাড়া করলেন।

আইনস্টাইন আর কেরানি নন, প্রফেসর। কিন্তু

মাইনে আগে পেতেন ৪৫০০ ফ্রাঙ্ক, এখনো তাই। তবে লেকচার ফি বাবদ সামান্য কিছু বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সুযোগে বহু মানুষের সাথে, গুণী বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় হয়। এমন সময় ডাক এল জার্মানির প্রাগ থেকে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তাকে নিয়োগপত্র দেয়া হলো। মাইনে আগের চেয়ে বেশি। তাছাড়া প্রাগে গবেষণার জন্য পাবেন বিশাল লাইব্রেরি। ১৯১১ সালে সপরিবারে প্রাগে এলেন আইনস্টাইন। কয়েক মাস আগে তার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়েছে।

অবশেষে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত জুরিখের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এল আইনস্টাইনের। ১৯১২ সালে প্রাগ ত্যাগ করে এলেন জুরিখে। এখানে তখন ছুটি কাটাতে এসেছিলেন মাদাম কুরি, সঙ্গে দুই কন্যা। দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে গড়ে উঠল মধুর বন্ধুত্ব। পাহাড়ি পথ ধরে যেতে যেতে মাদাম কুরি ব্যাখ্যা করেন তেজস্ক্রিয়তা আর আইনস্টাইন বলেন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। একদিন নিজের তত্ত্বের কথা বলতে বলতে এত



তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন পথের ধারে গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়লেন আইনস্টাইন। তাই দেখে মেরি কুরির দুই মেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। গর্ত থেকে উঠে তাদের সঙ্গে আইনস্টাইনও হাসিতে যোগ দিলেন।

সেই সময় জার্মানিতে কাইজারের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্লিন শহরে গড়ে উঠেছে কাইজার তিলহেলম ইনস্টিটিউট। বিজ্ঞানের এতবড় গবেষণাগার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে যোগ দিয়েছেন প্লাঙ্ক, নার্নস্ট, হারের আরো সব বিখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু আইনস্টাইন না থাকলে যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সবকিছু। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

বার্লিনে এলেন আইনস্টাইন। সবকিছু দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। শুধু গবেষণাগার নয়, বহু বিজ্ঞানীকেও কাছে পাওয়া যাবে। একসাথে কাজ করা যাবে। তাকে মাইনে দেয়া হলো বর্তমান মাইনের দ্বিগুণ।

১৯১৪ সালে বার্লিনে এলেন আইনস্টাইন। যখন আইনস্টাইন বার্লিন ছেড়েছিলেন তখন তিনি পনেরো বছরের কিশোর। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফিরে এলেন নিজের শহরে। চেনাজানা পরিচিত মানুষদের সাথে দেখা হলো। সবচেয়ে ভালো লাগল দূরসম্পর্কিত বোন কাছে ফিরে এসেছে। এলসার সান্নিধ্য বরাবরই মুগ্ধ করত আইনস্টাইনকে। অল্পদিনেই অনেকের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই যেখানে সেখানে অঙ্ক করার অভ্যাস ছিল আইনস্টাইনের। কখনো ঘরের মেঝেতে, কখনো টেবিলের ওপর। টেবিল ভর্তি হয়ে গেলে মাটিতে বসে চেয়ারের উপরেই অঙ্ক কষে চলেছেন।

গবেষণায় যতই মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন আইনস্টাইন, সংসারের প্রতি ততই উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। স্ত্রী মিলেভার সাথে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। ক্রমশই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন মিলেভা। দুই ছেলেকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে গেলেন। কয়েক মাস কেটে গেল আর ফিরলেন না মিলেভা।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। আইনস্টাইন এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে ব্যথিত হলেন। এরই সাথে সংসারের একাকিত্ব, স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় অসুস্থ আইনস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়ালেন এলসা। এলসার অক্লান্ত সেবা-যত্নে ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠলেন আইনস্টাইন। তিনি স্থির করলেন মিলেভার সাথে আর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয়। অবশেষে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আইনস্টাইন এলসাকে বিয়ে করলেন। এদিকে যুদ্ধ শেষ হলো। কাইজারের পতন ঘটল। প্রতিষ্ঠা হলো নতুন জার্মান রিপাবলিকের। আইনস্টাইনের

আপেক্ষিক তত্ত্ব তখনো প্রমাণিত হয়নি। এগিয়ে এলেন ইংরেজ বিজ্ঞানীরা। সূর্যগ্রহণের একাধিক ছবি তোলা হলো। সেই ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেল আলো বাঁকে।

বিজ্ঞানীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। মানুষ তার জ্ঞানের সীমানাকে অতিক্রম করতে চলেছে। অবশেষে ৬ নভেম্বর ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটিতে ঘোষণা করা হলো সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার, আলো বেঁকে যায়। এই বাঁকের নিয়ম নিউটনের তত্ত্বে নেই। আলোর বাঁকের মাপ আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে। পরিহাসপ্রিয় আইনস্টাইন তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে কৌতুক করে বললেন, আমার আপেক্ষিক তত্ত্ব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবার জার্মানি বলবে আমি জার্মান আর ফরাসিরা বলবে আমি বিশ্বনাগরিক। কিন্তু যদি আমার তত্ত্ব মিথ্যা হতো তাহলে ফরাসিরা বলত আমি জার্মান আর জার্মানরা বলত আমি ইহুদি।

একদিন এক তরুণ সাংবাদিক বললেন, আপনি সংক্ষেপে বলুন আপেক্ষিক তত্ত্বটা কী?

আইনস্টাইন কৌতুক করে বললেন, যখন একজন লোক কোনো সুন্দরীর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করে তখন তার মনে হয় যে যেন এক মিনিট বসে আছে। কিন্তু যখন তাকে কোনো গরম উনানের ধারে এক মিনিট দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় তার মনে হয় সে যেন এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। এই হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব।

আপেক্ষিক তত্ত্বে জটিলতার দুর্বোধ্যতার কারণে মুখরোচক কিছু কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক সুন্দরী তরুণী তার প্রেমিকের সাথে চার্চের ফাদারের পরিচয় করিয়ে দিল। পরদিন যখন মেয়েটি ফাদারের কাছে গিয়েছে ফাদার তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার প্রেমিককে আমার সব দিক থেকেই ভালো লেগেছে শুধু একটি বিষয় ছাড়া।

মেয়েটি কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করল, কোন বিষয়?

ফাদার বললেন তার কোনো রসবোধ নেই। আমি তাকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করেছি আর সে আমাকে তাই বোঝাতে আরম্ভ করল। হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটি।

আমেরিকার এক বিখ্যাত সুরকার জর্জ তার এক বন্ধুকে বললেন, একজন মানুষ কুড়ি বছর ধরে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেন, আর ভাবলে অবাক হতে হয় সেই চিন্তাটুকুকে প্রকাশ করলেন মাত্র তিন পাতায়। বন্ধুটি জবাব দিল নিশ্চয়ই খুব ছোট অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।
আইনস্টাইন আমেরিকায় গিয়েছেন, সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরল। একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এক কথায় আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারেন? আইনস্টাইন জবাব দিলেন, না। আজকাল মেয়েরা কেন আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে এত আলোচনা করছে? আইনস্টাইন হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েরা সব সময়ই নতুন কিছু পছন্দ করে-এই বছরের নতুন জিনিস হলো আপেক্ষিক তত্ত্ব।
অবশেষে এল সাধক বিজ্ঞানীর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিছুদিন ধরেই নোবেল কমিটি আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু সংশয় দেখা গেল স্বয়ং নোবেলের ঘোষণার মধ্যে। তিনি বলে গিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাবেন আবিষ্কারক আর সেই আবিষ্কার যেন মানুষের কল্যাণে লাগে। আইনস্টাইনের বেলায় বিতর্ক দেখা দিল তার আপেক্ষিক তত্ত্ব যুগান্তকারী হলেও প্রত্যক্ষভাবে তা মানুষের কোনো কাজে লাগবে না।
তখন তার ফটো ইলেকট্রিক অ্যাফেক্ট বা আলোক তড়িৎ ফলকে সরাসরি আবিষ্কার হিসেবে বলা সম্ভব এবং এর প্রত্যক্ষ ব্যবহারও হচ্ছে তাই ঘোষণা করা হলো Service to the theory of Physics, especially for the Law of the Photo Electric Effect.
আইনস্টাইন তার প্রথমা স্ত্রী মিলেভার সাথে বিবাহবিচ্ছেদের শর্ত অনুসারে নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটা তাকে পাঠিয়ে দেন। আমেরিকায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য বারবার ডাক আসছিল। অবশেষে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন, সেখানে অভূতপূর্ব সম্মান পেলেন। শুধু আমেরিকা নয়, যখন যে দেশেই যান সেখানেই পান সম্মান আর ভালোবাসা।

এদিকে স্বদেশ জার্মানি ক্রমশই আইনস্টাইনের কাছে পরবাস হয়ে উঠেছিল। একদিকে তার সাফল্য স্বীকৃতিকে কিছু বিজ্ঞানী ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, অন্যদিকে হিটলারের আবির্ভাবে দেশজুড়ে এক জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে একদল মানুষ। ইহুদিরা ক্রমশই ঘৃণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন জার্মানিতে থাকা তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু কোথায় যাবেন? আহ্বান আসে নানা দেশ থেকে। অবশেষে স্থির করলেন আমেরিকার প্রিন্সটানে যাবেন।

জার্মানি থেকে ইহুদি বিতাড়ন শুরু হয়ে যায়। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন এবার তারও যাওয়ার পালা। প্রথমে গেলেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৯৩৪ সালের ৭ জুলাই রওনা হলেন আমেরিকায়। তখন তার বয়স পঞ্চান্ন বছর। প্রিন্সটনের কর্তৃপক্ষ আইনস্টাইনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গুপ্তঘাতকের দল যে সাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসে পৌঁছবে না তাই বা কে বলতে পারে। তাই তাকে গোপন জায়গায় রাখা হলো। সেই বাড়ির ঠিকানা কাউকে জানানো হলো না। এভাবে থাকতে তার আর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরি থেকে এসে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রিন্সটনের ডিরেকটরের বাড়িতে ফোন এল দয়া করে যদি আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বরটা জানান। আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বর কাউকে জানানো হবে না বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ডিরেকটার।

খানিক পরে আবার ফোন বেজে উঠল। আমি আইনস্টাইন বলছি, বাড়ির নম্বর আর রাস্তা দুটোই ভুলে গিয়েছি। যদি দয়া করে বলে দেন। এ এক বিচিত্র ঘটনা, যে মানুষটি নিজের ঘরের ঠিকানা মনে রাখতে পারেন না, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের ঠিকানা খুঁজে বের করেন। প্রকৃতপক্ষে জীবনের উত্তরপর্বে এসে আইনস্টাইন হয়ে উঠেছিলেন গৃহ সন্ন্যাসী। বড়দের চেয়ে শিশুরাই তার প্রিয়। তাদের মধ্যে গেলে সবকিছু ভুলে যান। শিশুদের কাছে কল্পনার ক্রিসমাস বুড়ো। পরনে কোট নেই, টাই

নেই, জ্যাকেট নেই। ঢলঢলে প্যান্ট আর গলা আঁটা সোয়েটার, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঝ্যাটা গোঁফ। দাড়ি কামাতে অর্ধেক দিন ভুলে যান। যখন মনে পড়ে গায়ে মাখা সাবানটা গালে ঘষে দাড়ি কেটে নেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে কী ব্যাপার গায়ে মাখা সাবান দিয়ে দাড়ি কাটা, আইনস্টাইন জবাব দিতেন, দুরকম সাবান ব্যবহার করে কী লাভ?

শুধু নির্যাতিত ইহুদিদের সপক্ষে নয়, তিনি ক্রমশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে, দলমত নির্বিশেষে তিনি তাদের সমর্থন করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন মানুষ এই ধ্বংসের উন্মাদনা ভুলে এক হবেই। আর একত্বতার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পাবে তার ধর্মকে।

আইনস্টাইনের কাছে এই ধর্মীয় চেতনা প্রচলিত কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানবতারই এক মূর্ত প্রকাশ। বিজ্ঞান আর ধর্মে কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিজ্ঞান শুধু 'কি' তার উত্তর দিতে পারে 'কেন' বা 'কী হওয়া উচিত' সে উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই। অপরদিকে ধর্ম শুধু মানুষের কাজ আর চিন্তার মূল্যায়ন করতে পারে মাত্র। সে হয়তো মানব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ বলে দেয় বিজ্ঞান।...তাই ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। মানবতাবাদী আইনস্টাইন একদিকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করছিলেন, অন্যদিকে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে একের পর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করছিলেন। এই সময় তিনি প্রধানত অভিকর্ষ ও বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের মিলন সাধনের প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশের পথে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিন্তু এই তত্ত্বের সম্ভাব্যতাভিত্তিক চরিত্রে তার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না।

১৯৩৬ সালে হঠাৎ স্ত্রী এলসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এলসা ছিলেন আইনস্টাইনের যোগ্য সহধর্মিণী, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী।আইনস্টাইন সব বুঝতে পারেন

কিন্তু অসহায়ের মতো তিনি শুধু চেয়ে থাকেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে চিরদিনের মতো প্রিয়তম আইনস্টাইনকে ছেড়ে চলে গেলেন এলসা। এই মানসিক আঘাতে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই শক্তির ভয়াবহতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। পরীক্ষায় জানা গেল পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক ধাতু হলো ইউরেনিয়াম। আর এই ইউরেনিয়াম তখন একমাত্র পাওয়া যায় কঙ্গো উপত্যকায়। কঙ্গো, বেলজিয়ামের অধিকারভুক্ত। বিজ্ঞানী মহল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যদি জার্মানদের হাতে এই ইউরেনিয়াম পড়ে তাহলে তারা পরমাণু বোমা বানাতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করবে না। গোপনে সংবাদ পাওয়া যায় জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি জোর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। আইনস্টাইন উপলব্ধি করলেন তার সমীকরণ প্রমাণিত হতে চলছে। সামান্য ভরের রূপান্তরের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি। আইনস্টাইন লিখেছেন, 'আমার জীবনকালে এই শক্তি পাওয়া যাবে ভাবতে পারিনি'।

এদিকে জার্মান বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যুদ্ধ জয় করতে গেলে অ্যাটম বোমা তৈরি করা দরকার এবং তা জার্মানির আগেই তৈরি করতে হবে। সকলে সমবেতভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আবেদন জানাল। যদিও এই আবেদনপত্রে সই করেছিলেন আইনস্টাইন, আমেরিকায় পরমাণু বোমা তৈরির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই তিনি জড়িত ছিলেন না।

শেষ দিকে তিনি চেয়েছিলেন এই গবেষণা বন্ধ হোক। তিনি বিজ্ঞানী মাক্স বোর্নকে বলেন, পরমাণু বোমা তৈরির জন্য আবেদনপত্রে আমার সই করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল। জাপানে অ্যাটম বোমা ফেলার পর তার বিধ্বংসী রূপ দেখে বিচলিত আইনস্টাইন লিখেছেন, 'পারমাণবিক শক্তি মানব জীবনে খুব তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ হয়ে দেখা যাবে-সে রকম মনে হয় না। এই

শক্তি মানবজাতির প্রকৃতই ভয়ের কারণ-হয়তো পরোক্ষভাবে তা ভালোই করবে। ভয় পেয়ে মানবজাতি তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করবে। ভয় ছাড়া মানুষ বোধহয় কখনোই শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে না।'

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হলো তার নতুন তত্ত্ব A generalised theory of Gravitation। মহাকর্ষের সর্বজনীন তত্ত্ব। এত জটিল সেই তত্ত্ব, খুব কম সংখ্যক মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারলেন।

যখন বিজ্ঞানীরা তাকে তার এই নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বললেন তিনি সকৌতুক বললেন, কুড়ি বছর পর এর আলোচনা করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল। আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হলো নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য।

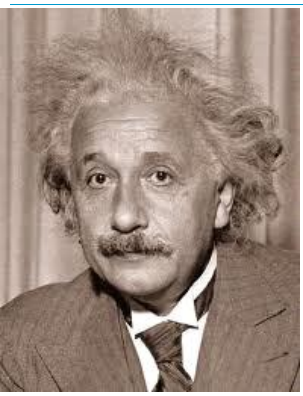
আইনস্টাইন জানালেন প্রকৃতির তত্ত্ব কিছু বুঝলেও মানুষ রাজনীতির কিছুই বোঝেন না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির পদ শুধু শোভাবর্ধনের জন্য। শোভা হলেও তার বিবেক যা মানতে পারবে না তাকে তিনি কখনোই সমর্থন করতে পারবেন না।

জীবন শেষ হয়ে আসছিল, এই সময়ে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের অনুরোধে বিশ্ব শান্তির জন্য খসড়া লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল তার জীবন শেষ হলো। তার ইচ্ছা অনুসারে মৃতদেহটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো। শোনা যায় পরীক্ষার জন্য তার ব্রেইন কোনো গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সম্বন্ধে কেউই আর কোনো কথা প্রকাশ করেনি।

সৌজন্যেঃ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আধ্যাপক ডাঃ এ এইচ মোহাম্মদ ফিরোজ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা মনোজগত থেকে নেওয়া।

আইনস্টাইনের আনন্দময় আলাপচারিতা

স্যার আলবার্ট আইনস্টাইন এর জীবনের 30 টি মজার মজার সব ঘটনা



বিশ্বজগত্ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় যাঁরা আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন, তাঁদের একজন আলবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্য তিনি বিশ্বখ্যাত। এমন মানুষদের জীবন সম্পর্কে সবার মধ্যে কৌতূহল থাকে। কৌতূহলী মানুষের জন্য আইনস্টাইনের জীবন থেকে কিছু আনন্দময় আলাপচারিতা তুলে ধরা হলো।

১. আইনস্টাইন বিশ্বখ্যাত তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্য। কিন্তু কে কী ভাবত তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে? জার্মান বা ফরাসীরা? ১৯৩০-এর দশকে সরবোনে (Sorbonne) বক্তৃতা দেওয়ার সময় এ বিষয়ে বলেন, 'যদি আমার আপেক্ষিক তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয়, তবে জার্মানি আমাকে জার্মান হিসেবে দাবি করবে। আর ফ্রান্স বলবে যে আমি পুরো বিশ্বের নাগরিক। কিন্তু যদি তত্ত্বটা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে ফ্রান্স বলবে, আমি একজন জার্মান এবং জার্মানি বলবে আমি হলাম ইহুদি।'

২. একবার এক অনুষ্ঠানে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি একটু সহজ করে আপনার তত্ত্বটা আমাদের বোঝাবেন?' আইনস্টাইন তখন এই গল্পটা শোনালেন।আমি একবার বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিলাম। বন্ধুটি ছিল অন্ধ। আমি বললাম, দুধ পানকরতে ইচ্ছা করছে। 'দুধ?' বন্ধুটি বলল, 'পান করা বুঝি, কিন্তু দুধ কী জিনিস?' 'একটা সাদা তরল পদার্থ।' বললাম আমি। 'তরল আমি বুঝি, কিন্তু সাদা জিনিসটা কী?' 'বকের পালকের রং।''পালক আমি বুঝি, কিন্তু বক কী?''ঘাড় কুঁজো বা বাঁকানো ঘাড়ের এক পাখি।''ঘাড় সে

তো বুঝি। কিন্তু এই কুঁজো কথাটার মানে কী?' এরপর আর ধৈর্য থাকে, বলুন! আমি তার হাতটা ধরে এক ঝটকায় টানটান করলাম। বললাম, 'এটা এখন একদম সোজা, তাই না। তারপর ধরো, কনুই বরাবর এটা ভেঙে দিলাম। এবার তোমার হাতটা যেমন আছে সেটাকেই কুঁজো বা বাঁকানো বলে, বুঝলে?''আহ্!' অন্ধ বন্ধু বলল, 'এবার বুঝেছি, দুধ বলতে তুমি কী বুঝিয়েছ।'

৩. একবার এক ছাত্র আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করল, 'গত বছর পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন পড়েছিল, এবারের পরীক্ষায়ও ঠিকঠিক ওই সব প্রশ্নই পড়েছে।' 'ঠিক বলেছ।' আইনস্টাইন বললেন, 'কিন্তু এ বছরের উত্তরগুলো আগেরবারের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা!'

৪.আইনস্টাইনকে প্রাচীন গণিতের ইতিহাসবিদ অটো নিউগেব্যুর বলেছেন, 'কিংবদন্তি'। কিন্তু এই কিংবদন্তি মানুষটি তুলনামূলক দেরিতে কথা বলতে শেখেন। ফলে তাঁর মা-বাবা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তো, একদিন রাতে খাবার টেবিলে সবাই আছেন। আইনস্টাইনও। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বললেন, 'এই স্যুপটা খুবই গরম।' উহ্, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মা-বাবা। ছেলের মুখে প্রথম বুলি শুনে তাঁরা আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর আগে কেন তুমি কোনো কথা বলোনি?' জবাবে আইনস্টাইন বললেন, 'কারণ, এর আগে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল!'

৫. মানুষ মাত্রই কি ভুল হয়? নিজের ভুলভ্রান্তি নিয়ে কী ভাবতেন আইনস্টাইন? ১৯৩৫ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য আপনার কী কী দরকার?' আইনস্টাইন বললেন,'একটা ডেস্ক, কিছু কাগজ আর একটা পেনসিল। সঙ্গে দরকার বড় একটা ডাস্টবিন, যেখানে আমার সব ভুল করা বা ভুলে ভরা কাগজগুলো ফেলব!'

৬. অনেকের কাছে অঙ্কের সমার্থক শব্দ আতঙ্ক।

তো, একবার ১৫ বছর বয়সী এক তরুণী আইনস্টাইনের কাছে সাহায্য চাইল। গণিতের ওপর বাড়ির কাজ বা হোম ওয়ার্ক সে সঠিকভাবে করতে পারছিল না। তরুণীর কাছে অঙ্ক এমনিতেই আতঙ্কের নাম। আইনস্টাইন ওই তরুণীকে বলেছিলেন,'গণিতের সমস্যা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার কাছে গণিত যতটা কঠিন, আমার কাছে গণিত তার চেয়েও কঠিন।'

৭. ১৯২১ সালে ফিলিস্তিন ভ্রমণে বেরিয়েছেন আইনস্টাইন। সেখানে 'যুব সংঘ' নামের এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন ২২ বছর বয়সী এক তরুণী। সমাজের নানা বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন আইনস্টাইন। একবার আইনস্টাইন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, এখানে নারী-পুরুষে সম্পর্ক কেমন?' এ প্রশ্নশুনে ওই তরুণী লজ্জায় পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'দেখুন অধ্যাপক, এখানে কিন্তু একজন পুরুষের একটিই স্ত্রী।' একটু হেসে তাঁর হাতখানা ধরে আইনস্টাইন বললেন, 'না, না। আমার প্রশ্নটা ওভাবে নিয়ো না। আমরা পদার্থবিজ্ঞানীরা "সম্পর্ক" কথাটা দিয়ে সহজ কিছুকে বোঝাই। আমি আসলে জানতে চেয়েছি, এখানে কতজন নারী আর কতজন পুরুষ মানুষ।'

৮. এক সহকর্মী আইনস্টাইনের কাছে একবার তাঁর টেলিফোন নম্বরটা চাইলেন। তখন আইনস্টাইন একটা টেলিফোন বই খুঁজেবের করলেন এবং সে বইতে তাঁর নম্বরটা খুঁজতে লাগলেন। তখন সহকর্মীটি বললেন,'কী ব্যাপার, নিজের টেলিফোন নম্বরটাও মনে নেই আপনার?' আইনস্টাইন বললেন, 'না। তার দরকারই বা কী? যেটা আপনি বইতে পাবেন, সে তথ্যটা মুখস্থ করে মস্তিষ্ক খরচ করবেন কেন?'

৯. ১৯৩১ সালে চার্লি চাপলিন আমন্ত্রণ জানালেন আইনস্টাইনকে। তখন সিটি লাইটস সিনেমার স্কিনিং চলছিল চাপলিনের। তো যখন চাপলিন

ও আইনস্টাইনশহরের পথ ধরে যাচ্ছিলেন, অনেক মানুষ ভিড় জমায়। চাপলিন আইনস্টাইনকে বললেন,'সবাই আমাকে সহজেই বোঝে। এজন্যই আমার যত জনপ্রিয়তা। তা আপনাকে মানুষ এত পছন্দ করে কেন, বলতে পারেন?' 'আসলে', আইনস্টাইন বলছেন, 'কেউ আমাকে সহজে বুঝতেই পারে না বলে আমাকে এত বেশি পছন্দ করে!'

১০. স্বামী সম্পর্কে কেমন ধারণা ছিল আইনস্টাইনের স্ত্রীর? তাঁর স্ত্রীকেএকবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব কি বুঝতে পারেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'না, কিন্তু আমার স্বামীকে বুঝি। আমি জানি, তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।'

১১) বিখ্যাত ভাস্কর জেকব এপস্টিন একবার আইনস্টাইনের একটি আবক্ষ মূর্তি খোদাই করছিলেন।আইনস্টাইন নিজেই মডেল হয়ে ধৈর্য ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে শিল্পীকে সাহায্য করতেন। সে সময় একদিন তিনি জেকবকে বলেন," প্রায় শ'খানেক বিজ্ঞানী বই লিখে আমার আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আমার থিওরী যদি ভুল হয়, তবে এতজনের দরকারটা কী? একজন বললেই যথেষ্ট।
১২) একবার বেলজিয়ামের রাণী আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর দেশ সফরের। নির্দিষ্ট দিনে আইনস্টাইনকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য রেল স্টেশনে হাজির হল গাড়ির বহর। কিন্তু কোথায় কী? রেল স্টেশনে আইনস্টাইনকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। ফিরে চলল গাড়ির বহর রাজপ্রাসাদের দিকে। কিছুক্ষণ পর সাদাসিধে পোশাকে বেহালা বাজাতে বাজাতে রাজপ্রাসাদে হাজির হলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। রাণী ব্যাপারটাতে লজ্জিত হলেন। সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থণা করে জানালেন যে, বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি বহর রেল স্টেশনে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে ফিরে এসেছে। আইনস্টাইন বললেন,'আমি ইচ্ছে করেই গাড়ি বহরকে এড়িয়ে গেছি। আর পায়ে

হেঁটে বেহালা বাজাতে বাজাতে এসেছি। যদি আপনার ঐ রাজকীয় গাড়িতে আসতাম, তবে কি এভাবে বেহালা বাজাতে পারতাম? সাধারণ মানুষের মত শহরটাকে দেখে নিতে পারতাম?" এমনই সহজ সরল আর সাধারণ ছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। এত বড় বিজ্ঞানী অথচ মনে এতটুকু অহংকার ছিল না।

১৩) আইনস্টাইন যে কত সহজ সরল ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর আরেকটি মজার ঘটনায়। আপেক্ষিকতা তত্ব আবিষ্কার করে তিনি তখন বিখ্যাত ও বিতর্কিত। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী কারোর মগজের এন্টেনাই ব্যাপারটা ক্যাচ করতে পারছিল না। তিনি বিভিন্ন সভা সেমিনারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বটি বোঝাতে লেকচার দিতে যেতেন। প্রায় সব সেমিনারে তিনি একই ধরনের আলোচনা করতেন। একবার এমনি এক সেমিনারে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন, লেকচার দেবার জন্য। পথিমধ্যে তাঁর ড্রাইভার করে বসল এক আজব আবদার।বলল, ''স্যার, আপনার লেকচারগুলু শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজ একদিনের জন্য আমি আইনস্টাইন সেজে সেমিনারে বক্তব্য চাই।'' মজার মানুষ আইনস্টাইনেরও কথাটা খুব মনে ধরল। তিনি এক কথায় রাজি। দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কী হয়? তো, ড্রাইভার আইনস্টাইন সেজে অনুষ্ঠানে গেল বক্তব্য দিতে আর স্বয়ং আইনস্টাইন দর্শক সারিতে বসে রইলেন আইনস্টাইনেরই ড্রাইভার হয়ে। তখন তো আর মিডিয়ার এত দৌরাত্ম্য ছিল না। তাই ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। আইনস্টাইনরূপী ড্রাইভার মঞ্চে বক্তব্য রাখল এবং চমৎকার বক্তব্য রাখল।দর্শক সারিতে বসে মুগ্ধ আইনস্টাইন বার বার হাত তালি দিতে লাগলেন।অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত একজন আইনস্টাইনের ড্রাইভারের কাছে যেয়ে বললেন, '' আপনার বক্তব্যটি আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু কি জানেন, আমি এই অমুক অমুক বিষয়গুলু একদম বুঝতে পারিনি। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে বিষয়গুলু বুঝিয়ে

দেবেন?'' আইনস্টাইনের ড্রাইভার বিন্দু মাত্র না ঘাবড়ে উত্তর দিল,''ওহ! এই ব্যাপার? এই ব্যাপারটা তো আমার ড্রাইভারই বুঝিয়ে দিতে পারবে। চলুন তার কাছেই যাই।

১৪) একবার আইনস্টাইনকে সফলতা লাভের একটি গাণিতিক ফর্মুলা দিতে বলা হল। তিনি বলেছিলেন,'' X+Y+Z=A, যেখানে X=কাজ, Y=খেলাধুলা আর A=সফলতা।'' ''আর মানে Z কী?'' আবারও জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে। ''তোমার মুখ বন্ধ রাখা'', আইনস্টাইনের উত্তর।
প্রয়োজনীয়_বাংলা_বই _Useful -Bangla- e-books
১৫) আইনস্টাইন তাঁর জটিল আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটি সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ঠিক এইভাবে,''যখন তুমি একজন সুন্দরী মহিলার পাশে বসে থাকো তখন দু'ঘণ্টাকে মনে হয় দু' মিনিট; আর যখন তুমি দু' মিনিট গরম চুলার পাশে বসে থাকো তখন দু'মিনিটকে মনে হয় দু ঘণ্টা। এটাই হল আপেক্ষিকতাবাদ।'' আর রেডিও সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, ''তুমি টেলিগ্রাফের তার দেখেছ। মনে করো, এটা লম্বা, অনেক লম্বা একটা বিড়াল।তুমি নিউইয়র্কে বসে এর লেজে টান দেবে, ওদিকে লস এঞ্জেলেসে এর মাথা মিউ মিউ করে উঠবে।ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? বেতার ঠিক এভাবেই কাজ করে। তুমি এদিকে ইশারা দাও, ওদিকে সাড়া পড়ে। পার্থক্য হল এই বেতারের ক্ষেত্রে বিড়াল বলে কিছু উপস্থিত নেই।

১৬) এত সুন্দর ব্যাখ্যা যিনি দিতে পারেন, তিনি কিন্তু অনেক সময় জীবনের সহজ ব্যাপারগুলো বুঝতে পারতেন না। একবার আইনস্টাইন বাড়ি বানালেন। একদিন তিনি বাড়িটা কেমন হল তা দেখতে গেলেন। ঘুরে ঘুরে সব দেখে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর ছোট্ট বিড়ালছানাটি ঘরে ঢুকবে কি করে? তার জন্য তো কোন আলাদা ছোট দরজা বানানো হয় নি। আসলে যাঁরা অনেক বড় মানুষ, তাঁরা সব সময় বড় বড় চিন্তায় মগ্ন থাকেন তো, তাই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারেন

না।বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও এই ছোট্ট ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না।অবশেষে তাঁকে খুশি করার জন্য বড় দরজার পাশে আরেকটি ছোট দরজা তৈরি করে দেওয়া হল, যেন তাঁর আদরের বেড়ালছানাটি নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বেড়ালছানাটি কোন দরজা ব্যবহার করত তা আইনস্টাইনই ভাল বলতে পারবেন।

১৭) গুজব আছে, সুন্দরী অভিনেত্রী মেরিলিন মনেরো আইনস্টাইনের প্রতি দুর্বল ছিলেন।তাই একদিন মনেরো আইনস্টাইনকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এইভাবে, ''চলুন না, আমরা বিয়ে করে ফেলি? তাহলে আমাদের সন্তানেরা হবে সৌন্দর্য ও জ্ঞানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। ওরা দেখতে আমার মত আর বুদ্ধিতে আপনার মত।'' আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ বললেন, ''আর যদি উল্টোটা হয়? দেখতে আমার মত আর বুদ্ধিতে আপনার মত?'' এর উত্তরে মনেরো কী বলেছিলেন তা অবশ্য আমি অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি।

১৮) তিন হাজার শব্দের মধ্যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব যে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবে, তার জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করে সায়েন্টিফিক আমেরিকান। 'বন্ধুদের মধ্যে কেবল আমিই অংশ নিইনি। আমার বিশ্বাস হয়নি তিন হাজার শব্দে এটা ভালো বোঝাতে পারতাম আমি'-মন্তব্য করেন আইনস্টাইন।

১৯) কাজে যাওয়ার আগে প্রায়ই ভালো পোশাক পরে যাওয়ার আইনস্টাইনকে অনুরোধ-উপরোধ করতেন তাঁর স্ত্রী। বেশির ভাগ সময়ই তিনি জবাব দিতেন, 'আমি কেন এটা করব? সেখানে সবাই আমাকে চেনে।' তারপর আইনস্টাইনের প্রথম বড় ধরনের আলোচনা সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন আবার তাঁকে একটু ভালো কাপড়চোপড় পরে সেখানে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। এবার তিনি জবাব দিলেন, 'কেন আমি

এটা করব? সেখানে কেউই তো আমাকে চেনে না।'

২০) ১৯৩৫ সালে প্রিন্সটনে পৌঁছানোর পর গবেষণার জন্য তাঁর কী কী প্রয়োজন হবে জিজ্ঞেস করা হলে আইনস্টাইন জানালেন, 'একটি ডেস্ক, কিছু প্যাড, একটা পেন্সিল আর সব শেষে আমার ভুলগুলো ফেলার জন্য বিশাল একটা ময়লার ঝুড়ি।

২১) মাউন্ট উইলসন মানমন্দির পরিদর্শনে গেছেন আইনস্টাইনের স্ত্রী। সেখানকার বিশাল অপটিক্যাল টেলিস্কোপটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। এক জ্যোতির্বিদ তাঁকে জানালেন, এসব স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতির প্রধান কাজ মহাবিশ্বের বিস্তার, আকৃতি নির্ণয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'ও! আমার স্বামী তো পুরোনো একটা খামের পেছনেই এটা করে।

২২) অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চমৎকার এক বুদ্ধি বের করেন আইনস্টাইন। বাড়িতে কেউ আসার কিছু সময় পরই এক বাটি স্যুপ নিয়ে কামরায় ঢোকে এক গৃহপরিচারক। যদি তিনি এটা গ্রহণ করেন, তবে অতিথি ধরে নেন তিনি এখন খাবেন এবং মানে মানে কেটে পড়াই তাঁর জন্য শ্রেয়। অন্যদিকে আইনস্টাইনের যদি কথা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে স্যুপটা এক পাশে সরিয়ে দেন, যেন-বা এটা এখানে ছিলই না।

২৩) ১৯৩০ সালে আমেরিকার উদ্দেশে বার্লিন ত্যাগ করেন আইনস্টাইন। বার্লিন রেলস্টেশনে পৌঁছেই স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলেন তিনি। যা হোক, একসময় খুঁজে পেলেন তাঁকে। তারপরই টিকিট জোড়া হারিয়ে বসলেন। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল তাও, আর এভাবেই শুরু হলো তাঁর দ্বিতীয় আমেরিকা যাত্রা।

২৪) মাউন্ট উইলসন মানমন্দির পরিদর্শনে গেছেন আইনস্টাইনের স্ত্রী। সেখানকার বিশাল

অপটিক্যাল টেলিস্কোপটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। এক জ্যোতির্বিদ তাঁকে জানালেন, এসব স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতির প্রধান কাজ মহাবিশ্বের বিস্তার, আকৃতি নির্ণয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'ও! আমার স্বামী তো পুরোনো একটা খামের পেছনেই এটা করে।

২৫) ভবিষ্যতে কী আছে? আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে একবার জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি কখনোই চিন্তা করি না। কারণ, এটা এমনিতেও তাড়াতাড়িই আসে।

২৬) বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবীদের অন্যতম আলবার্ট আইনস্টাইন। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (The Theory of Relativity) আবিষ্কারের জন্য তিনি আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত। মজার ব্যাপার তিনি কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার পাননি। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে হাতে গোণা কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী তাঁর এই তত্ত্বটি বুঝতে পারেন। কেউ যদি এই আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি পড়ে বলে, ''বুঝেছি'' তাহলে নাকি বুঝতে হবে যে, সে কিছুই বুঝেনি। তত্ত্বটি এত গোলমেলে যে, এটি না বোঝাই স্বাভাবিক, বুঝতে পারাটাই যেন অস্বাভাবিক।আর তাই হয়ত রয়েল সুইডিশ একাডেমির জুরিবোর্ড আইন্সটাইনের তত্ত্বটির নিগূঢ় অর্থটি বুহতে পারেনি। তাই সে বছর নোবেল পুরষ্কার আইনস্টাইনের কপালে না জুটলেও ১৯২১ সালে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photo Electric Effect) ব্যাখ্যা করে, তিনি পেলেন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার।

২৭) এক পার্টিতে আইনস্টাইনকে চিনতে না পেরে এক তরুণী প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করেন?
আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, আমি পদার্থ বিঙ্গানের ছাত্র।

তরুণী অবাক হয়ে বললেন, আপনি এখনও ছাত্র! আর আমি গত বছর পাশ করেছি..

২৮) আইনস্টাইন এর মেয়ের বিয়ে। সবাই চার্চে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে উনি উনার মেয়েকে বললেন তুমি চার্চের দিকে যাও আমি ল্যাবে আমার কলমটা রেখে আসতাছি। মেয়ে অনেক বারন করা সত্বেও উনি গেলেন, ৩০ মিনিটের কথা বলে উনি যখন না এলেন তখন সবাই মিলে উনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। ৭ দিন পর উনার মেয়ে যখন বাসায় এলে মাকে জিজ্ঞাস করলো বাবা কোথায় তখন তার মা বলল ওই যে গেল আর আসে নাই। তখন উনি আইনস্টাইন এর খোজে ল্যাবে গেল। ল্যাবে গিয়ে দেখল যে তার বাবা একটা কলম নিয়ে বোর্ড এর সামন্নে গিয়ে কি জানি চিন্তা করছিল। মেয়ে বাবা কে বলল বাবা কি কর। তখন উনি বলল যে মা তুমি চার্চে যাও আমি এই কাজ টা ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করে আসছি।

৩০) আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মত রহস্যময়তার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর মাতৃভাষা জার্মানে কিছু একটা বলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।তখন তাঁর পাশে থাকা আমেরিকান নার্স কথাটির বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেনি। মৃত্যুর আগে শেষ কী কথা তিনি বলে গেছেন, তা আমাদের জানা হবে না আর কোন দিন।

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং(আইনস্টাইনের পর সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী) স্বপ্ন দেখার ডাক দিয়ে যান যিনি



‘বস ঘুমোচ্ছেন’ (Boss asleep)। দরজার ওপর এমন লেখা দেখলে ভেতরে ঢোকাটা মুশকিল। কিন্তু যদি ঠিকঠাকমতো খোঁজ নিয়ে যাও, তাহলে তুমি সাহস করে ভেতরে ঢুকতে চাইবে এবং ঢুকবেও। রুমটা এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো বই, একটা হোয়াইট বোর্ড! রুমের বাসিন্দাকে দেখতে তোমাকে ইতিউতি তাকাতে হবে। প্রথম দর্শনেই যদি দেখতে না পাও, তাহলে হয়তো পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকালেই বুঝবে, তুমি ভুল ঘরে এসেছ। দরজাজোড়া মেরিলিন মনরোর এক বিরাট ছবি! নিজের ভুল বুঝে তুমি যখন বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে, তখন শুনবে একটি অদ্ভুত ধাতব কণ্ঠস্বর—স্বাগতম। তুমি ভুল করোনি!কণ্ঠস্বর শুনে, ঠিকমতো খুঁজে টেবিলের পেছনে, হুইল চেয়ারে বসা বিজ্ঞানীকে দেখতে পাবে। মুখে এক ধরনের হাসি, ‘কী, কেমন চমকে দিলাম।’ ততক্ষণে তুমি সামনাসামনি হয়ে পড়বে এক জীবন্ত কিংবদন্তির! স্টিফেন উইলিয়াম হকিং! হকিংকে বলা হয় আইনস্টাইনের পর সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। কতটা প্রতিভাবান? স্বীকৃতি দিয়েই শুরু করা যাক। কেমব্রিজে যেহেতু তুমি তাঁর রুমে পৌঁছেছ কাজে, নিশ্চয়ই গনভিল ও ফেবুস কলেজের স্টিফেন হকিং ভবন পার হয়েই এসেছ। এবং আসার সময় নিশ্চয়ই তাঁর মূর্তিটিও দেখেছ! দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনেও তাঁর একটি মূর্তি আছে। সান সালভাদরের বিজ্ঞান জাদুঘরটির নাম স্টিফেন হকিং বিজ্ঞান জাদুঘর।রয়েল সায়েন্স সোসাইটি যখন নতুন ফেলো নির্বাচন করে, তখন তিনি সবার সামনে দিয়ে হেঁটে সভাপতির সামনে রাখা খাতায় সই করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে হকিং যখন ফেলো

হন, তখন সভাপতি ওই খাতা নিয়ে একেবারে শেষের সারিতে বসা হকিংয়ের কাছে হেঁটে আসেন। অনেক কষ্ট করে সেদিন হকিং সই করেছেন। কারণ তত দিনে মোটর নিউরন রোগে তাঁর শরীর অসার হতে শুরু হয়েছে! তাঁর পুরস্কারের তালিকা এবার দেখা যাক: এডিংটন মেডেল, হিউজেস মেডেল, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার আলবার্ট আইনস্টাইন মেডেল, রয়াল অ্যাসট্রোনমিক্যালা সোসাইটির স্বর্ণপদক, কপলে মেডেল—এসব পদার্থবিজ্ঞানের সব পুরস্কার তো আছেই, এই সঙ্গে আছে আমেরিকার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। মনে হতে পারে, তাঁকে সম্মানিত করার জন্য সবাই যেন উঠেপড়ে লেগেছে! কেন? হকিং কাজ করেন এমন একটা বিষয় নিয়ে, যা সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষকে ভাবিত করেছে—দুনিয়ার জন্ম-মৃত্যু! বিশ্বজগতের নিয়মকানুনের রাজা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের খবর দেয় কোয়ান্টাম বিজ্ঞান। এই দুইকে ছাতনাতলে নিয়ে যান প্রথম এই হকিংই। রজার পেনরোজের সঙ্গে মিলে তিনি দেখালেন বিগব্যাং থেকেই এই মহাবিশ্বের (universe) শুরু! অবিশ্বাসীরা চোখ তুলে বলল, 'সে কী, বিগব্যাংয়ের আগে তাহলে কী ছিল।' হেসে জবাব দেন হকিং, 'তার আগে বলো উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে?'

শুধু শুরুতে নয়, কোয়ান্টাম জগতের অনিশ্চয়তা নীতিকে তিনি নিয়ে গেলেন কৃষ্ণবিবরের (ব্ল্যাকহোলের) কাছে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন কৃষ্ণবিবর কালো নয়! ওর থেকে বের হয়ে আসছে কণাস্রোত! তার মানে, কণা বের হয়ে একসময় কৃষ্ণবিবরও লয় পাবে! কী ভয়ানক! তাহলে তো সবই বিকিরণ হয়ে যাবে শেষ বিচারে!

১৯৭৩ সালে হকিং যখন কৃষ্ণবিবরের কণাস্রোতের কথা বললেন, তখন অনেকেই ভ্রূ কুঁচকেছেন। এখন এই কণাস্রোতের নাম হকিং বিকিরণ! হকিং চেষ্টা করেছেন কালভ্রমণের (Time travel) একটা উপায় বের করার। দেখলেন ওয়ার্মহোল দিয়ে চলে যাওয়া যায়

অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে!

পদার্থবিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য এমন একটা তত্ত্ব বের করা, যাতে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। এমন একটি তত্ত্বের সন্ধানে এখন হকিং ব্যস্ত! কখনো স্ট্রিং থিউরি, কখনো ভিন্ন কিছু। ১৯৪২ সালে যেদিন ইংল্যান্ডে হকিংয়ের জন্ম, ঠিক এর ৩০০ বছর আগে ইতালিতে মারা যান গ্যালিলিও গ্যালিলি। ২১ বছর বয়সে হকিং আক্রান্ত হন স্নায়ুরোগে, যা এএলএস ডিজিজ নামে পরিচিত। ২০০৯ সালের দিকে এসে তিনি পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন। তবে, তাঁর স্বপ্ন রচনা থেমে নেই। জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে তিনি নিজের চিন্তাকে বিকশিত করেন। বর্তমান স্ত্রীর আগের স্বামীর বানানো কম্পিউটার সফটওয়্যার দিয়ে কথাও বলতে পারেন! তা নিয়ে তিনি ছুটে যান দেশ থেকে দেশে, লোকেদের শোনান বিজ্ঞানের কথা। বলেন, বিজ্ঞান আর গবেষণাকে ভালোবাসতে, যাতে মানবজাতি এগোতে পারে।

কেবল বক্তৃতা নয়, লিখে ফেলেছেন বিজ্ঞানকে সহজ করে বলা বই। এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম, ইউনিভার্স ইন এ নাটশেল, ব্রিফার হিস্টরি অব টাইম, ব্ল্যাকহোল অ্যান্ড বেবি ইউনিভার্স প্রভৃতি বই। মেয়ে লুসির কাছে সর্বশেষ লিখেছেন, জর্জ'স সিক্রেট কি টু ইউনিভার্স, যেখানে হ্যারি পটারের স্টাইলে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

হকিং অভিনয় করেছেন স্টারট্রেকের ডিসেন্ট এপিসোডে। যারা তোমরা পিঙ্ক ফ্লয়েডের ডিভিশন বেল অ্যালবামের 'কিপ টকিং' গানটা শুনেছ, তারা সবাই কিন্তু হকিংয়ের সিনথেসাইজড শব্দও শুনেছ! সেখানে তাঁর সিনথেসাইজড ভয়েস ব্যবহার করা হয়েছে। হকিং যদি বিজ্ঞানী নাও হতেন, তাহলেও তিনি বিখ্যাত হতেন। কারণ ৪৫ বছর ধরে এএলএস রোগে আক্রান্ত কেউ বেঁচে আছেন, এমন কোনো রেকর্ড নেই!

তবে আমাদের সৌভাগ্য যে রোগ তাঁর চলৎশক্তি কেড়ে নিলেও তাঁর মেধা, মনন, দৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারেনি। সে জন্য তিনি স্বপ্ন দেখার ডাক দিয়ে যান।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

স্টোরি মাসগ্রেভ(নাসার বিজ্ঞানী ও নভোচারী)

নিজের ইচ্ছায় চলি



নাসার বিজ্ঞানী ও নভোচারী স্টোরি মাসগ্রেভের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রে। নাসার ছয়টি স্পেস শাটলের সব কয়টিতেই চড়েছেন তিনি। মহাশূন্যে কাটিয়েছেন মোট ১২০০ ঘণ্টা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাসগ্রেভ একাধারে নভোচারী, বিজ্ঞানী, পাইলট, শিক্ষক, সার্জন, প্যারাট্রুপার ও আলোকচিত্রী।

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে বনেবাদারে ঘুরেফিরে। একরের পর একর বিস্তৃত বিশাল খামারে আমার জীবনের প্রথম দিনগুলি পার করেছি আমি। তখন আমার কোনো বাধা ছিল না। আমার বয়স তখন সবে তিন বছর। কিন্তু আমাদের খামারের আশপাশের বন-জঙ্গলে একেবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় পার করে দিলেও কেউ কিছু বলার ছিল না আমাকে। বন-জঙ্গল, নদীনালা, গাছপালা, পশুপাখি—এসব নিয়েই ছিল আমার জগৎ। এ কারণে আজও আমি মোটামুটি সব ধরনের পশুকেই বশ মানাতে পারি। কারণ আমি ছোটবেলায় ওদের অনেক কাছ থেকে দেখেছি। ওরা কীভাবে চিন্তা করে তা বোঝার চেষ্টা করেছি। একই কথা খাটে শিশুদের ক্ষেত্রেও। আমি শিশুদের আশপাশে থাকলে তাদের মতো করে চিন্তা করার চেষ্টা করি। এ জন্য সহজেই ওদের সঙ্গে মিশে ওদের মন জয় করতে পারি।

আমি আমার ছোটবেলায় অনেক বেশি স্বাধীন ছিলাম, তা ঠিক। কিন্তু আমার ছোটবেলাটা শুধুই যে আনন্দের ছিল, তা কিন্তু নয়। দিগন্তবিস্তৃত খামারে অনেক সময় আমার নিজেকে খুব বেশি একা মনে হতো। আমার পরিবারের মানুষগুলো আমার কাছে তেমন বিশেষ কিছু হয়ে উঠতে পারেনি কখনো। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আমার বাবা-মা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার দাদা, পরদাদা এবং আমার নিজের ভাইও আত্মহত্যা করেন। এসব স্মৃতি আমার জন্য খুব কষ্টের। মাত্র তিন বছর বয়সের শিশুর ওপর এসব কিছু কেমন প্রভাব ফেলতে পারে, তা হয়তো বোঝাই যাচ্ছে। আমার হয়তো এমন কিছুই করাটা নিয়তি ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রকৃতিই ছিল আমার আত্মা, আমার প্রেরণা। প্রকৃতি থেকেই আমি শিক্ষা নিয়েছি। আমার জীবনে তাই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে প্রকৃতি, আমার পরিবার নয়।

এটা সত্য যে একদিন আমি মহাশূন্যে ছুটে বেড়াব অথবা এতগুলো ডিগ্রি থাকবে আমার নামের পাশে, তা কখনো কল্পনাও করিনি। কিন্তু জীবনের যখন যে সময়ে যেটা করতে চেয়েছি সেটা আমি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। আমার যেসব বিষয় ভালো লেগেছে শুধু সেগুলোই পড়েছি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জোর করে কখনো কিছু পড়ার বা করার চেষ্টা আমি করিনি, চাইও না।

১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্যারাকাস ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আমার জীবনের প্রথম ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করি গণিত ও পরিসংখ্যানে। এরপর অপারেশন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ওপর এমবিএ করি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। এরপর ম্যারিয়েটা কলেজ থেকে রসায়নে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করি। তারপর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন থেকে এমডি (ডক্টর অব মেডিসিন) ডিগ্রি সম্পন্ন করি। শারীরতত্ত্ববিদ্যা ও বায়োফিজিকসে মাস্টার্স করি ইউনিভার্সিটি অব কেন্টাকি থেকে। সবশেষ ইউনিভার্সিটি অব হস্টন থেকে সাহিত্যের ওপর মাস্টার্স করি। আমি মনে করি, জানার কোনো শেষ নেই। আমার যখন যে বিষয়ে আগ্রহ জেগেছে আমি তা নিয়ে পড়াশোনা করেছি।

একটা কথা বলে রাখি এখানে। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার ছোটবেলার প্রিয় বই কোনটা বা কোন কোন বই পড়ে আমার ছোটবেলার দিনগুলি কেটেছে, তাহলে আমি কোনো জবাব দিতে পারব না। কারণ আমি

আমার ছোটবেলায় কোনো বই-ই পড়িনি। আসলে সে সময়ে বই পড়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না আমার। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার প্রতিটি কোর্সের জন্য যে বই থাকত তার বাইরে ওই সম্পর্কিত আরও অনেক বেশি বই পড়তাম আমি। শিক্ষক একটা বই পড়তে বললে আমি ওই সম্পর্কিত কমপক্ষে দু-তিনটা বই পড়তাম।

আমি সব সময় তিনটা নোটবুক রাখতাম এবং এখনো রাখি আমার সঙ্গে। একটাতে থাকে যে কোর্সটি করছি তাতে আমি কী শিখব বা শিখছি। সেই কোর্স সম্পর্কে একেবারে বিস্তারিত থাকে ওই নোটবুকে। দ্বিতীয়টিতে আমি লিখে রাখি, যে কোর্সটি আমি করছি তা আসলে আমার কাছে কতটা প্রয়োজনীয়। সর্বশেষটিতে থাকে আমি যে কোর্সটি করছি তা আমার মহাশূন্য অভিযানে কতটা সহায়ক হবে এবং সেটা কীভাবে। যা পড়ছি তা আমার মহাশূন্য অভিযানের অভিজ্ঞতাটাকে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে। আমি মনে করি, সবারই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে কোনো বিষয়েই ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। আর তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না ঠিকভাবে।

তবে আমি যে শুধু পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তা নয়। আমি একজন কবিও বটে। অনেকে আমাকে প্রথম নভোচারী কবি বলে অভিহিত করেন! তা হয়তো ভুল নয়। আমি শুধু শখের বশেই কবিতা লিখি না। আমি সুন্দর কবিতা লেখার জন্য সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি, প্রচুর কবিতা পড়েছি, কবিতা লেখার অনেক কর্মশালায় উপস্থিত থেকেছি, অনেক কোর্স করেছি। কবিতা আমাকে আনন্দ দেয়। কবিতা আমার সত্তাকে সতেজ করে। আমার মনে হয়, কবিতায় কোনো কিছুকে যেভাবে উপস্থাপন করা যায় তা আর অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে সম্ভব নয়।

প্যারাট্রুপিং, গ্লাইডিং করতে পছন্দ করি আমি। অবসরে দাবা খেলাটাও আমার খুব পছন্দের। দাবা আমাকে একই বিষয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ভাবতে সাহায্য করে। আকাশে

উড়তেও আমার খুব ভালো লাগে। আর আমি যেহেতু মিলিটারিতে কাজ করেছি, তাই প্রায় ১৬০ ধরনের এয়ারক্রাফটে ১৭ হাজারের বেশি ঘণ্টা আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আর নাসায় কাজ করার দরুন ১২০০ ঘণ্টার বেশি কাটিয়েছি মহাশূন্যে। নাসার সবগুলো স্পেস শাটলেই আমি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছি। ভাবতে ভালোই লাগে, আমি অস্ট্রেলিয়া না গিয়েও গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখতে পাই, সাহারা না গিয়েও মরুভূমি দেখতে পাই, চীনে না গিয়েও চীনের প্রাচীর দেখতে পাই মহাশূন্য থেকে। ব্যাপারটা বেশ মজার। জীবনে এত কিছু পাব, তা কখনো আশা করিনি। কিন্তু এসবই সম্ভব হয়েছে; কারণ আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কিছু করিনি। যা আমার ভালো লেগেছে, যে বিষয়ে আমার আগ্রহ তা কখনো হেলা করিনি। যা করেছি তা সব সময় নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ:ফয়সাল হাসান

সূত্র: ওয়েবসাইট

ড্যানিয়েল সল গোল্ডিন(নাসার সাবেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)

বিশ্বটাকে বদলে দাও



ড্যানিয়েল সল গোল্ডিন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার সাবেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (১৯৯২-২০০১)। গোল্ডিনের তত্ত্বাবধানেই ১৯৯৭ সালে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে গবেষণার মহাকাশযান 'মার্স পাথফাইন্ডার' যাত্রা শুরু করে। ১৯৪০ সালের ২৩ জুলাই নিউইয়র্কে তাঁর জন্ম। ২০০১ সালের ৮ জুন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি খুব গর্বিত। আগের বছরের (২০০০) ঠিক এই দিন ইতালির ইউনিভার্সিটি অব পাডুয়া আমাকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। সেখানেও আমি বক্তব্য দিয়েছিলাম। আমার প্রিয় মানুষ ও আদর্শ গ্যালিলিও গ্যালিলাই পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁর প্রথম টেলিস্কোপটি বানিয়েছিলেন। সেই টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মহাকাশের অনেক অজানা। পাডুয়াতেই তিনি সিডেরাস নানসিয়াস বইটি লিখেছিলেন। আমি আরও গর্বিত, কারণ পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঘরে গ্যালিলিও তখনকার সর্বসেরা শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য দিতেন, আমি সেই ঘরেই বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেদিন ওখানে যে পোশাকটা পরেছিলাম, আজ সেটাই পরে আছি। মূলত এ পোশাকটা ওখানকার ঐতিহ্য।

কিন্তু তোমরা হয়তো ভাবছ, কেন আমি এই পোশাকটা পরে আছি? আমি এটা পরেছি তোমাদের স্মৃতিতে একটা প্রতিচ্ছবি ফেলার জন্য। সামনে তোমাদের জীবনের গূঢ় রহস্য উন্মোচনের দিন। তোমরা হয়তো আমাকে মনে রাখবে না। কিন্তু এই টুপি ও কোটটা তোমাদের চোখে ভেসে থাকবে।

আর মনে পড়বে গ্যালিলিওকে, তাঁর জীবন ও আদর্শকে। আমৃত্যু জ্ঞানচর্চা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি উৎকর্ষ সাধনে নিজেকে ব্রত করেছিলেন। তিনি শুধু সত্যের জন্য লড়াই করতেন তা-ই নয়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সত্যকে তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন। গ্যালিলিওর মতো তোমরাও স্বাপ্নিক হও, সৃজনশীল ও সাহসী হও।

মনে রাখবে, ভয় নামের ঘোর কুয়াশা ও নিন্দুকের সমালোচনার আড়ালেই লুকিয়ে থাকতে পারে অজানা কোনো সত্য। এই সত্যকে জানতে হলে প্রাণে সাহস থাকা চাই। অবশ্যই নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। অজানাকে জানার অদম্য ইচ্ছা ও কৌতূহল থাকতে হবে, লক্ষ্য হতে হবে অটুট।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

দেখো, বিগত ৫০ বছরে বড় বড় অনেক অর্জন-আবিষ্কার আমরা করেছি। জেট বিমান থেকে মহাশূন্যে অভিযাত্রা, টিভি থেকে এমপিথ্রি, ইন্সট্যান্ট কফি থেকে তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ। এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কেবল পৃথিবীকেই বদলে দেয়নি, বদলেছে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানকেও।

আরও যেসব অনাবিষ্কৃত সমস্যা আছে, তোমরাই পারো তার সমাধান বের করতে। অবশ্য সে জন্য তোমাদের প্রশ্ন করার অভ্যাস থাকতে হবে।

দেখো, আমরা এখনো আগের মতোই কম গতির বিমানে উড়ে বেড়াই। এখনকার কম্পিউটারগুলো শুধু গণনা করতে পারে, এগুলোর চিন্তাশক্তি বলে কিছু নেই। কিন্তু উৎকর্ষ সাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস ও সত্যানুসন্ধানের সাহস যাদের আছে, তোমাদের মেধা ও শ্রমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদিন এসব সমস্যা উবে যাবে।

সেদিন কম্পিউটারগুলো কাজ করবে মানব-মস্তিষ্কের মতো। পাখি যেভাবে ওড়ে, বিমানগুলো সেদিন সেভাবেই আকাশে উড়ে বেড়াবে। প্রযুক্তি-ব্যবস্থা হবে স্বনিয়ন্ত্রিত। সিলিকন চিপভিত্তিক বর্তমান কম্পিউটারের খোঁজ সেদিন শুধু জাদুঘরেই মিলতে পারে, ঠিক ডাইনোসরদের পাশে।

যদি উৎকর্ষ সাধন ও সত্যানুসন্ধানই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তোমার স্বপ্ন আর গ্যালিলিওর স্বপ্ন একটাই। যেসব রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি, একদিন তোমরাই তার আরোগ্য লাভের পথ দেখাবে। যে জীবনায়ু নিয়ে একজন মানুষ জন্ম নেয়, কমপক্ষে সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার পথটা পৃথিবীকে তোমরাই দেখাবে। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার যে রদবদল, তার সঠিক সমাধানও তোমরাই বের করবে। আমাদের সৌরজগতের বাইরে, মহাকাশের নক্ষত্ররাজিতে একদিন তোমরা অভিযান চালাবে। তোমরা হয়তো আকাশপানে তাকিয়ে প্রশ্ন করবে, যে প্রশ্নটা আদিম মানুষেরাও করত, আমরা কি একা?

এসব স্বপ্ন দেখা কি উচ্চাভিলাষী? স্বপ্নগুলো কি

আকাশ সমান বড় বা ঝুঁকিপূর্ণ? জেনে রেখো, নিশ্চিতভাবে নিন্দুকের সমালোচনার ফাঁদে তুমি পড়তে পারো। সন্দেহ নেই, বেশ কিছু বিপদ তোমার সামনে আসবে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, গ্যালিলিওকে তাঁর বিশ্বাসের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। মানুষ তাকে বিপথগামী ভেবেছিল। তোমরা ভয় পেয়ো না। জেগে ওঠো। মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলো। সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

জীবনে ব্যর্থ না হওয়াটা উৎকর্ষের উদাহরণ নয়। বরং ব্যর্থতা বলে দেয় যে তোমার স্বপ্নটা অসাধ্য কিছু নয়। কঠোর পরিশ্রম দিয়ে ব্যর্থতাকে তুমি জয় করতে পারো। ব্যর্থতা কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না, যদি না তুমি একে এড়িয়ে যাও কিংবা ব্যর্থতা থেকে শিখতে না চাও।

সফল হওয়ার পর তুমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া করো—তাতে তোমার চরিত্রের প্রকৃত রূপটা ফুটে উঠবে না। ব্যর্থ হওয়ার পর তুমি কী করো, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিজেকে বিশ্বাস করো। শেখা, উৎকর্ষ সাধন ও সত্য প্রকাশে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকো। এটাই ছিল গ্যালিলিওর শিক্ষা। এই শিক্ষাটা আমি আমার বাবার কাছ থেকেও পেয়েছি। এখানে দাঁড়িয়ে আছি—এটা দেখতে পেলে তিনি খুব গর্বিত হতেন। সম্ভবত তিনিও প্রশ্ন করতেন, 'ড্যান, তোমার গায়ে এই পোশাক কেন?' তবে তিনি খুশি হতেন নিশ্চয়।

ছয় বছর হলো বাবা মারা গেছেন। গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় আমার বাবা কলেজ থেকে জীববিজ্ঞানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। পরের বেশ কয়েক বছর তিনি কোনো চাকরি পাননি। তিনি ডাকঘরে কাজ করেছিলেন। অবশেষে অবশ্য শিক্ষক হয়েছিলেন তিনি, এ পেশাটাকে তিনি খুব পচ্ছন্দ করতেন।

জীবনভর শেখার আত্মপ্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর। তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন। একইভাবে নিজের একমাত্র ছেলেকেও সে রকমই দেখতে চেয়েছিলেন তিনি।

সবাই বলে, তোমরা হলে ভবিষ্যৎ। আর আমি বলি, ভবিষ্যৎ এখনই। সুতরাং কল্পনাশক্তি ও

উদ্ভাবনীশক্তি এবং দুঃসাহসিকতা দিয়ে অভিযান চালাও, আবিষ্কার করো, বিশ্বটাকে দাও বদলে। ভালোবাসা ও কাজ—দুটোর জন্যই সময় রাখো। তোমরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু কখনোই পরিবার ও বন্ধুদের ভুলে যেয়ো না।

আমি আগেও বলেছি, গ্যালিলিও যদি বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি এখানে শিক্ষকতা করতে চাইতেন। আরেক দিক থেকে গ্যালিলিও এখানে রয়েছেনু। প্রকৃতপক্ষে, আমার সামনে তোমরা দুই হাজার ৪০০ গ্যালিলিও বসে আছো, যারা আজ ডিগ্রি পাবে।

তোমরা কখনোই তোমাদের আবিষ্কারকে অমূলক মনে করবে না। জীবনভর জ্ঞানচর্চা করো। উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনে ব্রত হও। শুধু সত্যের সন্ধান করো না, নিজেকেও বিশ্বাস করো। তাহলেই তুমি সত্যকে খুঁজে পাবে। অভিনন্দন সবাইকে। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত, নির্বাচিত অংশের অনুবাদ জাহাঙ্গীর আলম

ডেম জেন গুডঅল(প্রাণী সংরক্ষণবিদ ও গবেষক)

তরুণেরাই পারে সব সম্ভব করতে



প্রাণী সংরক্ষণবিদ ও গবেষক। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি প্রাণী নিয়ে গবেষণা করতে আফ্রিকা মহাদেশে পাড়ি জমান এবং অদ্যাবধি প্রাণী অধিকার রক্ষায় কাজ করে চলেছেন।

দিগন্তজোড়া সবুজ ঘাস, মাটির সোঁদা গন্ধ আর পশুপাখি—এসবের মধ্যেই আমি খুঁজে পাই জীবনীশক্তি। আমার যখন বয়স সবে চার কি

পাঁচ, তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে আমার এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লন্ডন শহর ছেড়ে তখন প্রথমবারের মতো গ্রামে গিয়েছিলাম আমি। গ্রাম দেখে তো আমার পাগল হওয়ার অবস্থা। চারদিকে খোলা প্রান্তর, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ মাঠ। গ্রামে গিয়েই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাঁস, মুরগি, ছাগলছানা, গরু—এসব; একেবারে কাছ থেকে। আমি সারা দিন এসব 'জীবন্ত খেলনা' নিয়ে মেতে থাকতাম। এদের সঙ্গে মিশতে মিশতেই যেন আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, এগুলো আসলে খেলনা নয়। এগুলো আমাদেরই মতো। এদেরও আছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনুভূতি। আমার কাছে তখন মনে হলো, আসলে মানুষ আর এদের মধ্যে একটাই পার্থক্য, আর তা হলো এগুলো আমাদের মতো কথা বলতে পারে না। পশুপাখির জন্য আমার ভালোবাসার শুরুটা হয়তো সেখান থেকেই।

পশুপাখির প্রতি আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন আমি আমার দাদাবাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম। দাদাবাড়ির প্রতিটি ঘরের বুকসেলফে ছিল থরে থরে বই সাজানো। আমি যে ঘরটায় থাকতাম, সেখানেও একটা বইয়ের সেলফ ছিল। রোজ সকালে আমি ঘুম থেকে উঠেই হারিয়ে যেতাম বইয়ের রাজ্যে। এ সময় আমি পশুপাখির ওপর লেখা অজস্র বই পড়েছি। সেই যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠল, তা এখনো আছে। আমরা যে সে সময় খুব একটা সচ্ছল ছিলাম, তা কিন্তু নয়। আমার বাবার একটা মোটরসাইকেল কেনা দরকার ছিল, তা আমরা কিনতে পারিনি। আমার নিজের একটা বাইসাইকেল দরকার ছিল স্কুলে যাওয়ার জন্য, তা কেনার পয়সাও আমাদের ছিল না। কিন্তু বই পড়তে ভালোবাসতাম খুব। সে কারণেই আমাদের বই কেনা থেমে থাকেনি কখনো। আমি সব সময় পুরোনো বই কিনতাম। কারণ তাহলে একটা নতুন বইয়ের দামে তিনটা পুরোনো বই পাওয়া যেত। এর পরও সব বই তো আর কিনতে পারতাম না! যা-ই হোক, বই পড়ার এই অভ্যাসটা কখনো মরে যায়নি আমার। যখনই

www.facebook.com/tanbir.ebooks
সময় পেতাম, বিনা মূল্যে বই পড়ার জন্য লাইব্রেরিতে ছুটতাম। আফ্রিকার গহিন জঙ্গলে হারিয়ে যেতাম সব ভ্রমণকাহিনি পড়ে। সে সময়ই নিজে নিজে সংকল্প করে ফেলেছিলাম, রহস্যময় আফ্রিকায় যাব, পশুপাখি নিয়ে কাজ করব, ওদের কাছ থেকে দেখে ওদের চিনব, ভালোবাসব।

যা হওয়ার তা-ই হলো। আমার এসব ইচ্ছার কথা যে-ই শুনত, সে-ই হাসত। তারা শুধু আমার ব্যাপারেই হাসত। আমার কোনো ছেলেবন্ধু এসব কথা বললে সবাই খুব উৎ সাহ দিত। কিন্তু আমি মেয়ে, সে জন্যই বোধ হয় সবাই আমার কথা নিয়ে তামাশা করত। আমাকে নিয়ে হাসত সবাই। সেদিন আমি হাসিনি একটুও। আমি হেসেছিলাম অনেক দিন পর, যেদিন আমি রহস্যময় আফ্রিকার গহিন অরণ্যে পা রেখেছিলাম। একটা অল্পবয়সী মেয়ে শ্বাপদসংকুল আফ্রিকার বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারে—এটা দেখে যখন সেই মানুষগুলো বোকা বনে গিয়েছিল, তখন আমি হেসেছিলাম ওদের অবাক হয়ে ঝুলে পড়া চোয়াল দেখে। কিন্তু আমি নিজেও জানতাম, কাজটা কত কঠিন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বনেজঙ্গলে কাটানো খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ২৬ বছরের একটা মেয়ের জন্য তো নয়ই। আমাকে অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আদিবাসীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কাজ করেছি। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করতাম সব সময়।

আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণা করেই আমার জীবনের একটা বড় অংশ পার করেছি। খুব ছোটবেলায় আমার একটা পুতুল ছিল শিম্পাঞ্জির। আমি জানি না এ জন্যই আমার শিম্পাঞ্জিদের ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহ কি না! আমিই সর্বপ্রথম সভ্য দুনিয়ার মানুষকে জানাই, শিম্পাঞ্জিরাও আমাদের মতো সামাজিক জীবন যাপন করে। ওদেরও রয়েছে আমাদের মতো অনুভূতিশক্তি। মানুষের মতোই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করে পাথর থেকে, গাছের ডাল থেকে। আবার অসুখ করলে ঔষধি গাছের বাকল, পাতা, শিকড় দিয়ে ওষুধ বানায় নিজেদের জন্য!

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আমার গবেষণালব্ধ এসব কথা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি প্রথমে। অনেকে এমন কথাও বলেছে, একটা মেয়ের পক্ষে এত কিছু গবেষণা করে বের করা সম্ভব নয় মোটেও। কিন্তু আমার গবেষণার যাবতীয় কাগজপত্র, শিম্পাঞ্জিদের দুর্লভ সব ছবি কথা বলেছে আমার হয়ে, আমার গবেষণার হয়ে। এর ফলে সবাই জেনেছে যে শিম্পাঞ্জিরাও মানুষের মতো সামাজিক জীবন যাপন করে।

আমি আজও পশুপাখি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তবে শুধু শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে নয়, এখন আমি কাজ করছি পৃথিবীর সব পশুপাখি নিয়ে। আমি সারা পৃথিবীর তরুণদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি, পশুপাখিরও অধিকার আছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার। তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, ব্যাপক গবেষণা করতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে। কোনো প্রজাতিই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। আর এটা সম্ভব করতে পারে শুধু তরুণেরাই।

সূত্র: একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

নেলসন ম্যান্ডেলা (শান্তিতে নোবেল বিজয়ী)

নিজের সুযোগ নিজেই তৈরি করো



জীবনের ২৭ বছর জেলে কেটেছে নেলসন মেন্ডেলার নেলসন ম্যান্ডেলা। বিশ্বের বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা। বর্ণবাদ-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি। আফ্রিকানরা তাঁকে 'মাদিবা' বলে ডাকে। বিভিন্ন সময় মোট ২৭ বছর কেটেছে কারাগারে। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ১৯৯৩ সালে। এ বছর ১৮ জুলাই তিনি ৯২-এ পা রাখবেন। ১৯৯৬ সালের ১৬

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জুন দক্ষিণ আফ্রিকার যুব দিবসে তরুণদের উদ্দেশে উৎসাহব্যঞ্জক এক বক্তব্য দেন ম্যান্ডেলা।

আজও স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে চোখে। কোমলমতি তরুণদের নিথর দেহ পড়ে আছে পথে পথে। পুলিশের বন্দুকের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে অসংখ্য তরুণের তাজা তাজা প্রাণ। পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। এই স্মৃতিগুলো আমাদের তাড়া করে আর মনে করিয়ে দেয়, কেমন এক বিভীষিকাময় অন্ধকার ভয়ংকর অতীতকে আমরা জয় করেছি। এই স্মৃতিগুলো বারবার করে বলে তরুণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। কারণ, তরুণদের আত্মত্যাগেই মিলেছে আমাদের মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা। আমরা এখন কত না আনন্দিত। কারণ, আর কোনো বুলেট কোনো তরুণের গায়ে লাগবে না। আমাদের তরুণেরা এখন শিক্ষার ভালো পরিবেশ চায়। তারা চায় ভালোভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে।

আমরা এই দিনে সমবেত হয়েছি শুধু তরুণদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে। কেননা বর্ণবৈষম্যের বিষদাঁত ভেঙে তরুণেরাই তো আমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে। বর্ণবৈষম্যবিরোধী বিপ্লবের সামনে থেকে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। মুক্তি বা স্বাধীনতা যখনই হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, তখনই তোমরা তরুণেরা সাড়া দিয়েছ। মৃত্যুকে পরোয়া না করে, বরং তুচ্ছ বলে বুলেটের আঘাতকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছ। বিপ্লবের মাঠ থেকে তোমরা কখনোই পিছপা হওনি। একটি গণতান্ত্রিক ও বিকল্প জাতি গঠনের আহ্বানে তোমরা সাড়া দিয়েছ।

তোমরা এসব করেছ নিজেদের জন্য, জাতির জন্য। অথচ বিনিময়ে তোমরা বিশেষ কোনো সুবিধা চাওনি। এমনকি আজও চাইছ না। কিন্তু আজ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলতে চাই, এই জাতি তরুণদের কাছে ঋণী। তাই জাতি তোমাদের গণতন্ত্রের সব ধরনের সুবিধা দিতে নতুন করে একটি জাতীয় যুব কমিশন গঠন করছে। শুধু তরুণদের জন্য এই কমিশন কাজ করবে। তরুণদের চাহিদার জোগান আর

Web: http://tanbircox.blogspot.com

নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে এ কমিশনের কাজ। তরুণেরা যেমন জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ, তেমনি জাতিরও কিছু দায়িত্ব থাকে। তরুণেরা যেন জাতি গঠনে ও জাতির উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করবে জাতি। আশা করি, এই কমিশন সব বাধা পেরিয়ে সফলভাবেই কাজ করতে পারবে। তবে কমিশনের সফলতা নির্ভর করবে তরুণদের ওপরই। তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কমিশন সফল হতে পারবে না। তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া জাতিও সফল হতে পারবে না। কারণ, তোমরা তরুণেরাই জাতির কর্ণধার। আমরা ঋণী তরুণদের কাছে, যারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে জাতির জন্য। যারা আত্মবিসর্জন দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জন্য, যেন সবাই উন্নত ও সুখী জীবনযাপন করতে পারে। ২০ বছর আগের সেই দিন, ১৬ জুন ১৯৭৬। ঘুমন্ত জাতিকে তোমরা তরুণেরা সেদিন জাগিয়ে তুলেছিলে। তখন বর্ণবৈষম্যের শাসনব্যবস্থায় কালোরা ছিল ক্রীতদাস। তোমরা সেই তরুণ, যারা সেদিন নিজেদের প্রাণ দিয়ে দাসত্ব থেকে জাতিকে এনে দিয়েছিলে মুক্তি। বর্ণবৈষম্যের পতন ঘটিয়ে তোমরা বদলে দিয়েছ ইতিহাসের গতিধারা।

আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দারিদ্র্যকে জয় করা। গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করা। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ এখন অশিক্ষা আর অজ্ঞানতাকে জয় করা। পৃথিবীটা দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। আমাদের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। উদ্ভাবনের দিকে আমাদের উন্নতি করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং এসব চ্যালেঞ্জ আসলে তরুণদেরই মোকাবিলা করতে হবে। যখন শহর আর গ্রাম থেকে তোমরা প্রকৌশলী, পদার্থবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে উঠবে এবং এই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বাড়বে, তখনই আমরা বলতে পারব, আমরা উন্নতি করছি। এ জন্য যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা তোমরা পাবে, তা ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগাবে।

জাতির জন্য চাই কর্মঠ ও পরিশ্রমী তরুণ।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে তরুণদের ওপর, তোমাদের ওপর। তোমরাই পারো, তোমাদের কঠোর পরিশ্রম আর প্রচেষ্টায় নিজ জাতিকে সবচেয়ে সফল, সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে। জাতি গঠনের এ লক্ষ্যটা পূরণ করতে তোমাদের কাজ করতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতার মানসিকতা নিয়ে।

যেসব তরুণ কাজ জোটাতে পারোনি, তাদের বলি, তোমরা হতাশ হোয়ো না। সুযোগকে কাজে লাগাতে শেখো। বড় হোক ছোট হোক, কাজে যোগ দাও। শুধু শুধু অন্যের ওপর নির্ভর কোরো না। নিজেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। নিজের জন্য নিজেই সুযোগ তৈরি করো। সরকারের দেওয়া ছোট কোনো কাজ, হতে পারে সেটা কৃষিকাজ, তুমিও যোগ দাও। আমার বিশ্বাস, দেশের সব মানুষই বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্যহীন জাতি গঠনে একযোগে কাজ করবে। আমি জোরালো প্রত্যাশা করি তরুণদের কাছ থেকে। বৈষম্যহীন জাতি গঠনের স্বপ্নটাকে সত্যি করতে তোমরা প্রাণ উজাড় করে কাজ করবে। সব যুবক যদি এক হয়, সব মানুষ যদি এক হয়, তবে দেশে এমন একটা পরিবেশ গড়ে উঠবে, যেখানে সবাই মিলে সুখে-শান্তিতে বাস করা যায়।

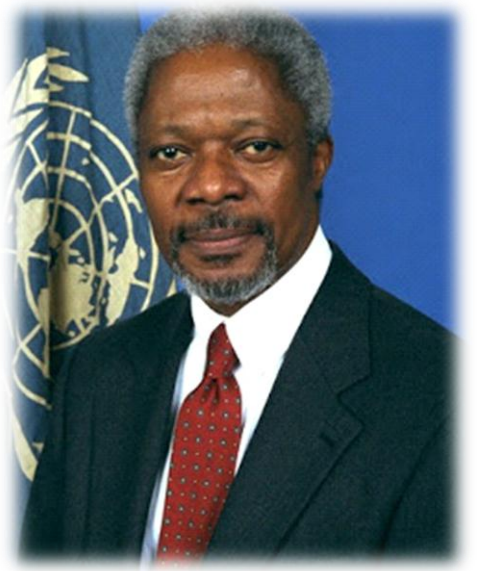
তরুণেরা আমাদের অহংকার, তরুণেরা একটা জাতির অলংকার। তরুণেরা দুঃসাহসের প্রতীক। তাদের বীরত্বকে ভোলা যায় না। সংগ্রামী তরুণদের জন্য আমরা গর্বিত। আজকের দিনে প্রতিটি জাতির জন্য এমন দুঃসাহসিক বীর যুবকের আরও বেশি প্রয়োজন। তোমরা সাহসী হও। শেখায় মনোনিবেশ করো। নিজেদের দক্ষতা বাড়াও। মতৈক্য গড়ে তোলো। জাতির ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতেই। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের জাতির ভবিষ্যৎটাকে উজ্জ্বল করো, আলোকিত করো। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

কফি আনান(জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব)

আপন ইচ্ছার অনুসারী হও



কফি আনান। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৮ এপ্রিল ঘানায়। তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ২০০১ সালে, যৌথভাবে জাতিসংঘের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে এমআইটি স্লোন স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব থাকাকালীন ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) সমাবর্তনে তিনি এই বক্তব্য দেন।

পরিচিত পরিবেশে জমকালো এই উৎসবে তোমাদের অভিনন্দন জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। উচ্চশিক্ষার জন্য বোস্টনে বেশ ভালো কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কোনোটাই এমআইটির মতো নয়।

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, ট্রাস্টিজ ও সুধী, আসুন, এমআইটির সবচেয়ে মেধাবী ও উজ্জ্বল, নিবেদিতপ্রাণ ও স্বাপ্নিক শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভিনন্দনে সিক্ত করি।

কিন্তু হে গ্র্যাজুয়েটরা, শোনো, তোমরা নিশ্চয় খুব ভালো করেই জানো যে এটা তোমরা একলাই করোনি। তাই এসো, যারা সব সময় তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তোমাদের মা-বাবা ও প্রিয় বন্ধুদের করতালির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাই।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

তোমরা এখন মুক্ত, পরীক্ষার চাপ থেকে মুক্ত। তোমাদের সামনে এখন অবারিত জীবনের নতুন যাত্রাপথ। শিক্ষাজীবনের যত ঋণ, যত দায়, সেসব শোধার সময় এখন।

আজ যেখানে তোমরা বসা, একদিন আমিও সেখানটায় বসেছিলাম। কিলান কোর্টে আজ তোমাদের এই আনন্দমাখা মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ২৫ বছর আগের কথা। তখন আমি এই এমআইটিতে পড়তাম। এখানে স্লোন ফেলো (এমআইটিতে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স) হিসেবে আমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। শিখেছিলাম আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই। শুরুতে সহপাঠীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ ছিল। আমি বলব, সবার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। সফল হওয়ার জন্য এবং নিজ নিজ নেতৃত্বগুণ প্রমাণের জন্য প্রত্যেকেই সমান সংকল্পবদ্ধ ছিল। আমাদের মধ্যে কোনো মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল না। আমি অসম্ভব রকম খুশি যে সেটা আজ বদলেছে।

প্রথম পর্বের মাঝামাঝি সময়ের কোনো একদিন চার্লস নদীর তীরে হাঁটছিলাম। হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম আমার উদ্বেগ আর সংশয় নিয়ে। এত মেধাবীর ভিড়ে কীভাবে টিকে থাকব, কীভাবে সফল হব? জবাবটা যেন ভেতর থেকেই পেলাম, 'অন্যকে অনুকরণ কোরো না, আপন ইচ্ছার অনুচারী হও। হৃদয়ের কথা শোনো।' বাঁচতে হলে বাছতে হবে। কিন্তু বাছবিচারের আগে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, তুমি কে? তোমার স্বপ্ন কী? তোমার গন্তব্য কোথায়? কেন সেথায় যেতে চাও তুমি? দেখলাম, ধীরে ধীরে আমার উদ্বেগ উবে গেল। এমআইটি থেকে ফল হিসেবে আমি শুধু যে একধরনের বিশ্লেষণী শক্তি অর্জন করেছিলাম তা-ই নয়, নতুন যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া কিংবা যেকোনো চ্যালেঞ্জকে সম্পূর্ণ নতুন কিছু সৃষ্টির সম্ভাব্য সুযোগ হিসেবে দেখা এবং কাজের বেলায় সহকর্মীর মতামত নিলেও শেষে নিজের কাজটা নিজের মতো করেই করা ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আস্থা বা আত্মবিশ্বাসটাও অর্জন করেছিলাম এমআইটি থেকে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
এমআইটির অ্যালামনাইদের কথা যখন কেউ ভাবে, দেখে এঁদের মধ্যে কেউ পদার্থবিজ্ঞানে, কেউ রসায়নে, কেউ বা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আবার কেউ হয়েছেন সফল ব্যবসায়ী, কেউ বা প্রকৌশলী, যাঁরা নানা উপায়ে আমাদের জীবনমান আরও উন্নত করে চলেছেন। কিন্তু কেউ কী ভেবেছে, জাতিসংঘের একজন মহাসচিব হবে এমআইটি থেকে? কোনো টিভি কুইজে চটপট এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া একটু কঠিনই ছিল বটে।

যা হোক, আমরা এমন এক জাতিসংঘের স্বপ্ন দেখি, যেটি আরও বেশি বন্ধুপ্রতিম হবে। এই পরিবর্তন তার নিজের জন্য নয়, যেন ভালো কিছু করার জন্য সবাই সুযোগ পায় সে জন্য। আরও স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ আরও বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আরও বেশি দায়িত্বশীল জাতিসংঘের স্বপ্ন দেখি আমরা। আমরা সেই জাতিসংঘ চাই, যা শুধু তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের জন্য নয়, বরং গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করবে গোটা বিশ্বের সব মানুষের জন্য।

আমরা নিজ নিজ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করি। জীবনে সংগ্রাম করাটাই তো চিরসত্য। দরিদ্র দেশের ছোট্ট কোনো গাঁয়ে নাকি বেকন হিলে—কোথায় একটি শিশু জন্ম নিল সেটি মুখ্য বিষয় নয়। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষের আত্মমর্যাদা ও মৌলিক সাম্যতায়। আমি বিশ্বাস করি, সব মানুষ শান্তি চায়। আমরা অসাধারণ সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা। যদিও তা বিভক্ত বিভিন্ন দলে, তবু আমরা এক মানবসম্প্রদায়ের অংশ।

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তোমাদের সহযোগিতা দরকার। ১৯৯৭ সালের এই ব্যাচের তোমরা যে যেখানেই যাও, ভবিষ্যতে যে যা-ই করো না কেন, তোমরা সেই পৃথিবীতে যোগ দিতে যাচ্ছো, উত্তরোত্তর যার বিশ্বায়ন ঘটছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেখানে তোমরা সবাই এক হয়ে কাজ করবে।

সবার কল্যাণ হোক।

এমআইটির ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: জাহাঙ্গীর সুর

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

বান কি মুন (জাতিসংঘের মহাসচিব)

স্বপ্ন দেখতাম, জাতিসংঘে কাজ করব



বান কি মুনের জন্ম কোরিয়ায়, ১৯৪৪ সালের ১৩ জুন। তিনি সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক পাস করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন ১৯৮৫ সালে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে ডক্টর অব লজ গ্রহণকালে তিনি এই বক্তৃতা দেন ২০০৯ সালের ২৬ অক্টোবর।

সিয়াটলের এক মহাদার্শনিক বলেছিলেন, ‘জ্ঞানীরা বলেন, প্রাজ্ঞরা শোনেন।’ এই দার্শনিকের নাম জিমি হেনড্রিক্স। সিয়াটলে বক্তৃতা করার ক্ষেত্রে বোধ হয় আমিই জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।

কিছুক্ষণ আগে একঝাঁক তরুণ শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছিল। তোমাদেরই ৫০ বন্ধু স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছে। মনে হচ্ছিল যেন আমি একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী। এটাকে তোমরা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি বলতে পারো। কিন্তু আমি মনে করি, এটা আমি অর্জনই করেছি। আমার নিজের ভাবনার কথা এমন অনুষ্ঠানে বলা ঠিক হবে কি না জানি না। লোকে বলে, সবুরে মেওয়া ফলে। কথাটা আসলেই সত্য। কেন সত্য, সেটাই তোমাদের বলছি।

ঠিক ৪০ বছর আগে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্কটা কীভাবে আরও দৃঢ় করা যায়, তা নিয়ে তখন অনেক আশা-প্রত্যাশা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এবং এশিয়ার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তারা বুঝতে চেয়েছিল। আমি তখন অনেক ছোট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক তরুণ কর্মী। জানতে পারলাম,

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আমাদের দেশ থেকে একজন শিক্ষার্থীকে চীনা স্টাডিজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অবৈতনিক বৃত্তি দিতে ইচ্ছুক। ওই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টিই হলো এই ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন। আমি সুযোগটা লুফে নিতে উঠেপড়ে লাগলাম। এ জন্য পড়াশোনা শুরু করলাম, কঠোর পরিশ্রম করলাম। বেশি বেশি পরীক্ষা দিলাম। এ কাজে আমার সর্বোচ্চ ঢেলে দিলাম। একদিন আমার কাছে একটি চিঠি এল। চিঠিতে সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে। আমি খুবই উত্তেজিত। আমাকে সিউলের রয়েল হোটেলে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। নিশ্চিত ছিলাম, সুযোগটা পাব। যখন রয়েল হোটেলে গেলাম, দেখতে পেলাম, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে আসা এক অধ্যাপকের কাছে ভাইভা দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ও সরকারি কর্মকর্তাসহ ১২ জন কোরীয় অপেক্ষা করছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এই শিক্ষার্থী নির্বাচন শুধু কোরিয়া থেকেই নয়, পুরো এশিয়া থেকে মাত্র একজনকে নির্বাচন করবে যুক্তরাষ্ট্র। আমি পরীক্ষা দিলাম। সাক্ষাৎকার দিলাম। সৌভাগ্যবশত কোরিয়া থেকে আমিই নির্বাচিত হলাম। আরেক দিন, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে আরেকটি চিঠি এল। চিঠিতে বলা হয়েছে, সংবাদটা আনন্দের। কিন্তু আমি নির্বাচিত হয়েছি প্রথম রানারআপ হিসেবে। তারা বলেছে, যদি প্রথমজন সুযোগটা না নেয়, তাহলে আমাকে সুযোগটা দেওয়া হবে। তারা আমাকে বলল, অপেক্ষা করো। এবং আমি অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আরও অপেক্ষা...আরও অপেক্ষা...এভাবে অপেক্ষায় কেটে গেছে ৪০ বছর! অতঃপর হলো অপেক্ষার অবসান। ৪০ বছর পর আজ আমি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে আসার সুযোগটা পেয়েছি! তোমাদের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। তোমাদের এই জাঁকজমক ও বনেদি পরিবারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিটা আমার নিজের জন্য নয়, বরং যে সংঘে আমি কাজ করি এই সম্মানটা সেই জাতিসংঘের

জন্য। বিশ্বকে বদলে দিতে জাতিসংঘের যে ভূমিকা, আমাকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে তোমরা তারই স্বীকৃতি দিলে।

আমার সামনে যারা বসে আছ, কিছু প্রবীণ ছাড়া তোমরা সবাই তরুণ। তোমাদের মুখের চেহারায় আমি পুরো পৃথিবীটাকেই দেখতে পাচ্ছি। যেন তোমরাই গড়ে তুলেছ জাতিসংঘ। আমাদের একেজনের জীবনের গল্প একেক রকম ঠিকই, কিন্তু আমাদের সবার স্বপ্ন একটাই। জাতিসংঘও একটিমাত্র স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই স্বপ্নটা হলো একটা প্রত্যয়: সর্বনাশা যুদ্ধের কালো অভিশাপ থেকে আগামী প্রজন্মকে মুক্ত করা। এই স্বপ্নটা হলো মানুষের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাধীনতার সঙ্গে আদর্শ জীবনব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এটাই জাতিসংঘ সনদের প্রত্যয়। বিশ্বের যে দেশেই আমি যাই, যখনই আমি বিশ্বনেতাদের সামনে ভাষণ দিই, আমি তাঁদের জাতিসংঘ সনদের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। আমি জবাবদিহির কথা বলি, বলি ন্যায়বিচারের কথা। আমি অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলি। আজ এই সমাবর্তনে তোমরা যারা তরুণ, তোমাদের উদ্দেশ করেই আমি বলছি।

তোমাদের শক্তি, সফল হওয়ার আত্মবিশ্বাস ও নায়বিচারের বোধ বিকশিত করো এবং তোমাদের ভেতরের সুপ্ত বাসনা প্রস্ফুটিত করো। আমার বেড়ে ওঠা যুদ্ধ-পরবর্তী কোরিয়ায়। আমি যখন ছোট ছিলাম, সে সময় আমাদের আশপাশের সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আমরা নিঃস্ব, অসহায়, হতদরিদ্র হয়ে পড়েছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় কাটছিল দিন। ঘরবাড়ি, শহর—সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হারালাম অনেক বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন। এরপর এল জাতিসংঘ। আশায় বুক বেঁধে সবকিছু নতুন করে গড়ে তুলতে জাতিসংঘ আমাদের সাহায্য করল। তখন জাতিসংঘ আমাদের কাছে এসেছিল আশার আলো হয়ে। এমনকি এখনো, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক মানুষের আশার প্রদীপ এই জাতিসংঘ। আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমি জাতিসংঘে কাজ করব। আমার ও আমার দেশের জন্য জাতিসংঘ

যেমনটা করেছে, আমিও স্বপ্ন দেখতাম, বিশ্বটাকে অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলব। এবার তোমাদের পালা। এবং আমার নিজেরও। এসো, আমরা সবাই ঐক্য গড়ে তুলি। এসো, একটি সুখী পৃথিবীর জন্য কাজ করি; এমন পৃথিবী, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে না; এমন পৃথিবী, যেখানে একটিও শিশু আর ক্ষুধার জ্বালায় কাতরাবে না। এসো, সেই পৃথিবীর জন্য কাজ করি, যেখানে ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে স্কুলে যাবে। যেখানে সবার জীবন সুস্থ, সুখী ও সফল হবে।

এসবই জাতিসংঘের স্বপ্ন। এসব মানুষের মৌলিক অধিকার। বিপদে বিশ্বের যত পুরুষ, যত নারী ও শিশু—সবার পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্বটা এসো কাঁধে তুলে নিই। এসো, সবার স্বপ্নগুলো সত্য করতে সাহায্য করি।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত, নির্বাচিত অংশের অনুবাদ জাহাঙ্গীর আলম

স্বপ্ন দেখো আকাশ ছোঁয়ার



প্রথমেই সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমার সামনে বসে থাকা ভবিষ্যতের তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য।

আমার মনে হচ্ছে, আমি ঠিক জায়গায়ই এসেছি কথা বলার জন্য। এর কারণ কিন্তু এই নয় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৫০ বছরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়; এর কারণ হলো আজকের এই তরুণেরাই সামনের দিনগুলোতে আমাদের নেতৃত্ব দেবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আমার নিজের দেশ কোরিয়ায় গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে আমি আমার ছোটবেলার স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলে গিয়ে আমার মনে পড়ে গেল আমার অতি প্রিয়

www.facebook.com/tanbir.ebooks
এক শিক্ষকের কথা। সে সময় তিনি আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সব সময় একটা কথা বলতেন, 'নিজের মাথা উঁচু করে ধরো মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে সুদূর আকাশে, কিন্তু নিজের পা যেন মাটিতেই থাকে।' এ কথাটা আমিও বলতে চাই তোমাদের। তোমরা তরুণ প্রজন্ম অবশ্যই অনেক স্বপ্ন দেখবে, নতুন কিছু করার, বিশ্বকে নতুন কিছু দেওয়ার, কিন্তু যাই-ই চিন্তা করো না কেন, সেটা সফল করার পদ্ধতিটা যেন অবশ্যই বাস্তবসম্মত হয়। সব সময় বড় চিন্তা করো, প্রথাগত স্বপ্নের বাইরে সীমানা ছড়ানো স্বপ্ন দেখো। আমি তোমাদের বলব, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীদের সব সময় স্পষ্টবাদী, সাহসী ও নির্ভীক হতে। বড় কিছু করার চিন্তা করো, তোমার ভবিষ্যৎ কিন্তু একেবারে শুধুই তোমার হাতে। নিজের স্বাধীন চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগাও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য—নিজের চেয়ে বড় কিছু হওয়ার জন্য এবং এটা সম্ভব।

আজ আমি তোমাদের আমার নিজের জীবনের গল্প শোনাব। আমি তোমাদের জানাব আমি কোথা থেকে এসেছি আজকের এ পর্যায়ে। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কোরিয়ায়। দারিদ্র্য আর যুদ্ধ-ঝঞ্ঝার মধ্যেই বেড়ে উঠেছি আমি। জাতিসংঘ আমার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবং আমার দেশের অসহায় মানুষকে বাঁচিয়ে ছিল। সে সময় জাতিসংঘের মাধ্যমে অনেক অস্ট্রেলিয়ানও আমার দেশকে সহযোগিতা করেছিল। তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা। সেদিন যদি এমনটা না হতো, তাহলে আজ আমি হয়তো এখানে এভাবে আসতে পারতাম না।

আজ যে 'প্রত্যাশার বিপ্লব' শুরু হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্ববাসীকে এসব সাহসী জাতির সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। এসব মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে যে নিজের নেতাদের কাছ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে সব মানুষের এবং এটাও জনগণের একটা মৌলিক অধিকার। কোরিয়ায় একটা প্রবাদ আছে, 'তোমার হাতে যতগুলোই সুন্দর মুক্তা থাকুক না কেন, এগুলো

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
যদি একসঙ্গে একই সুতোয় না গাঁথো, তাহলে কখনোই একটা সুন্দর গলার হার বানাতে পারবে না।' এই একবিংশ শতাব্দীর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা একাকী কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য সব দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যারা একসঙ্গে কাজ করবে, সেসব জাতির সামনেই রয়েছে সুন্দর ভবিষ্যৎ। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জ্বালানিস্বল্পতা, বিশ্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, খাবারের অভাব দূর করতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যেসব চ্যালেঞ্জের কথা বললাম, সেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে হয়তো আলাদা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জ কিন্তু আসলে একে অপরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এগুলোর যেকোনো একটির সমাধান বের করতে গেলে একসঙ্গে অনেকগুলোর সমাধান করে ফেলা সম্ভব। এসব চ্যালেঞ্জকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে এবং সব জাতিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

কখনোই স্বার্থপরদের সুযোগ দিয়ো না তোমাকে পেছনে ধরে রাখতে; পুরো দুনিয়ায় পরিবর্তন আনার ক্ষমতা এবং শক্তি তোমার নিজের মধ্যেই আছে। ভবিষ্যতের সুন্দর একটা বিশ্ব গড়তে পারো তুমিই। এ বিশ্বাসটা তোমার থাকতে হবে। নিজের ওপর আস্থা থাকতে হবে। সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে। তোমরাই গড়ে তুলবে সুন্দর এক পৃথিবী। অনেক শুভ কামনা রইল তোমাদের প্রতি। আশা করি, তোমরা সবাই সামনের দিনগুলোর জন্য নিজের একটা সুন্দর লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

শিরিন এবাদি(শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)

ভাবনাগুলো ছড়িয়ে দাও



শিরিন এবাদি। মানবাধিকারকর্মী। ২০০৩ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালে ইরানের হামেদানে। ২০০৫ সালের ১৩ জুন কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

তোমাদের মাঝে আসতে পেরে ভালো লাগছে আজ। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিল, তার জন্য আমি গর্বিত ও আনন্দিত। ইরানের প্রচুর লোক বাস করে কানাডায়। আমাদের তরুণেরা পড়াশোনা করছে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। নিজেদের মেধা দিয়ে দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তারা সবাই প্রতিনিধিত্ব করছে দেশের সংস্কৃতির। ইরানের সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারছে কানাডার মানুষ। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই দুটো জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আছে আমার দেশের অনেক তরুণ। আমাকে এভাবে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। শুধু নিজেদের ভাবনাগুলো নিয়ে কথা বলা এবং ভালো কিছু স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়েই একটি সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। শান্তিতে থাকাটা আমাদের সবার অধিকার। এ অধিকারের কারণেই মানুষ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। পায় ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা। শান্তি ছাড়া সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায়। শান্তি তখনই সব সময়ের জন্য টিকে

থাকে, যখন এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র, এ দুটি স্তম্ভের দ্বারা তৈরি হয়। যখন একটি দেশের মানুষ ধর্মান্ধ হয় কিংবা কোনো জাতি যদি একনায়কতন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, তবে বিনষ্ট হয় সেখানকার শান্তি। মানুষ হারিয়ে ফেলে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা। এটা সমাজের জন্য অভিশাপ। এমন সমাজে অস্ত্রের দ্বারা ভীত হয়ে প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলে সবাই। সমাজের সব জায়গায় বিরাজ করে কবরের নিস্তব্ধতা।

আমাদের সব সময় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে। বুঝতে হবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের মূল্য। শান্তির দুটো দিক রয়েছে। একটা ভেতরের, আরেকটা বাইরের। এ দুটোর সম্পর্কটা ঠিক যেন মহাবিশ্ব আর আমাদের পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কের মতো। পৃথিবী আর মহাবিশ্বের অনেক কিছুই আমরা জানি না। রহস্যময় অনেক কিছু। মানুষের ভেতরের দিকটাও এমন রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। এই ভেতরের দিকটা আমাদের বিবেকবোধ, অপরাধবোধের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভালো ভালো গান শুনে, প্রকৃতির সাৌন্দর্য অনুধাবন করে ভেতরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ স্থাপন করা যায়। যদি মানুষের শোনার ক্ষমতা না থাকত, তবে কখনোই সংগীতের সৃষ্টি হতো না। না থাকত যদি দেখার ক্ষমতা, তবে কখনোই মানুষ ছবি আঁকত না।

এসব কথা বলে আমি একটাই প্রশ্ন করতে চাই, কীভাবে নিজেদের ভেতরটাকে না বুঝতে পেরে আমরা শান্তির কথা বলব? আগে বুঝতে হবে নিজেকে। ভেতরে শান্তি থাকলেই বাইরের দিকটাও সুন্দর হয়ে উঠবে। তখনই আমরা শান্তিতে থাকতে পারব, যখন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জীবনকে পরিচালিত করতে পারব। যারা এখনো নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে জানে না, তাদের প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করে যেতে হবে। জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ জানতে পারে নিজের লক্ষ্যের কথা। তারাই ভাগ্যবান, যারা জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ খুঁজে বেড়ায় এবং কঠিন

www.facebook.com/tanbir.ebooks
পরিশ্রমের মাধ্যমে পৌঁছাতে সক্ষম হয় নিজেদের লক্ষ্যে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর উচিত নিজেদের ভাবনাচিন্তাগুলো এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের জানানো। যখন অনুন্নত দেশগুলোকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে উন্নত দেশ, অস্বীকার করে নিজেদের ভাবনাগুলোকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে, তখনই বাধাগ্রস্ত হয় সভ্যতার অগ্রগতি। এটা সবার কাছেই খুব দুঃখের একটা ব্যাপার। নাইন-ইলেভেনের ভয়াবহ ঘটনার পর বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশে পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউক্লিয়ার ও জেনেটিকস নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ এখন আর তাদের নেই বললেই চলে। এসব দেশের ভিসাজনিত জটিলতা বাড়ছে দিনকে দিন। পুরো পৃথিবীকে গ্লোবাল ভিলেজ ভাবলে জ্ঞান ও সম্পদ দুটোরই সমবণ্টন প্রয়োজন। জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে না দিতে পারলে উন্নত দেশগুলোর কখনোই বিশ্বায়নের কথা বলা উচিত নয়।

মানুষের ভুলের কারণে আমরা তাদের ধর্ম ও জাতীয়তাকে দায়ী করতে পারি না। ধর্ম ও জাতীয়তার কারণে মানুষ কখনোই ভুল করে না। মানুষ ভুল করে তার নিজের কারণে। নাইন-ইলেভেনের ভয়াবহ অপরাধ ও অপরাধীদের কারণে তরুণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাওয়া সবারই অধিকার।

তাই এসো, রোপণ করি জ্ঞানের বৃক্ষ, উদার হই স্বর্গের মতো, হাওয়ার মতো ছড়িয়ে দিই বন্ধুত্বের বীজ, রুখে দাঁড়াই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সবাইকে ভালোবেসে এগিয়ে আসি একে অপরের বিপদে।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, নির্বাচিত অংশের অনুবাদ কিঙ্কর আহ্সান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

অমর্ত্য সেন(অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)

শিক্ষা সবকিছু বদলে দেয়



নোবেল পুরস্কারজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম ৩ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে। ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। অমর্ত্য সেন বর্তমানে থমাস ডব্লিউ লামোন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এডিনবরায় কমনওয়েলথের এক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি মৌলিক শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক এ বক্তৃতাটি করেন।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষা-সংক্রান্ত এ সম্মেলনে কথা বলতে পারছি বলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ সম্মেলনের জন্যে এডিনবরাকে বেছে নেওয়ায় আমি খুবই খুশি। শিক্ষার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ সম্মেলনের জন্যে এডাম স্মিথ, ডেভিড হিউম এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদদের স্মৃতিবিজড়িত এডিনবরার চেয়ে উত্তম স্থান আর কী হতে পারে?

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন শিক্ষাগত বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন? কেন শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষা অর্জন, শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির মধ্যে বৈষম্য থাকবে? পৃথিবীতে পক্ষপাতহীন একটি পরিবেশ তৈরি করতে আমাদের এ বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। এইচ জি ওয়েলসের ভাষায়, মানব ইতিহাস ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে শিক্ষা ও বিপর্যয়ের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায়। যদি আমরা এভাবেই পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার কক্ষপথ থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে রাখি, তবে

পৃথিবী হয়ে যাবে অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদ, ন্যূনতম ন্যায়পরায়ণতার পৃথিবী।
এইচ জি ওয়েলসের বিংশ শতকের চেয়ে আজকের পৃথিবী এখন আরো অনেক অনিশ্চিত। ৯/১১-এর বিভীষিকা এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে অগণন মানুষের মৃত্যু মানব জীবনকে আরো অনেক বেশি নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। শুধু সন্ত্রাস ও সহিংসতাই মানুষের নিরাপত্তাহীনতার কারণ নয়। সহিংসতায় যত মানুষ মারা যায়, এইডস রোগে তার চেয়ে কম মানুষ মারা যায় না। মানুষের নিরাপত্তাহীনতা নানাভাবেই তৈরি হতে পারে, সন্ত্রাস ও সহিংসতা তার অন্যতম কারণ মাত্র।
সন্ত্রাসবাদ কিংবা গণহত্যা প্রতিরোধ করতে চাইলে আমাদের এই মানব-নিরাপত্তাহীনতার বহুমুখি প্রকৃতি এবং প্রকাশিত রূপগুলি মেনে নিতে হবে। যেহেতু এটা ঘটছে, সেহেতু সকল ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে মৌলিক শিক্ষার প্রসার এবং ফলপ্রসু প্রচারই শক্তিশালী প্রতিরোধী ভূমিকা রাখতে পারে। সারা পৃথিবীতে এই নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করতে সকল ধরনের বৈষম্য এবং অবহেলাকে দূর করতে হবে যেখানে মৌলিক শিক্ষার ভূমিকা বিবেচনা করা জরুরি।
নিরক্ষরতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব নিরাপত্তাহীনতার দুটি রূপ। যে পড়তে, লিখতে, গুনতে কিংবা যোগাযোগ করতে পারে না, সে সবচেয়ে বড় বৈষম্যের শিকার। এভাবেই তাঁর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ যদি ব্যক্তির নাগালে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে তা হবে এই বৈষম্য দূর করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, এ নিরাপত্তাহীনতাই পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, সংঘর্ষের সূচনা করে।
মৌলিক শিক্ষা জীবনকে সহজভাবে দেখতে শেখায়। অসম্ভব দরিদ্র পরিবারগুলোও এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারগুলি শিক্ষাকে কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে, তা

দেখে আমি অভিভূত হয়েছি।
ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে দেখা গেছে সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কীভাবে কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কারের পুরো অর্থ দিয়ে আমি তৈরি করেছি 'প্রতীচী ট্রাস্ট', যার লক্ষ্য ভারত ও বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমতায়নকে ত্বরান্বিত করা। আমি দেখেছি, কেন মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হয়। স্কুলের খরচ, নিরাপত্তাসংকট এবং আরও অনেক সামাজিক বাধা তাদের স্বপ্ন পূরণে দেয়াল তৈরি করে। অর্থনৈতিক দৈন্যদশা স্কুলে না পাঠানোর বড় একটি কারণ। এ বাধাগুলো দূর করতে হবে। তবে আরও অনেক বাধা আছে, মেয়েদের নিরাপত্তা ও ছেলেমেয়ের শ্রমের ওপর দরিদ্র পরিবারের নির্ভরতাও স্কুলে না পাঠানোর জন্য দায়ী। পাঠদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়টি জানাতে হবে যাতে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি দূর করা সম্ভব হয়। মানুষের নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে আমাদের পাঠদানের গুরুত্ব বুঝতে হবে। মৌলিক শিক্ষা মানুষকে চাকরি পেতে এবং অর্থসংস্থানে সাহায্য করে। শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক এ সম্পর্ক বিশ্বায়নের এ যুগে খুব জরুরি। এগুলো কিন্তু আমাদের সমাজের নিরপত্তাহীনতারই স্বরূপ। তাই মৌলিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা দরকার। এটি তাদের দারিদ্রের সমাপ্তি টানার ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখাবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে তাদের যে বিশাল শূন্যতা, একে পূরণ করতে হবে। মেইজি স্থাপনের পর জাপানে ১৮৭২ সালে 'মৌলিক শিক্ষার কোড' প্রচলন করা হয়। প্রচার করা হয়, কোনো সম্প্রদায়ে একটিও অশিক্ষিত পরিবার থাকবে না, কোনো পরিবারে একজনও অশিক্ষিত ব্যক্তি থাকবে না। শিক্ষা বৈষম্য দূর করার মধ্য দিয়ে আজ জাপান এ শতকের একটি অন্যতম দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দেশ। ১৯১০ সালে সেখানে অনেক দরিদ্র মানুষ ছিল। এরপর জাপান ব্রিটেনের চেয়েও অধিক বই ছেপে গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে দ্বিগুণ বই

প্রকাশ করেছে। আজ তার ফল সুস্পষ্টভাবেই দেখা মেলে।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, হংকং এবং সিঙ্গাপুরসহ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ প্রত্যেকেই এভাবে তাদের উন্নয়নের পথটি তৈরি করেছিল। শিক্ষার প্রসারই একে সহজ করেছে। বিশ্বব্যপী অর্থনীতিতে তাদের অংশ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কারণ, তাদের জনগণ আজ লিখতে ও পড়তে পারে, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা তৈরি করতে পারে, নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে। অশিক্ষা মানুষকে তার আইন অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, দেশ গঠন ও স্বাস্থ্যগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। অশিক্ষার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। নারীরা তাদের অধিকার, প্রাপ্তি, সম্পদের মালিকানা থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি সমাজে প্রকট বৈষম্যের শিকার হয়। তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অবিচার ও অন্যায় আচরণ। গবেষণায় দেখা গেছে, কীভাবে ন্যূনতম সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নারীদের শিক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ত্বরান্বিত করে, যার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সঙ্গে নারীর এই দুরত্বকে দূর করা। বন্ধুতা এবং বিশ্বস্ততা নির্মাণে হোক কিংবা স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারেই হোক, এসব ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর জন্য প্রয়োজন, একদিকে যেমন শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সহজলভ্য করে দেওয়া, অন্যদিকে শিশুদের বিভিন্ন অঙ্গনের জ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়া। তারা যেন জিন্তা করতে পারে, কারণ অনুসন্ধান করতে পারে, সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা দরকার। মৌলিক শিক্ষা যে শুধু দক্ষতা বৃদ্ধির আয়োজন করে তা নয়। এটি প্রাকৃতিক পৃথিবীর সাথে একাত্ম করে মানুষকে। তার মনকে করে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রপূর্ণ। বুঝিয়ে দেয় স্বাধীনতা, যুক্তি ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব।

গার্ডিয়ান-এর আর্কাইভ (২০০৩) থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর: শিখতী সানী

টনি মরিসন(সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)

নিজের গল্প নিজেই তৈরি করো



টনি মরিসন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৩ সালে। আর পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৮ সালে। মরিসনের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন

আমি স্বীকার করছি, ওয়েলেসলির ২০০৪-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। প্রথমত আমি উল্লসিত ছিলাম এই ভেবে যে, ১২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকদের সামনে বক্তৃতা করার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই দারুণ। অন্যদিকে আমার দ্বিতীয় কারণটি ঠিক ততটা আনন্দের নয়। আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আজকের এই দিনে কী বলব তা ভেবে। কারণ ২০০৪ সালের মুক্তমনা, স্বাধীনচেতা ও আশাবাদী পাঁচ শতাধিক সুশিক্ষিত ও আধুনিক নারীর সামনে কী নিয়ে কথা বলব তা চিন্তা করে বের করাটা অতটা সহজ ছিল না। সেই সঙ্গে আমাকে আরও বেগ পেতে হচ্ছিল এখানকার সুদক্ষ ও নেতৃত্বগুণে গুণান্বিত শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সামনে আমাকে কথা বলতে হবে তা ভেবে। যাহোক, তারুণ্য সব সময়ই নতুনের কথা বলে। যেভাবেই হোক না কেন, ভবিষ্যৎকে তোমরাই নির্মাণ করবে। সেটিও ভবিষ্যৎ, যা

অন্যরা তোমাদের জন্য নির্মাণ করবে। জানতে হবে কীভাবে অন্যরা এতে অংশ নেবে এবং তোমাদের অভিজ্ঞতার ওপর ছাপ ফেলবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষপাতী নই। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। হতে পারে অধিকতর ভালো অবস্থানের জন্য অতীত তোমাদের ডাকবে। ইতিমধ্যেই তোমরা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অতীতের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে জেনেছ। শিখেছ অতীতকে শ্রদ্ধা করতে। যদিও আজ আমি অতীতের গুণকীর্তন করতে আসিনি এখানে। তুমি যদি অতীতের ভুলভ্রান্তি এবং সত্য-মিথ্যা শনাক্ত করার কৌশল রপ্ত করতে পার, তবে সাফল্য তোমার কাছেই ধরা দেবে। তাপে গলিয়ে ধাতুকে যেমন বদলে দেওয়া হয়, তেমনি এক প্রক্রিয়ায় নিজেদের তৈরি করার চেষ্টায় তোমরা যারা নিমগ্ন আছ, তাদের কাছে হয়তো আমার বক্তব্য অনুপযোগী মনে হতে পারে। কারণ, আমি অতীতকে মনে করার কথা বলছি। আমার কথাগুলোর মানে তোমরা বুঝবে শিগগিরই। সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অতীতের প্রয়োজন আছে। একে অস্বীকার করা সম্ভব না।

এ প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থী ও পৃথিবীর একজন নাগরিক হিসেবে তোমাদের দায়িত্বগুলো নিয়ে পুনরায় ভাবো। যা কিছু মন্দ তা ভুলে নিজেদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তব রূপ দিতে বেরিয়ে পড়ো। রক্ষা করো পৃথিবীকে। সঠিক ভাবনা ও কর্মশক্তি নিয়ে এগিয়ে গেলে নিশ্চিত তোমরা উন্নতি করবে, বাঁচাতে পারবে পৃথিবীটাকে। প্রত্যেককে জানতে হবে, যদি পৃথিবীকে বাঁচাতে না-ও পার, অন্তত তাকে ভালোবাসো। এই বিপর্যস্ত পৃথিবীকে আর কষ্ট দিয়ো না। শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাও হারাতে বসেছে আজকের পৃথিবী। একে আর আঘাত কোরো না। চিহ্নিত করো সেই সব অমানুষদের যারা এই সুন্দর পৃথিবীটাকে এলোমেলো করে দিতে চায়।

আমি নিশ্চিত, তোমরা হয়তো বলবে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা এখনই পার করছ সবাই। এমনটা ভেবে থাকলে তোমাদের জন্য রইল আমার

সান্ত্বনা। কারণ এমন ভাবনা থেকে তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকবে। আত্মতৃপ্তি কখনো কখনো মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে আর নতুন কিছু করার কথা ভাবতে পারে না। আত্মতৃপ্তি যদি কঠোর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে আসে তবে ক্ষতি নেই। কারণ কঠোর পরিশ্রমের সামনে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।তোমাদের কেবল একজন করদাতা, একজন ভোক্তা বা সংখ্যাগুরু হওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা সত্যিকারের একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো।

অবশ্যই তোমরা সাধারণ, তবে ফেলনা নয়। তোমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই—একজন মানুষ হিসেবে তোমাদের মতো এই গ্রহে নেই আর কেউ। তোমাদের মতো প্রখর স্মৃতিশক্তি আর কারোর নেই। যা অজানা তা এখন তোমরা জানতে সক্ষম হবে। নিজেদের গল্পটা লিখবে তোমরা নিজেরাই। আর এ জন্য ভাবো এবং অনুভব করো পৃথিবীটাকে। সম্পদ ও বিলাসিতার মোহ, লোভ, অন্যের ওপর দখলদারি করার গোপন বাসনা আর ভবিষ্যৎকে অবহেলা করার চিন্তা দূর করে ফেলো জীবন থেকে। ঘৃণার কথা ভুলে গিয়ে আজ ভালোবাসো সবাইকে।

যারা পৃথিবীর ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদের নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য পৃথিবীর অমঙ্গল হবে এমন অনেক কিছুই এড়িয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে পার। তবে এতে নিজেরই ক্ষতি। নিজের গল্প নিজেকে তৈরি করার জন্য সব সময়ই মনের ভেতরকার কথা শুনতে হবে। তুমি কে এবং কী তোমার দায়িত্ব তা খুঁজে বের করতে হবে। আর এটা সম্ভব হলেই নিজের গল্পের নির্মাতা হতে পারবে নিজেই। এসব ভেবে আমি আজও আশাবাদী। আমি মানুষের হৃদয়ের নৈতিক ইচ্ছায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি সৌন্দর্যের আহ্বানে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের জীবন ইতিমধ্যেই সম্ভাবনাময়, জীবনকে এবার রাঙাও ছবির মতো করে। ধন্যবাদ। ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জান্নাত-উল ফেরদৌস

প্রিন্সেস ডায়ানা(মানবাধিকার কর্মী)

শুরু করতে হবে এখনই



প্রিন্সেস ডায়ানার জন্ম ১৯৬১ সালের ১ জুলাই। ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৩৬ বছরের জীবনে সমাজসেবামূলক কাজ করে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়ে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সূচনা করেন এক নতুন অধ্যায়।

মানুষকে সমাজে বাস করতে হলে নিজের আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অনেকেই জানেন না কীভাবে একজন কিশোর অপরাধীর সঙ্গে কথা বলতে হয়, কীভাবে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয় একজন শ্রবণ কিংবা মানসিকপ্রতিবন্ধী মানুষের দিকে। তাঁরা তো সমাজের বাইরের কেউ নন। এমন অসহায় মানুষেরা সমাজে বাস করেও নির্ভয়ে কিছু করার পরিকল্পনা করতে পারেন না। চারপাশের বিরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা ভীত থাকেন সব সময়। আমি তাঁদের বলছি, সবাই মন্দ নয়। আমি যখন মানসিক চাপে পাগলপ্রায় ছিলাম, তখন কেউ আমাকে আঘাত করেনি। খারাপ ব্যবহার করে দূরে ঠেলে দেয়নি। সুতরাং নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য প্রচুর মানুষ এখনো আছেন চারপাশে। আমরা অনেকেই এখন বুঝতে পারি, অসহায় মানুষগুলোকে শুরুতেই নিরাময়কেন্দ্রে পাঠিয়ে সমাজছাড়া না করে বরং ভালোবাসা দিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা যায়। ৩০ বছর আগে মানসিক রোগে আক্রান্ত এক নারীর কথা আমার এখনো মনে পড়ে। নিজের প্রথম সন্তান জন্মের পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে

পড়েন। যদি তাঁকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হতো এবং মানসিক টানাপোড়েন থেকে উতরে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করা হতো, তবে তিনি সুস্থই থাকতেন। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো জীবনটাকে উপভোগ করতে পারতেন। ক্লান্ত হলে আয়োজন করতেন ঘুমানোর, খেতে পারতেন পছন্দমতো খাবার। যখন কিনা মানসিক সুস্থতার জন্য তাঁর প্রয়োজন একটু নির্জনতা, তখনই তাঁকে নিরাময়কেন্দ্রের ছোট্ট একটু জায়গায় চারজনের সঙ্গে থেকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এখানে না আছে পর্যাপ্ত জায়গা, না আছে নির্জনতা, না আছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আশ্বাস।

সমাজ থেকে আলাদা হওয়ার পর এই নারীর জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি আবার ফেরত এসেছেন নিজবাড়িতে। আপন মানুষ ও চেনা পরিবেশে থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন কিছুটা। ফিরে পাচ্ছেন হারানো দক্ষতা। তার পরও নিজের পুরোনো জীবনের আনন্দ তিনি তো আর কখনোই ফিরে পাবেন না, কখনো না।

সম্প্রতি জানা গেছে, সুস্থ হয়ে ওঠা মানসিক রোগীদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাঁরা সহজেই সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে সক্ষম। আজ তাই অনেকেই বুঝতে পারছেন, সঠিকভাবে যত্ন করা হলে রোগীদের এমন বেহালদশা হতো না। অল্প কিছু কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য সবার সঙ্গে একই রকম আচরণ করা হচ্ছে। বঞ্চিত করা হচ্ছে সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে। কিছু মানুষের অসচেতনতা, ভয় ও অবহেলার কারণে অসুস্থ মানুষ সব সময়ের জন্যই সমাজ থেকে আলাদা থাকছেন। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। বেঁচে থাকতে হচ্ছে অবহেলা আর মানুষের ঘৃণা নিয়ে।

যাঁরা সাহস নিয়ে আসেন সমাজে বাস করতে, তাঁদের সবাইকে সমানভাবে সাহায্য করা হচ্ছে না। এটা কি খুব কঠিন কাজ? চিকিৎসক, সেবিকা থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ যদি সাহায্য করার মনমানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেন, তবেই তো

www.facebook.com/tanbir.ebooks
আর কোনো সমস্যা থাকে না। রোগীদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করা যায়। এক এক করে সবাই এগিয়ে এলে কাজটাও সহজ হয়ে যাবে। অতি দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলা যাবে চারপাশের পরিবেশ।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে তাঁদের সাহায্য করা যায়। আমরা কি শুরুতেই তাঁদের ভেতরকার ভয় দূর করব, নাকি নাগরিক হিসেবে তাঁদের পাওনা অধিকারগুলো আদায় করে দেওয়ার চেষ্টা করব, যে লিখতে-পড়তে পারেন না, তাঁকে শিখতে সাহায্য করব। আসলে এ সবকিছু করার আগে প্রয়োজন রোগীদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া। নিয়মিত যত্ন এবং সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এটা সহজেই উপলব্ধি করা গেছে, তাঁদের খুব সহজেই ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে বদলে দেওয়া যায়। অনেক সময় সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে সাহস দিয়ে কাছের আপন মানুষটি যা করতে পারেন, চিকিৎসকও তা পারেন না। ব্যস্ততার কারণে একজন চিকিৎসকের সব রোগীর প্রতি সমানভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। কাছের মানুষের উচিত, রোগীদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। তাঁরা যাতে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখা। তাঁদের সফলতায় আনন্দিত হওয়া এবং ব্যর্থতায় কষ্ট পাওয়া। ধীরে ধীরে সবকিছু নিয়ে সহজভাবে কথা বলতে পারলেই সমাজে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের পথ আরও সুগম হবে।

আমি যেখানেই যাই, চেষ্টা করি সেসব মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে, যাঁরা নানা উপায়ে মানুষের জীবনকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন। জীবনযাপনের পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলেন। স্বেচ্ছাসেবক থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যদি সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, তবে জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বয়সের ব্যবধান এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের সমাজে একটি জিনিসের কমতি অনুভব করা যায়। আর এটা হলো বিশ্বাস।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস না থাকলে কোনো কাজেই সফলতা আসবে না। মানুষের মধ্যে হতাশা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। আধুনিক সমাজের জটিলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন সবাই। সব সময় তাঁরা মনে করেন, কিছু না কিছু একটা সমস্যা লেগে আছে তাঁদের সঙ্গে।

আমাদের সবারই যত্ন প্রয়োজন। এটা আমাদের অধিকার। শুধু নিজের জীবনের কথা ভেবে অনেকেই স্বার্থপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা ভুলে যান সমাজের প্রতি তাঁদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে। একটি সমাজের সবাই যদি আলাদাভাবে নিজেদের দায়িত্বগুলো নিয়ে সচেতন হয়ে উঠত, তবে কোনো সমস্যাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে একই জায়গায় বসবাস করা প্রতিবেশীরাও আজকাল আমাদের কাছে অচেনা থাকে। পথে কখনো দেখা হলে কুশল বিনিময়ের প্রয়োজনবোধও আমরা করি না।

একজন একজন করেই গড়ে ওঠে পুরো সমাজ। এ সমাজ আমাদের। তাই সবারই কম-বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিজেদের কাজগুলো করলে শুধু সমাজই নয়, আমাদের জীবনটাও সুন্দর হয়ে উঠবে। সমাজের সুস্থতার জন্যই সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা উচিত। পানি ছাড়া যেমন গাছ বেড়ে উঠতে পারে না, সবার সহযোগিতা ছাড়াও তেমনি সমাজকে জঞ্জালমুক্ত করা যাবে না।

একসঙ্গে কাজ করলেই অসহায় লোকদের সাহায্য করার নতুন নতুন উপায় বের হবে। আমরা বুঝতে পারব চারপাশের মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা সমস্যাগুলোকে। নিজেদের পরিবারকে পরিপূর্ণ সমর্থন দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সব জিনিস সরবরাহ করে সব অসন্তোষ দূর করা যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে নিজের পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের মানুষের জন্যও কাজ করে যেতে হবে।

সবারই উচিত নিজেদের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখগুলো ভাগাভাগি করা। সমাজের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু করে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

দেখানোর আছে। এটা কখনোই অস্বীকার করার উপায় নেই।
পরিবর্তন আমরা পছন্দ করি না। কোনো কিছু বদলে দিতে আমরা ভয় পাই। ঝুঁকি না নিলে কোনো কাজেই সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শুরু করতে হবে এখনই। কোনো বিপদ কিংবা পুরস্কৃত হওয়ার কথা না ভেবে সবার জন্য বিলিয়ে দিতে হবে নিজেকে। আজ যদি আপনি অন্যের বিপদে এগিয়ে আসেন, তবে দেখবেন ঠিক ঠিক কেউ একজন আপনার বিপদেও পাশে এসে দাঁড়াবেন। বাড়িয়ে দেবেন সাহায্যের হাত। তাই আর দেরি কেন। সমাজটাকে সুন্দর করে তোলার জন্য কাজে নেমে পড়ুন এখনই। (১৭ নভেম্বর ১৯৯৩)
ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, সংক্ষেপিত ভাষান্তর: কিঙ্কর আহ্সান

মিশেল ব্যাশেলে('ইউএন উইমেন'-এর নির্বাহী পরিচালক)



জাতিসংঘের নারীবিষয়ক অঙ্গ সংগঠন 'ইউএন উইমেন'-এর নির্বাহী পরিচালক মিশেল ব্যাশেলের জন্ম ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে। তিনি মার্চ ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১০ সাল পর্যন্ত চিলির রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ২৪ মে ফ্রান্সের প্যারিসে এই বক্তব্য দেন।শুভ সকাল।
শিক্ষাজীবনের সমাবর্তনের এই দিন আমাদের দুটি দিক চিহ্নিত করে দেয়। আজকে তোমরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সর্বশেষ ধাপ অতিক্রম করে ডিগ্রি অর্জন করেত যাচ্ছ। আজকের দিন কিন্তু তোমাদের আগামী দিনের সূচনা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমিও কিন্তু তোমাদের মতোই

একদিন এই রকম বিশেষ দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।
এই পৃথিবীতে আমি ও তোমরা এক পরিবর্তিত সময়ের মধ্যে বাস করছি। সময় এখন আগের থেকেও দ্রুত চলে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাড়া দিতে গিয়ে আমরা বেশ হিমশিম খাই। এখনই সময়, তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার। এখনকার সময়ে অনিশ্চয়তাই হলো নিশ্চয়তা। সময় একই সঙ্গে তোমাকে সুযোগ করে দেয় আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
আমরা সমস্যার জালে আটকে আছি। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত আমাদের বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অক্ষমতা, দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি এসব সমস্যা আলোচনায়। কিন্তু বিপরীতভাবে বলা যায়, এসব সমস্যার জন্যই কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। সত্যি করে বলতে গেলে, সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেই সমাধান পাওয়া যায়। আমি বাস্তববাদী এবং তোমাদের নিয়ে আশাবাদী। আমি মানুষের সৃজনশীলতা, শক্তি এবং ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করি। তোমাদের বলতে চাই, পৃথিবীতে এখনো অনেক বড় উদ্যোগ বিকাশ লাভ করেনি।
তোমরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করো না। রাস্তায় নেমে সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু করে দাও।
বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এখন বিশ্বে চাকরির বাজারে ধাক্কা দিয়েছে। তরুণেরাই কিন্তু এই ধাক্কার শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই সমস্যা সমাধানে আমাদের যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজতে হবে, যে নেতৃত্ব এই সমস্যা সমাধানে মাথা তুলে দাঁড়াবে। স্বল্পপরিসরে সুযোগ সৃষ্টি না করে আগামী দিনের জন্য বৈষম্যহীনতার পথ তৈরি করা একজন নেতার কাজ। এটা বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। কিন্তু মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেয়ে মহৎ কাজ আর একটিও নেই।
এই কাজ বাস্তবায়নে আমি তোমাদের সাতটি পরামর্শ দিতে চাই। সাত সংখ্যাটিকে কিন্তু অনেকেই সৌভাগ্যের সংখ্যা মানে। এক সপ্তাহে দিনের সংখ্যা সাত, আমাদের বাস সাত

www.facebook.com/tanbir.ebooks
মহাদেশে সাত মহাসাগরের পাড়ে। গণিতবিদ পিথাগোরাস পারফেক্ট সংখ্যা বলতেন তিন ও চারকে। কারণ, ত্রিভুজের বাহু তিন, চতুর্ভুজের চার।

আমার প্রথম পরামর্শ হলো, তোমাদের সাধারণ মানুষের কথা শুনতে হবে, তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে। সাধারণ মানুষের কথা শোনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে। তোমাকে ঘরে আটকে থাকলে চলবে না। আমার দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, আগের মতো প্রাসাদে না থেকে তোমাকে এখন প্রকাশ্যে আসতে হবে। সবকিছুতে তোমার অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নেতা হতে হলে তোমাকে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমাকে সর্বজনীন গুণাবলি অর্জন করতে হবে। মানুষের কী প্রয়োজন তা জানতে হবে। নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতে হবে। আমার চতুর্থ পরামর্শ হবে, সমাজের নানা শ্রেণীর, নানা বর্ণের, নানা ভাষার মানুষ সম্পর্কে তোমার জানাশোনা থাকতে হবে। কাদের কী সমস্যা, তা তোমার জানতে হবে।

তোমাকে সত্যিকারের নেতা হতে হলে সামাজিক মূল্যবোধ ও মানুষকে বুঝতে হবে। এ জন্য তোমাকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নীতি হিসেবে মানবিকতা, নিজের ও অন্যের ওপর আস্থা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

আমি আমার জীবনজুড়ে সাধারণ মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমি আমার দেশ চিলিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনে কাজ করতাম। তারপরে কাজ করেছি সমতা ও ন্যায়বিচার নিয়ে। সেই ধারাবাহিকতায় আমি এখন 'ইউএন উইমেন'-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে নারীদের জন্য কাজ করছি। আমার কাছে নেতৃত্ব হলো এক রোমাঞ্চকর মহাযাত্রা, যেখানে তোমাকে সব সময় সামনের দিকে তাকাতে হবে। তোমরা যেখানেই যাও, সব সময় তুমি তোমার মন যা চায় তা-ই করবে। ক্ষুদ্র জীবনকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাও।

সূত্র: www.unwomen.org, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: জাহিদ হোসাইন খান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

রোজা পার্কস(রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও বর্ণবাদের)

সবার অধিকার সমান



আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে রোজা পার্কসের অবদান বিশ্বজুড়ে তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৯১৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়া আফ্রো-আমেরিকান এই মানবাধিকারকর্মী মৃত্যুবরণ করেন ২৪ অক্টোবর ২০০৫ সালে

আমার শৈশব কেটেছে অনেক কিছু সহ্য করার মধ্য দিয়ে। আমার মা ও তাঁর পরিবার আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার মা ছিলেন ছোট্ট একটি স্কুলের শিক্ষক, যিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে। বর্ণবাদ ও বৈষম্যমূলক আইনগত বিভিন্ন বাধা-নিষেধের মধ্য দিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে—সেটা তিনি কখনোই সমর্থন করতেন না। মায়ের সেই ছোট্ট স্কুলে বছরের নয় মাসের জায়গায় ক্লাস হতো পাঁচ মাস। কিন্তু আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে সে দিনগুলো। বই পড়ার প্রতি আমার নেশা ছিল প্রবল। মা-ও অবশ্য স্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই বই পড়ার এমন আসক্তিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন।

আমি গ্রেপ্তার হই ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর। সামনের দিকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত স্থান ছেড়ে না দেওয়ার জন্য। যদিও অনেকে লিখেছে এবং জানিয়েছিল যে আমি ওই দিন বাসের সামনের আসনে বসে ছিলাম, কিন্তু সেটা আসলে ঠিক না। সেদিন আমি বাসের শেষপ্রান্তে একটি সিট নিয়ে বসেছিলাম, যেখানে কিছু শ্বেতাঙ্গও ছিল। সামনের দুই-তিন স্টপেজে কোনো ঝামেলা হয়নি। ঝামেলাটা হলো যখন তৃতীয় স্টপেজ থেকে বেশ কজন শ্বেতাঙ্গ বাসে উঠল। কেউ কেউ বসার জায়গা পেল আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল। বাস ড্রাইভার যখন সেটা লক্ষ করে, সে আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে বলল। তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ কিছু দ্বিধায় পড়ে উঠে দাঁড়াল। বাস ড্রাইভার তখন জানতে চাইল, আমি কেন

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দাঁড়াচ্ছি না, এর ফলে আমি কিন্তু গ্রেপ্তারও হতে পারি। আমি বলেছিলাম, আমি দাঁড়াব না এবং শেষ অবধি আমাকে গ্রেপ্তার করাও হয়।
বাস ড্রাইভার সোজা বাস থেকে নেমে পুলিশকে জানাল। কিছু কৃষ্ণাঙ্গও আমার সঙ্গে বাস থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু কোনো শ্বেতাঙ্গ সেদিন এগিয়ে আসেনি। দুজন পুলিশ ঘটনার সত্যতার পাশাপাশি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন আমি উঠে দাঁড়াইনি। আমি বলেছিলাম, আমার মনে হয়নি যে আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, কেনই বা আমাকে বাধ্য করা হবে? তারা জানাল, আইন আইনই এবং তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। বাস ড্রাইভার তার দায়িত্ব পালন করে, দিন শেষে আমার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করে গেল।
আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম বৃহস্পতিবার বিকেলে। শুক্রবার বিকেলে ডেক্সটর এভিনিউ ব্যাপটিস্ট চার্চে একটি সভা আহ্বান করা হয়, সেখানে ড. মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) ছিলেন একজন যাজক। বেশ কিছু নাগরিক সুধীর কাছে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলি, যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায়। আমার শুনানি ছিল ডিসেম্বর ৫ এবং আমাকে অপরাধী হিসেবেও বিচার শোনানো হয়। ফ্রেড গ্রে ও চার্লস ল্যাংফোর্ড একটি আপিল দায়ের করেন। আমি কিন্তু কোনো জরিমানাও দিইনি। আবারও সভা বসে হোল্ট স্ট্রিট ব্যাপটিস্ট চার্চে। সেদিন মনে হয়, পুরো শহরে অধিকাংশ মানুষ বাসে চড়েনি। এই এক দিনের প্রতিবাদ মোটামুটি স্থির করে দেয়, আমার বিরুদ্ধে চার্জ এবং ভালো কিছুর মধ্য দিয়ে এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে কেউ বাসে উঠবে না।
আমার ঠিক মনে নেই, তখন আমার অনুভূতি কেমন ছিল—রাগ না অন্য কিছু। তবে আমি দৃঢ় ছিলাম, এই সুযোগের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন আমাদের এ ভোগান্তি এবং অধিকারবঞ্চিত হওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সেভাবেই আমরা আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই। গঠন করি মন্টেগোমারি উন্নয়ন অ্যাসোসিয়েশন। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে একাত্ম হন ড. মার্টিন লুথার কিং। পরবর্তী সময়ে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র এবং সভাপতি নির্বাচিত হন।
যখন আমি সেই পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে যাই, আমার অনুতাপ নয়, ভেতরে অসম্ভবভাবে যা আন্দোলিত করে তা হলো, কেন এমন একটি অধিকার প্রতিষ্ঠায় একত্র হতে এত সময় লাগল।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
সবাইকে সমান অধিকার ও সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা কেন এত দীর্ঘ সময় লাগালাম।
বড় হওয়ার পর মন্টেগোমারির বর্ণবৈষম্যবাদ আইনি বিধিনিষেধে আমার জীবন কাটছিল কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমি অনুভব করেছি, একটি স্বাধীন ও বীরের দেশেও আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আমার সেই এক দিনের প্রতিবাদই সবার মধ্যে অধিকার-সচেতনতা তৈরি করেছে। তারা নাগরিক অধিকার আদায়ে পরবর্তী এক বছরে দেশে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আমি সেই দিনগুলোতে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে আনন্দিত, যা মানুষকে স্বাধীনতাবোধ জাগাতে সাহায্য করেছে—যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশেও।
১৯৮৭ সালে স্থাপিত হয় পার্ক ইনস্টিটিউট। এখানে আমরা কাজ করি ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী তরুণদের নিয়ে। আমাদের মূল লক্ষ্য, সবার জন্য স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া, যাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। আমরা তাদের অধিকার-সচেতন করে গড়ে তুলতে চাই। তারা জানবে নিজেদের ইতিহাস ও গৌরবময় আন্দোলনকে এবং জাগিয়ে তুলবে অন্তরাত্মাকে।
তরুণদের জন্য আমার আহ্বান, নিজেদের সব ধরনের পক্ষপাত থেকে ঊর্ধ্বে রাখা। অন্যের জন্য নিবেদিত করে দিতে হবে নিজেদের এবং অবশ্যই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবনকে গড়ে নেওয়ার জন্য সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। আমাদের দিনগুলোতে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। বর্তমানে তরুণদের সুযোগের অভাব নেই, যার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে নিতে হবে তাদেরই। জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, সর্বদা ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে অন্যদের নিয়ে। কখনোই অনুভূতিপ্রবণতায় নেশার প্রতি আশক্ত হওয়া চলবে না। নিজেদের চিন্তাশীল করে তুলতে সময় দাও নিজের মন-মানসিকতাকে।
একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট থেকে পাওয়া, ১৯৯৫ সালের সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখতী সানী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

বারাক ওবামা(যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট)

সব সময় তাগাদা দিতে হবে নিজেকে



অভিনন্দন, ২০১১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা!
তোমরা জানো, প্রেসিডেন্ট হওয়াটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার। শুধু আমার ব্যবহারের জন্য একটা আস্ত বিমান আছে, আমার নিজের জন্য একটা থিম সং আছে! কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা ভালো লাগে, সেটা হলো তোমাদের মতো তরুণদের সঙ্গে এমনভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া। অতএব বুঝতেই পারছ, আমি এখানে এসে নিজেকে কতটা সৌভাগ্যবান মনে করছি আজ। আমরা আজ এখানে দর্শকসারিতে অনেক বড় মাপের অতিথিদের পেয়েছি। টেনেসির গভর্নর বিল হাসলাম রয়েছেন আমাদের মধ্যে। আসুন, সবাই তাঁকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানাই। আমাদের মধ্যে আরও রয়েছেন সিনেটর বব কর্কার, সিনেটর ল্যামার আলেক্সান্ডার এবং সিনেটর স্টিভ কোহেন। এমনকি মেমফিসের নিজের মানুষ সিনেটর হ্যারল্ড ফোর্ড জুনিয়রও রয়েছেন আমাদের মধ্যে। আরও রয়েছেন মেমফিসের মেয়র এ সি হুয়ারটন। তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে।
আজ তোমাদের প্রত্যেককে নিয়ে আমি গর্বিত। কারণ, তোমরা শেষ পর্যন্ত অনেক শ্রম দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছ। এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে তোমাদের শিক্ষকদের। তাঁরা সব সময়

তোমাদের পড়াশোনা করানোকে তাঁদের চাকরির অংশ হিসেবে নয়, বরং নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে চিন্তা করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমাদের পরিবারকে। তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী—সবার অবদান রয়েছে এতে। কারণ, তাঁরা তোমার ওপর আস্থা রেখেছেন।
সমাবর্তন অনুষ্ঠান মানেই হলো আনন্দের উপলক্ষ। কিন্তু আজকের এই সমাবর্তন যেন আরও বেশি আনন্দের। কারণ, আমি জানি, বুকার টি নিয়ে অনেকেই এতটা আশাবাদী ছিলেন না। অনেকেই মনে করত, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের কড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে কখনোই নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে না। কারণ, এই এলাকাটা অনুন্নত, এখানকার রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ভাঙাচোরা। এককথায় এখানকার শিক্ষার্থীরা উন্নত সুযোগ-সুবিধা তেমন পায় না বললেই চলে।
কিন্তু তোমরা প্রমাণ করেছ, তোমাদের প্রত্যেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলেছ, 'ইয়েস, উই ক্যান'। হ্যাঁ, আমরাও পারি। আমরা শিখতে পারি, আমরাও পারি সফল হতে। কোথা থেকে এসেছ, সেটা নয়; বরং কোথায় যেতে চাও, সেটাই যে তোমাদের আসল পরিচয়, তা প্রমাণ করেছ তোমরাই।
এই তো বছর খানেক আগের কথা। এমন একটা সময় ছিল, যখন এই প্রতিষ্ঠানের মাত্র অর্ধেক শিক্ষার্থীই পড়াশোনা শেষ করতে পারত। অনেক কাল ধরেই এই প্রতিষ্ঠানের মাত্র হাতে গোনা গুটিকয় শিক্ষার্থীই পারত পরবর্তী ধাপে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। কিন্তু আজ তোমরা যে সবকিছু বদলে দিয়েছ! এই প্রতিষ্ঠানে যারা নতুন পড়তে আসবে, তাদের সামনে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছ তোমরা। তোমরা এমন একটা ধারা তৈরি করতে পেরেছ, যা কি না পরিশ্রমীদের সাফল্য নিশ্চিত করে। এখানকার প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকেরা আস্থা রেখেছেন। এবং তারই ফলে আজ তোমাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন

করতে পেরেছে সুন্দরভাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদের অনেকেই এখন তাদের নিজের পরিবারের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ।
আমি আজ এখানে এসেছি, কারণ আমি মনে করি, এমন সাফল্য যদি বুকার টি স্কুলের শিক্ষার্থীরা পেতে পারে, তবে সেই সাফল্য মেমফিস এলাকাও অর্জন করতে পারে; এই সাফল্য যদি মেমফিস এলাকায় সম্ভব হয়, তাহলে তা সম্ভব হবে পুরো টেনেসি রাজ্যেও; আর টেনেসি রাজ্য যদি তা পারে, তাহলে পুরো যুক্তরাষ্ট্রও পারবে সফল হতে।
তবে এর জন্য আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি মানুষই তার ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে। আমরা 'রেস টু টপ' প্রকল্প চালু করেছি এ জন্যই, যেন আমরা বুকার টির মতো সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পাওয়া সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সম্মান দিতে পারি।
আজ আমি তোমাদের সামনে এমনি এমনিই এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তা কিন্তু নয়। আজ আমি এখানে তোমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তার কারণ হলো আমার শিক্ষা। আমার যখন বয়স মাত্র দুই বছর, তখন আমার বাবা আমাদের রেখে চলে যান। আমার অসহায় মা আমাকে আর আমার বোনকে নিয়ে অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন সেই সময়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মা, আমার নানা-নানি কখনো ছাড় দেননি আমাকে। সেটা হলো পড়াশোনা। তাঁরা সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকতেন। আমার কোনো অজুহাত দেওয়ার উপায় ছিল না। আমার শিক্ষকেরাও আমার পেছনে অবিরত লেগে থাকতেন পড়াশোনার জন্য। আমার সৌভাগ্য, তাঁরা কখনো আমাকে পড়াশোনার জন্য তাগাদা দেওয়া থামাননি। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল আমার স্ত্রী মিশেলের বেলায়ও। তার মা-বাবাও সব সময় তার পেছনে লেগে থাকতেন পড়াশোনার জন্য।
একটা কথা বলে রাখি, দেশের সাফল্যের জন্য তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ভালো করলেই হবে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
না, তোমাদের সবাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সম্ভব হবে দেশের উন্নতি। শিক্ষার মাধ্যমে তোমরা সব ধরনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় আমরা সব সময় আমাদের শিক্ষকদের প্রশ্ন করতাম, এসব 'আলজেব্রা' শিখে আমাদের কী লাভ? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সত্য যে কর্মজীবনে গিয়ে তোমাদের এক্স অথবা ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে না। কিন্তু এসব অঙ্ক করার মাধ্যমে আসলে তোমাদের মস্তিষ্কের সব জট খুলে যাচ্ছে। এসব গণিতের সমস্যা সমাধান করে তোমরা সব ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন তথ্য, সমস্যা ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে সমাধান করা শিখছ। অঙ্কের শিক্ষকদের বলি, আপনারা আপনাদের শিক্ষার্থীদের বলবেন, প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সবাইকে ভালোভাবে গণিত শিখতে হবে।

তোমাদের সবার নিজের নিজের গল্প আছে। অনেকেই অনেক কষ্ট করে এসেছ। দক্ষিণ মেমফিস অঞ্চল সব সময় ছিল অনুন্নত। এখানকার অধিবাসীরা হাত বাড়ালেই সবকিছু পেয়েছে, এমনটা কখনোই হয়নি। তোমরা যা চেয়েছ, তা চাওয়ামাত্র পেয়েছ, এটাও হয়নি কোনো দিন। কিন্তু এতে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এটা গর্বের ব্যাপার। কারণ, তোমরা যা কিছু পেয়েছ, যত লক্ষ্য অতিক্রম করেছ, যত সাফল্য অর্জন করেছ, যত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ, তার সবই তোমাদের নিজের, একেবারে নিজেদের কৃতিত্ব, নিজেদের পরিশ্রমের ফসল। এসব কারও অনুগ্রহের ফসল নয়।

কিন্তু শিক্ষার্থীরা, একটা কথা মনে রাখবে, আজ তোমাদের যাত্রা শেষ হলো তা নয়, আরও অনেক পথ বাকি রয়েছে। যাত্রা কেবল শুরু হলো। পথের প্রতিটি বাঁকেই নিজেকে ভালো, আরও ভালো করার জন্য তাগাদা দেওয়াটা কখনোই থামাবে না। সামনের দিনগুলোতে তোমরা কতটা সফল হবে, তার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না; কিন্তু একটা কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, চলার পথে অনেক ভুল করবে তোমরা। অনেক কঠিন সময় আসবে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

হয়তো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তোমরা যদি সব সময় নিজেকে তাগাদা দিতে থাকো, তাহলে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে নিজেই। আজ তোমরা যদি এই সংকল্প করো যে সব সময় ভালো কিছু করার জন্য নিজেকে তাগাদা দিতেই থাকবে, তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারি, যে শিক্ষা, ভালোবাসা, সাফল্য তোমরা বুকার টি স্কুল থেকে পেয়েছ, তা দিয়েই সারা বিশ্বে নিজেদের চিহ্ন এঁকে দিতে পারবে তোমরা।

ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ তোমাদের নিজের আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত।

অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভেবো না



যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, ৪ আগস্ট ১৯৬১। সম্প্রতি ৬ নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১২ সালের ১৪ মে বার্নার্ড কলেজের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

উপস্থিত সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ! অভিনন্দন ২০১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা! তোমাদের চারপাশের সবাই আজ তোমাদের নিয়ে গর্বিত। তোমাদের বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, সবাইকে অভিনন্দন!

আমি গ্র্যাজুয়েশন করি ১৯৮৩ সালে। তখন আমাদের আইপড ছিল না, ছিল শুধু ওয়াকম্যান। টাইমস স্কয়ারও আজকের মতো ছিল না। সেসব এখন ইতিহাস। আমি জানি, সমাবর্তন বক্তা ইতিহাসের বুলি কপচানো শুরু করলে তার মতো বিরক্তিকর ব্যাপার আর হয়

না!
তোমাদের জন্য আমার প্রথম উপদেশ, কোনো কাজই দায়সারাভাবে করবে না। কাজ যখন করবেই, দারুণ কিছু একটা করবে। নিজের স্বপ্নের জন্য সংগ্রাম করবে। যদি বড় কিছু হতে চাও, তার জন্য কাজও সেভাবেই করতে হবে। তোমাদের সামনে যে অবারিত সুযোগ আছে, সেগুলোকে ঠিক সময়ে কাজে লাগাতে হবে। শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য নয়, যারা তোমাদের সমান সুযোগ এখনো পায়নি, তাদের উন্নয়নের জন্য তোমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তোমার ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে অন্যের কথায় কান দিয়ো না। জীবন তোমার নিজের হাতে। কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত—নিজেই বুঝে নিতে শেখো। সব সময় নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হবে। তোমার সমস্যা তোমাকেই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, রাস্তায় তোমাকেই নামতে হবে। শুধু বসে বসে কী হচ্ছে দেখলে চলবে না।
যা ঠিক, তাকে জোর গলায় বলতে দ্বিধা কোরো না। অন্য কেউ বলবে, সেই আশায় বসেও থেকো না। হয়তো অন্যরাও একই কথা ভাবছে, হয়তো সবাই তোমার অপেক্ষায় বসে আছে, কে জানে! আর তাই তোমাদের জন্য আমার দ্বিতীয় উপদেশ, নিজেকে কখনো অবমূল্যায়ন কোরো না। তুমি নিজেই সম্ভাবনার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠতে পারো, তখন তোমার সাফল্য আর দশজনকে স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত করবে। নিজের এই বিপুল সম্ভাবনাকে কখনো ছোট করে দেখো না। তোমাদের আমি এক নারীর গল্প বলতে পারি। তার পরিবার এ দেশে অভিবাসী হয়ে এসেছিল। স্কুলে থাকতে তাকে বলা হতো, তার মাথায় যে বুদ্ধি, তাতে কলেজে ভর্তি না হওয়াই শ্রেয়। তার শিক্ষক উপদেশ দিয়েছিলেন, স্কুলের পড়ার পাট চুকিয়ে কোনো একটা কাজে লেগে যেতে। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভীষণ জেদি, সে শিক্ষকের কথা কানে তোলেনি। সে কলেজে ভর্তি হলো। একসময় মাস্টার্স ডিগ্রিও লাভ করল। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচল করল, জিতে গেল। প্রাদেশিক পদের

জন্য লড়াই করল, সেখানেও জিতল। কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিল, সেখানেও না জিতে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত হিলডা সলিস পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে, কাজও করছে। তবে যেখানে-সেখানে নয়, সে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে!

ভেবে দেখো, আজ যখন কোনো ছোট্ট লাতিন মেয়ে দেখছে তার মতোই আরেকজন মেয়ে দেশের মন্ত্রী হতে পেরেছে, তখন সে কতটা উৎসাহিত বোধ করে! একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী যখন দেখে তার মতো কেউ জাতিসংঘের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার স্বপ্ন কতটা বদলে যায়! তুমি জানোও না, নিজের অজান্তেই এই পৃথিবীতে তুমি কত কিছু বদলে দিতে পারো। নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভেবো না, নিজের সম্ভাবনার অমর্যাদা কোরো না। নিজেকে দশজনের জন্য রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমি আজ যেখানে এসেছ, সেখানে আসতে অন্যদের উৎসাহিত করো, সহযোগিতা করো। একজন মেয়ে যত দিন না নিজেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার কিংবা সামরিক কমান্ডার হিসেবে কল্পনা করবে না, তত দিন সে তা হতেও পারবে না। আশপাশের নারীরা যত দিন তাকে না জানাবে যে বাহ্যিক সৌন্দর্য কিংবা ফ্যাশন ছাড়াও চিন্তাভাবনার অনেক কিছু আছে—নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে—তত দিন পর্যন্ত সে হয়তো ভাববে সৌন্দর্যের মধ্যেই তার জগৎ সীমাবদ্ধ। তোমরা নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করো এবং নিজেদের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাও।

আমার শেষ উপদেশ হলো, ধৈর্য ধরো। শুনতে খুবই সহজ আর সাদামাটা মনে হচ্ছে, কিন্তু এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ভালো জিনিসই সহজে পাওয়া যায় না। এমন কোনো সফল মানুষ পাবে না, যে ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। বরং তার উল্টোটাই হতে দেখা যায় সব সময়। তারা মারাত্মক সব ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। তারা ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা

কখনো হাল ছেড়ে দেয় না।
তোমাদের বয়সে আমার পকেটে টাকা বলতে গেলে ছিলই না, সামনে এত সুযোগও ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি নিজের স্থান খুঁজে ফিরছিলাম। আমি চাইতাম বড় কিছু করতে, চারপাশকে বদলে দিতে। কিন্তু কীভাবে তা করব, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না আমার। গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাকে এই নিউইয়র্কে অনেক ছোটখাটো কাজ করে জীবন চালাতে হয়েছে। তবু আমি ভুলে যাইনি আসলে কী করতে চেয়েছিলাম।
অসীম ধৈর্য আমার জন্মগত কোনো গুণ নয়। আমি ধৈর্য ধরতে শিখেছি। শৈশবে যে নারীরা আমাকে লালনপালন করেছিলেন, তাঁদের দেখে আমি শিখেছি ধৈর্য কী জিনিস। আমার মা কী সংগ্রাম করে একই সঙ্গে পড়াশোনা, চাকরি আর আমাকে সামলেছেন, তা আমি দেখেছি। অসম্ভব অর্থকষ্ট, তার ওপর ভেঙে যাওয়া সংসার। কিন্তু তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। খুব ভোরে মা আমাকে ডেকে তুলতেন ইংরেজি পড়ার জন্য। আমার বিরক্তির সীমা ছাড়িয়ে যেত। অভিযোগ করলে মা বলতেন, 'এটা আমার জন্যও পিকনিক নয়, গাধা কোথাকার!' পরে আমি আমার নানির কাছে বেড়ে উঠি। তিনি হাইস্কুলের পর আর পড়তে পারেননি। একটা স্থানীয় ব্যাংকে কাজ করতেন নানি। যেসব পুরুষকে তিনি একসময় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাঁর চোখের সামনে তারা পদোন্নতি পেয়ে ওপরে উঠে যেত। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে কাজ করে গেছেন। একসময় তিনি সেই ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। না, তিনিও হার মানেননি।
পরে আমার সঙ্গে এক নারীর দেখা হয়, যাঁর দায়িত্ব ছিল আমার চাকরির ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। তিনি আমাকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বিয়েই করে ফেলি! বিয়ের পর ক্যারিয়ার আর সংসার একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে মিশেল ও আমি দুজনেই দারুণ হিমশিম খেয়েছি। আমাদের ধৈর্য ছিল বলেই সেই কঠিন সময়গুলোতে সংসার টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। মিশেলের বাবা-মা শত

প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শের গুণেই আজ মিশেল এত কিছু সামলে নিতে পেরেছে, আমার জীবনের ওঠানামার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

এই মানুষেরাই আমার সব অনুপ্রেরণার উৎস। যাদের কথা কখনো খবরে আসে না, যারা দেশের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে, কেউ চেনেও না তাদের। তারা শুধু নিজের দায়িত্ব নিঃশব্দে পালন করে যায়, বিপদের সামনে শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, কোনো কিছুতেই তারা হার মানে না। আমি আজ তাদের জন্যই এতদূর আসতে পেরেছি। তারা নিজেরা পৃথিবী বদলানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেনি, কিন্তু তারা আছে বলেই পৃথিবীটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, যাবে।

মনে রেখো, এই পৃথিবীতে নিজের চিহ্ন রেখে যাওয়া সোজা নয়। এর জন্য ধৈর্য ধরতে হয়, প্রতিজ্ঞা থাকতে হয়। হেসেখেলে সফল হওয়া যায় না। সাফল্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তুমি যদি সংগ্রাম করে নিজের জায়গা করে নিতে পিছপা না হও, দশজনের সামনে নিজেকে দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারো আর যত বাধা আসুক না কেন হাল ছেড়ে না দিয়ে লেগে থাকতে জানো, তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, শুধু তুমিই সফল হবে না, তোমাকে দেখে আরও অনেকে সফল হতে শিখবে। তোমাদের সাফল্যে গোটা জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত

অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার।



শিক্ষা সবকিছু বদলে দেয়: ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ৫০-এ পা দিলেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের হনুলুলুতে তাঁর জন্ম। তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন এবং হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। ওবামা ২০০৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২০১০ সালের ৯ মে হ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

আমরা আজ মিলিত হয়েছি স্নাতকদের জন্য, যাদের দিকে পুরো জাতি তাকিয়ে আছে। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়কে জানি, সেখানে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন ছিল একসময়। একটি ইউনিয়ন ছিল ২০ জনের। সেই ২০ জন প্রথম মিলিত হয়েছিল ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬১ সালে। তারা স্বাধীন নাগরিকতার জন্য কথা বলেছিল; তারা সেদিন থেকে কাজ শুরু করেছিল। আশপাশে থেকে যেসব দাস নিলামে বিক্রির জন্য আনা হয়েছিল, তারা তাদের মুক্ত করেছিল।

এ ধরনের গল্প তোমাদের অনেকের কাছেই অনেকটা অজানা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জানা উচিত কেন এমন ধরনের ঘটনা ঘটত, কেন এত মানুষ এমন ভাগ্যের শিকার হয়েছিল। কোথায় আমাদের ঘাটতি ছিল—ইচ্ছাতে, নাকি মানসিকতায়।

গৃহযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে স্কুলের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল হ্যাম্পটনের মতো, কৃষকদের ও শিল্পকারখানায় কর্মরত কর্মচারীদের জন্য। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সচেতনতা বাড়ানোর জন্য—কীভাবে শিল্পসমৃদ্ধ জাতি হওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে এসব স্কুলকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা হয় শিক্ষার পরিবেশ সহজলভ্য করতে। পরবর্তীকালে আমরা বহু স্থানে অনেক জায়গাজুড়ে শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করি, যাতে আমাদের স্নাতকেরা সহজে বিশ্বের হালচাল জানতে ও বুঝতে পারে।

শিক্ষা প্রতিমুহূর্তে আমাদের শিক্ষা দেয় কীভাবে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায়। এবং এটার চেয়ে বড় কোনো সত্য এখন আর নেই। তোমরা এমন সময়ে স্নাতক হচ্ছো যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বে

কঠিন সময় চলছে। তোমরা এমন এক চাকরির বাজারে প্রবেশ করছ, যেখানে শুধু তোমাদের নিজেদের মধ্যে নয়, প্রতিযোগিতা রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

ইতিমধ্যে তোমরা এমন এক পরিবেশে প্রবেশ করেছ, যেখানে প্রতিটি মিনিটই হিসাব করা হয়। পরিবেশগতভাবে, মিডিয়া, প্রযুক্তি—সব দিকেই চলছে প্রতিযোগিতা আর প্রতিযোগিতা, যে প্রতিযোগিতা যুক্তি বিশ্বাস করে। এসব কিছু তোমাদের শুধু নতুন চাপের মধ্যে ফেলছে তা নয়, পুরো জাতি, পুরো জাতির ভবিষ্যতের ওপরও চাপ ফেলছে। এটা হলো বিস্ময়কর পরিবর্তন, আমাদের পেছনের কিছু ইতিহাসের মতো। আমরা এ পরিবর্তন বন্ধ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এর সঙ্গে মেনে চলতে পারি। শিক্ষাই এই মেনে চলা শেখায়, শেখাবে। শিক্ষা তোমাদের শক্তিশালী করতে পারে, যা নিকট প্রজন্মকে করেছিল কীভাবে নিজের সময়ে টিকে থাকতে হয়।

প্রথম এবং সর্বশেষ হলো, তোমার শিক্ষা তোমাকে শিক্ষার মাধ্যমে শক্তিশালী করবে—কীভাবে একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিকে মোকাবিলা করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মূল কিছু শিক্ষা পাওয়া গিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে হাইস্কুল ডিপ্লোমা ছিল মধ্যবিত্ত জীবনের টিকিটস্বরূপ। সেটা খুব দীর্ঘ সময় ছিল।

চাকরির জন্য আজকাল ব্যাচেলর ডিগ্রি ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে বেকারত্বের হার এখন সবচেয়ে বেশি তাদের মধ্যে, যারা শুধু স্কুলজীবন অথবা কলেজজীবনে লেখাপড়া শেষ করেছে। তোমরা ভালো একটা ট্র্যাকে বের হয়ে যাচ্ছ, তবে তোমার ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা নির্ভর করবে তোমার ওপর।

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেরা এখন মোটামুটি ভালো করছে। তোমার কৃষ্ণাঙ্গ সহপাঠী তোমার সঙ্গেই বের হচ্ছে। সে নিজের যোগ্যতায় তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যার যার কাজের ফল সে সে পাবে। সুতরাং, গায়ের রং কোনো বিষয় নয়।

আমাদের সবারই একটা দায়িত্ব আছে, বিশেষ

www.facebook.com/tanbir.ebooks
করে একজন মার্কিন নাগরিকের। দেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে, যাতে তারা তাদের প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু, তার পরও আলাদাভাবে সবারই কিছু না কিছু দায়িত্ব থাকতে হবে, যাতে তোমার বোন বা তোমার ভাই তোমাকে আদর্শ ভেবে অনুসরণ করতে পারে।বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেকে উপযুক্ত করার প্রথম শর্ত হলো, তোমাকে শিক্ষিত হতে হবে। কিন্তু তোমাকে একজন নাগরিক হিসেবেও উপযুক্ত হতে হবে। তোমাকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমরা যেহেতু স্নাতক হয়ে যাচ্ছ, সুতরাং তোমাদের শিক্ষা তোমাদের গবেষণার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং প্রাত্যহিক বিশ্ব সম্পর্কে কিছু না কিছু হলেও শিখিয়েছে; তোমাকে বুঝিয়েছে তুমি কী পারো, কী করতে পারবে, কতটুকু তোমার ক্ষমতা, কতখানি তোমার ধৈর্য।

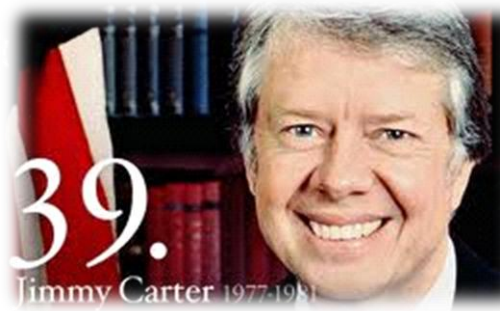
কিন্তু তোমার লক্ষ্য তোমাকে সব সময় শিক্ষা দিয়েছে আরও বেশি কিছু করার। পুরো চার বছর তুমি যুক্তিতর্ক করেছ—বিতর্কের দুই পাশ থেকেই। তুমি উপন্যাস পড়েছ, ইতিহাসবিষয়ক বই পড়েছ জীবনে একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে। তুমি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছ যে তুমি কী পছন্দ করো আর কী করো না, তোমার বন্ধু বা তোমার সহপাঠীর সঙ্গে কোথায় তোমার পার্থক্য, কোথায় তুমি তাদের চেয়ে এগিয়ে আছো, যা তুমি এর আগে কখনোই করতে পারোনি। সুতরাং, একটি শিক্ষাই পারে আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে তোমাকে উপযুক্ত করতে, সুনাগরিক হতে এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে।

সেই সঙ্গে তোমার মধ্যে থাকতে হবে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি মমত্ববোধ। তুমি যা-ই করো না কেন, করার আগে শুধু ভাববে তুমি দেশের একজন প্রতিনিধি, দেশের প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে। দেখবে সেই কাজটির বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তোমার মধ্যে আপনা-আপনিই চলে এসেছে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

জিমি কার্টার(যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট)

ব্যর্থতার পরই সাফল্য



জিমি কার্টার। জন্ম ১৯২৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া শহরে। যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত। ক্ষমতায় থাকাকালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও পানামা চুক্তি স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, রোগ নির্মূল প্রকল্পসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ২০০২ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।
আর অন্য সবার মতো ছোটবেলায় আমিও খুব শুনতাম, 'বড় হয়ে কী হতে চাও।' আমি বলতাম, আমি নেভাল একাডেমিতে যেতে চাই, আর চাই ভালো উচ্চতর শিক্ষা। তারপর যোগ দেব যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে। আমার পরিবার বংশানুক্রমে প্রায় ৩৫০ বছর ধরে কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। কৃষির সঙ্গেই তাদের জীবন-জীবিকা, আর সে জন্য কেউই মাধ্যমিক পড়াশোনার পাট চুকাতে পারেনি। তাই আমার এমন চাওয়াটা যেন ঠিক একটি অবাস্তব স্বপ্ন, তার ওপর ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় শিক্ষাই যেন এক ভয়ংকর বিলাসিতা, তবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর দুর্নিবার ইচ্ছাই তো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আমরাও এগিয়ে যাই।
আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আমার বাবা এবং তাঁর অনুপ্রেরণা। ছোট একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামে থেকেও তিনি নানাভাবে সব ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত থাকতেন। তিনি রক্ষণশীল মানসিকতার ছিলেন;

www.facebook.com/tanbir.ebooks
তবু তাঁর জীবন সম্পর্কে দর্শনবাদ আমাকে প্রভাবিত করত। বর্ণবাদ নিয়ে বাবার রক্ষণশীলতার পুরোদস্তুর বিরোধী ছিলেন আমার মা; বাবা অবশ্য মাকে কখনো এ বিষয়ে জোর করতেন না। মা ছিলেন একজন সেবিকা; দরিদ্র মানুষকে অক্লান্ত সেবা দিয়ে যেতেন। তাই তাঁর কাছে বর্ণ-ধর্ম বলে কোনো বিভেদ ছিল না। প্রতিটি স্থানে বাবা-মায়ের অবিচল শ্রদ্ধাবোধ আমার নীতিকে বলিষ্ঠ করেছে।

আমি দাঁড়াতে চাই সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে। তাদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে চাই। জীবনের নানা ঘটনাবহুল মোড় আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। সফলতা আমাকে জুগিয়েছে আত্মবিশ্বাস আর বিফলতা, ব্যর্থতা আমাকে এনে দিয়েছে দৃঢ় হওয়ার প্রেরণা, এগিয়ে যাওয়ার পথ।

বর্ণবাদকে আমি উপলব্ধি করেছি একজন শিশু, তরুণ এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে। দেখেছি, বর্ণবাদ কীভাবে নারী ও শিশুদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষ সবকিছুতেই চরম মূল্য দিতে হয় তাদের। সময় বদলেছে, কিন্তু এসব বিদ্বেষের সংঘর্ষ ও সহিংসতা বদলায়নি। কখনো ধর্ম, কখনো বর্ণবাদ আর কখনো জাতিগত বিদ্বেষকে ব্যবহার করে সহিংসতা আমাদের মানবতাকে কলঙ্কের দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

কখনো কখনো জীবনে নাটকীয় মোড় আসে। আমাদের জন্য কখনো কঠিন হয়ে যায় মেনে নেওয়াটা। সেগুলো জীবনকে দুটি পথ দেখায়—এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে যাওয়ার। মার্কিন নৌবাহিনী ছেড়ে দেওয়ার পর আমি শহর ছেড়ে চলে যাই।

আমার সারা জীবনের দায়বদ্ধতা পেছনে ফেলে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। আমার স্ত্রীও আমাকে প্রায় ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। কারণ, সে বুঝতে পারছিল যে আমি জীবনকে বিস্তৃত করছি না, ক্রমেই একে সংকীর্ণ ও জটিল বানিয়ে ফেলছি। তবু সবকিছু যখন মনে হয়েছিল যে শেষ হয়ে গেছে, সেই শূন্য থেকেই আমি আবার আত্মবিশ্বাসকে চাঙা করে নিয়েছি, বদলে গিয়েছি জীবনকে বোঝার দর্শন।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

১৯৬৬ সালে জর্জিয়ার গভর্নর পদে নির্বাচন করে হেরে যাই। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম একটি ধাক্কা। আর বাকি সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। জীবনে কখনো ব্যর্থ হব ভাবিনি। কারণ, সব সময়ই পরিশ্রম আর অধ্যবসায় আমাকে সফলতা এনে দিয়েছে। তাই এটি ছিল আমার জন্য বড় একটি আঘাত। গ্রামের লম্বা পথ ধরে যেতে যেতে আমার বোন বুথ স্ট্যাপেনটন আমাকে বলেছিল, 'জিমি, কখনো কখনো তুমি স্বভাবতই তোমার অহংকার ও সম্মানকে আঘাত করতে পারো কোনো চরম ব্যর্থতার দ্বারা। তখন তুমি কী করবে—সবকিছু ছেড়ে দেবে, না ঈশ্বর যেভাবে তোমাকে দেখাতে চান, সেভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করবে?' আমি বললাম, আমি নির্বাচনে হেরে গিয়েছি আমার নিজের অঞ্চল থেকে। আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ। আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি ভুল ছিলাম। পরিশ্রম, সততা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য ও বিচক্ষণতাও প্রয়োজন; ব্যর্থতা হলো সফলতার পথে যাওয়ার প্রথম ধাপ। ব্যর্থতাই আমাকে আরও সফল হওয়ার পথে নিয়ে যায়। ১৯৮০ সালে আমি আবারও হেরে গিয়েছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক পদ—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর। আমি নিজেকে অনেক ঋণগ্রস্ত হিসেবে আবিষ্কার করলাম। মনে হতো, সবকিছু বিক্রি করে দিতে হবে। আমি শেষ হয়ে যাব। কিন্তু এ বিপর্যয়ই আমাকে জীবনে বেঁচে থাকার তত্ত্বকে বদলে দিয়েছে। ব্যর্থতা তো আসবেই। কিন্তু ব্যর্থতাই আবার তোমাকে নিয়ে যাবে সফলতার চূড়ায়। তাই তুমি কী করবে—থেমে যাবে, না এগিয়ে যাবে সামনে?

সফলতার সঙ্গে অনেক সমালোচনা এবং জটিলতাও এসে হাজির হয়। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছিল আমার জীবনে একটি চ্যালেঞ্জ। আমাদের কাছে মিসর ও ইসরায়েল—এই দুটি দেশের সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা ছিল। তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে আলাদাভাবে। কখনো এগিয়ে, কখনো পিছপা হয়ে কথা চালিয়ে যেতে হয়েছে। আমরা কথা বলেছি মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবাননের

www.facebook.com/tanbir.ebooks
নেতাদের সঙ্গেও; ইসরায়েল, ফিলিস্তিন কিংবা জর্ডানের বিশাল জনগোষ্ঠী শান্তি প্রত্যাশা করছিল। ঈশ্বর জানেন, শান্তি তাদের জন্য কী পরিমাণ আকাঙ্ক্ষিত!

প্রেসিডেন্ট পদটি অনেক দায়িত্বের, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পরিস্থিতি সময়ের সঙ্গে বদলে যায়। কিন্তু আমাদের সম্পাদিত কাজ থেকেই যায়। আমরা যা বলি, তা অমলিন থেকে যায়; তখনই সেগুলো জটিল হয়ে আমাদের বাধা তৈরি করে, বিতর্ক সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট পদটি আমাকে মানুষকে জানা ও বোঝার সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আমি প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের দুটি দেশ ভ্রমণ করি, তার আগে আমি জানতাম না মানুষ কতটা অসহায়ভাবে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে চলে। আজও দেখছি, দারিদ্র্য মানুষকে কতটা বিপর্যস্ত করে। এটিই আমাদের পৃথিবীতে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

পৃথিবীতে কোথাও জীবন সুন্দর, কোথায় জীবন ব্যাহত, বেদনার। সামর্থ্যবানকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের একাত্ম করতে হবে। যদি তুমি কোনো নীতি বা দর্শনবাদ আঁকড়ে ধরে বসে থাক, তবে তা সংকীর্ণতার জন্ম দেবে। একে উন্মুক্ত করে দাও। সেখানে অন্যদের প্রবেশের সুযোগ দাও, মানুষের জীবন সম্পর্কে তত্ত্ববাদটা আসলে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই নির্মিত হয়। এটি আমাদের মন ও হৃদয়কে প্রসারিত করেই এগিয়ে নিতে হয়।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া।

১৯৯১ সালে আটলান্টায় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখতী সানী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আল গোর(যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট)

সময়টা পরিবর্তনের



আল গোর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। লেখক ও পরিবেশকর্মী হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণতা রোধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২০০৭ সালে শান্তিতে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫ সালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

সমাবর্তনের সময়টা হচ্ছে একটি পরিবর্তনের সময়। আমি তোমাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা বিনিময় করব। আমি আশা করি, তোমাদের এই পরিবর্তনের সময়টা শেষ হবে আমার থেকে নির্ঝঞ্ঝাট ভাবেই।

কয়েকটি বিষয় আমি তোমাদের বলতে চাই। আমার এই বক্তব্য তৈরি করতে গিয়ে একাগ্রচিত্তে আমি মনে করতে চেয়েছি, ১৯৬৯ সালে আমার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁর কথা কিন্তু আমি মনে করতে পারিনি। আমি এও নিশ্চিত যে, আমার এ বক্তব্য ৩০ বছর পর তোমাদের কিছুই মনে থাকবে না। কিন্তু তোমরা আজকের রাতের এই উৎসবের কথা মনে রাখবে, তোমরা মনে রাখবে তোমাদের পরিবারের কথা, যাঁরা এখানে এসেছেন। তোমরা মনে রাখবে সেই সব কঠোর পরিশ্রমের কথা, যা তোমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে এবং তোমরা কেমন অনুভব করছ, তা মনে রাখবে। আমি আশা করি, তোমরা যারপরনাই ভালো বোধ করছ। কারণ, এটি হচ্ছে একটি অসামান্য অর্জন, যেখানে আমরা সবাই সম্মানিত হচ্ছি। আমি এ ঘটনাকে সম্মান করতে চাই। আমি এমন কিছু করতে চাই, যেখানে বলার মতো কিছু আছে, এটি এমন কিছু বিষয়, যাকে আমি ভীষণ যত্ন করি এবং

এই বিষয়ের প্রতি তোমরা আরও বেশি যত্নবান হবে, যেমনটা আমি করি।
৩ এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল। আমার স্ত্রী ও আমি এসেছিলাম বাল্টিমোর গুরিওলেস ও বোস্টন রেড সকসের মধ্যে বেসবল খেলার উদ্বোধনী দিনে। তোমাদের মাঝে হয়তো কেউ কেউ তা শুনে থাকবে। সেদিন আমাদের ছেলে গাড়ির মাধ্যমে আঘাত পায় এবং আমরা তখনই স্টেডিয়াম ত্যাগ করি। পরবর্তী সপ্তাহগুলোয় বা এক মাসেরও বেশি সময় আমি জন হপকিনস হাসপাতালে থেকেছি। খুব দ্রুতই আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম এই জাতিগোষ্ঠী কী? অফ ডিউটিতে থাকা দুজন নার্স সেদিন শুধু এ ঘটনার জন্য তাদের সরঞ্জামের বাক্স খেলার মাঠ থেকে সঙ্গে নিল এবং তারা হাসপাতালে সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিল। সেখানকার ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান প্রত্যেকে আমাদের বর্ধিত পরিবারের অংশ হয়ে গেল। অন্তত আমার হৃদয়ে তো বটেই। সে যত্ন, দক্ষতা, ভালোবাসা যা আমি হপকিনস হাসপাতালে প্রত্যক্ষ করেছি, তা কখনোই ভুলব না, যা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি অংশ।
এখানে আমি যা সবচেয়ে বেশি শিখেছি, তা শেয়ার করতে চাই তোমাদের সঙ্গে।
হাসপাতালের কক্ষে আমি পরের মাসের কাজের শিডিউলগুলো দেখছিলাম। সেখানে যে ইভেন্টগুলো ছিল, তার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। যখন আমার শিডিউলগুলো নাকচ হয়ে যেত, তখন এর কোনো গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য আর থাকত না। সেই মুহূর্তে অগ্রাধিকারগুলো তোমার জীবনে স্বচ্ছ হবে, তোমার জন্য তখন তুমি বিষয়গুলোকে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে দেখতে এবং অনুভব করতে পারবে। এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখতে পেরেছি অনেক কিছু। এটি ছিল সেই দীর্ঘদিন ও রাত, যখন আমি একজন বাবা-স্বামী-বন্ধু এবং একজন জনসেবক হিসেবে আমার অগ্রাধিকারগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। তখন আমি একটি বই লেখা শুরু করি, যা দুই বছর পর প্রকাশিত হয়। বইটি ছিল আর্থ ইন দ্য ব্যালেন্স। সে সময় আমি ভাবতে শুরু করি,

www.facebook.com/tanbir.ebooks
একজন মার্কিন নাগরিক হিসেবে আমরা আসলে কী বা কেমন এবং আমাদের কর্তব্য কী?
আমি বিশ্বাস করি, আমরা এখন রয়েছি অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সময়ে। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক, যে গ্রহে আমরা বাস করছি তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অপরিবর্তনীয় রূপে রূপান্তর হয়েছে। আমরা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়ভাবে যা করছি, সে জন্য অবশ্যই আমাদের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। এটি একটি নবযুগ।
বর্তমানে বিশ্বের আলোচিত বিষয় হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, সফলতার সঙ্গে আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করব। কিন্তু এটি কী, তা অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের। আমরা এখন যে বাস্তবতার মুখোমুখি সে বিষয়ে পরস্পরকে জানানোর ব্যাপারে আমাদের হতে হবে স্পষ্টবাদী।
আমি আশাবাদী। লিঙ্কন একবার বলেছিলেন, 'যদি আমাদের পরিস্থিতি নতুন থাকে, অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে নতুন করে।' তখনই আমরা আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারব।
আমাদের বিষয় নতুন। তাই তোমাদেরও ভাবতে হবে নতুন করে। তোমাদের রয়েছে নতুন জ্ঞান আর কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব।
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের জন্য তোমাদের রয়েছে দৃঢ়প্রত্যয়। তোমরা এমন একসময়ে ক্রান্তিকালের সম্মুখীন, যখন আমরা সবাই এই ক্রান্তিকালের মুখোমুখি দাঁড়ানো।
অভিনন্দন সবাইকে, ভাগ্য তোমাদের সুপ্রসন্ন হোক।
ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: জান্নাত-উল ফেরদৌস

Web: http://tanbircox.blogspot.com

উইলিয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটন (যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট)

কখনোই থেমে গেলে চলবে না



উইলিয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটন। জন্ম ১৯ আগস্ট ১৯৪৬। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৯৩ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত। ২০১১ সালের ১৯ মে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন । অভিনন্দন স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী সব শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার, বন্ধু ও অভিভাবকদের। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও, যারা এ সফলতা অর্জনে সহায়তা করেছে। আজ তোমরা জীবনের আরেকটি অসাধারণ অংশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যা তোমাদের জন্য অনেক আনন্দের। আমার মনে হয়, ৪১ বছর আগে আমিও ঠিক তোমাদের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষে। আমার এখনো সবকিছু মনে আছে, যা সেদিন আমাদের সমাবর্তন বক্তা যা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুরু হওয়ার ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আঘাত হানল প্রচণ্ড এক ঝড় এবং বক্তা বললেন, ‘যদি তোমরা আমার বক্তব্যের কপি পেতে চাও, আমি অবশ্য তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া দরকার, নয়তো ঝড় আমাদের ধ্বংস করে দেবে।’ আজ অবশ্য ঈশ্বর পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তোমাদের জন্য এটা সুখকর নয় কি? আজ আমি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, তাঁদের জন্য, যাঁরা ‘স্টার্ন স্কুল অব বিজনেস’-এ কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের

অর্থনৈতিক অবকাঠামো নিয়ে বা যাঁরা সারা দেশে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠিন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শুধু চলা নয়, উন্নত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এখানকার শিক্ষার্থী, কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের প্রচেষ্টা, বিশ্বকে বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুপাচার রোধের চেষ্টা, যা টেকসই ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করবে।

তোমরা বাস করছ ইতিহাসের এক পারস্পরিক নির্ভরতার যুগে। পারস্পরিক এ অধীনতা মানে হলো চারপাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে তোমরা জানো, যা আগের প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে তোমরা নিজেদের গল্পগুলো বাঁচিয়ে রাখবে। নিজের লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছাবে, নিজের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকে ধরে রাখবে এমন একটি পৃথিবীতে, যা উত্তম; মন্দ নয় এবং যেখানে নেতিবাচক শক্তিগুলোর পতন ঘটিয়ে সত্যের জয় হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমি দুটি পরামর্শ দিতে চাই। প্রথমটি হলো জীবনের প্রতিটি দিনে সুখের সন্ধান করতে হবে; সবকিছু শেষ হয়ে গেলে নয়, জীবনের এই যাত্রার শেষেও নয়। সেই শক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তোমরা পেয়েছ। দ্বিতীয়টি হলো কখনো থেমে গেলে চলবে না, জীবনের কঠিন সময়গুলোতে হেরে গেলে চলবে না এবং পরিস্থিতি থেকে সবকিছুর ইতি টেনে চলে যাওয়াও চলবে না। স্বপ্নপূরণের এ যাত্রায় যতটা এগিয়ে গেছ, সেখান থেকে তোমরা বেরিয়ে আসতে পারবে না, তালগোলও পাকিয়ে ফেলবে না, এমনকি জীবনের সবকিছু হারিয়ে গেলেও না। যখন তুমি স্বপ্নপূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন এটা তোমার মন, প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জয় করবেই।

এখন আমি বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বলতে চাই। কীভাবে তুমি একে দেখতে চাও? তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ বিশ্বকে কীভাবে রেখে যেতে চাও? আমি জানতাম, আমি এ পৃথিবীকে কীভাবে দেখতে চাই। আমি চেয়েছিলাম, সুযোগ ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়ার জায়গা হিসেবে পৃথিবীকে দেখতে, যেখানে সব বিভেদ দূর করে আমরা জাতি গঠন

করতে সক্ষম হব।
এমন একটি পৃথিবী আমরা পেয়েছিলাম, যা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারি। সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য উদ্যাপন করব। কিন্তু আমাদের মানবতাবোধের মূল্য থাকবে সবচেয়ে বেশি। সে রকম একটি পৃথিবী যদি আমরা পেতে চাই, তবে প্রশ্ন হলো কীভাবে সেই পৃথিবী আমরা অর্জন করতে পারি? আমাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে ইতিবাচক গুণাবলির স্ফুরণ ঘটাতে হবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নেতিবাচক দিকগুলো প্রতিহত করা। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা মোটেও স্থিতিশীল নয়। শুধু যে সংঘাত, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিবাদ দুটি দেশের সীমানা অতিক্রম করছে তা নয়, মহামারির মতো সীমানাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দা একটি জায়গা থেকে শুরু হয়ে তা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আমাদের এমন একটি উপায় বের করতে হবে, যা অস্থিতিশীলতা প্রতিহত করে বিশ্বের শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।
আমাদের এ পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি, যা পরিবর্তনশীল। কিছু মানুষ বৈশ্বিক উষ্ণতা সম্পর্কে আগ্রহী, কারণ এই আগ্রহ তাদের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের পথ সহজতর করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গ্রিনল্যান্ডের বরফখণ্ড গলতে শুরু করেছে। যদি পুরোটা গলে যায়, তবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে তা গালফ হ্রদকে আটকে দেবে এবং উত্তর ইউরোপ, কানাডাসহ বিশ্বের উত্তরাংশ ৭০০ বছর আগের সেই 'মিনি আইস-এজ'-এর মতোই শীতল হয়ে উঠবে। আমাদের এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে, যাতে কার্বনসহ ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি আমরা হ্রাস করতে পারি।
আবারও প্রশ্ন হলো, তোমরা কীভাবে সেটা সম্ভব করবে? আজ আমি শুধু এ কথাই বলতে চাই যে দরিদ্র দেশগুলোতে যে ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে ধনী দেশগুলোর প্রতিবন্ধকতার মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দরিদ্র দেশগুলোতে যা প্রয়োজন তা হলো ‘সিস্টেম’। আমরা হয়তো সত্যিই মর্মাহত হব, যদি হঠাৎ মাইক্রোফোনটি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা লাইটগুলো নিভে যায়। কিন্তু আমি আমার জীবনের বেশকিছু সময় এমন জায়গায় কাটিয়েছি, যেখানে মানুষ এসব মেনে নেয়। তাদের প্রয়োজন ‘সিস্টেম’। তাদেরও তোমাদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত প্রজন্ম আছে, যারা বিচক্ষণ ও পরিশ্রমী। কিন্তু সুযোগের অভাবে তারা সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের এখানে সিস্টেম আছে, যা আমাদের জীবন সহজ করে দিয়েছে। একে বিস্তৃত করতে হবে। অনেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু অর্জনের চেয়ে শুধু বর্তমানের লাভের কথাই ভাবে।

পৃথিবীকে সবার জন্য নির্মাণ করতে হলে একে ভাগ করে নিতে হবে সবার মধ্যে। আর এ পৃথিবীকে ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেওয়ার মতো পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা এখানে সবাই আছি, আমাদের মধ্যে হয়তো এই মিলটি আছে, যা মানবতাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একটি মানব জিনম প্রজেক্ট প্রকাশ করেছে যে মানুষের বর্ণ, জাতিগত বিভেদের পার্থক্য শতকরা আধা ভাগ। তাই আশা, রইল, এ বিভেদ দূর হবে।

পৃথিবীতে উন্নয়ন আসবে, যদি সত্যিকারের সাধারণ একটি সমাজব্যবস্থা এবং পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক প্রচেষ্টার সৃষ্টি হয়।

গুড লাক। ঈশ্বর সহায় হোন।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শিখতী সানী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

হিলারি ক্লিনটন (যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী)

তোমরাই গড়বে নতুন বিশ্ব



হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০০১-২০০৯ পর্যন্ত নিউইয়র্কের সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালে শিকাগোতে। ২০০৯ সালের ১৩ মে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

ধন্যবাদ, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এর চেয়ে ভালো আর কি কিছু হতে পারে, পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিউইয়র্ক ইরাঙ্কির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? কোনো কিছুই হতে পারে না। আমি এ সম্মানকে গ্রহণ করতে পেরে গর্বিত। তাই সবাইকে ধন্যবাদ। সমাবর্তনের এ বিশাল আয়োজন ও সব স্নাতকধারী, তাদের পরিবার ও বন্ধুজনদের দেখে আমি এটাই বলতে চাই যে তোমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে এ সম্মান গ্রহণ করতে যাচ্ছ। এই মুহূর্তটি দেশ ও সারা পৃথিবীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তরুণ প্রজন্মের মেধা, শক্তি, উৎসাহ ও দায়বদ্ধতা এখন তাদের খুব দরকার। আমি মনে করি, তোমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এ পৃথিবীর জন্য, যা এখন অস্থিতিশীল। কিন্তু পৃথিবী অবশ্যই তোমাদের শিক্ষাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিবাদন জানাবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সেক্রেটারি অব স্টেট) হিসেবে আমি চলমান পৃথিবীর সব ধরনের চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে সচেতন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, আদর্শবাদগত দ্বন্দ্ব, মহামারি ও নিউক্লিয়ার শক্তির

ক্রমবর্ধনশীলতাসহ এ চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হই প্রতিনিয়ত। তোমরা নতুন এই স্নাতকেরা এবং তোমাদের প্রজন্ম এ চ্যালেঞ্জগুলোকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে। আমি জানি, আমরা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই থাকি না কেন, এগুলো থেকে নিজেদের ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। আর এ চ্যালেঞ্জগুলো কখনোই মানব-প্রচেষ্টা, সহযোগিতা কিংবা নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করতে পারবে না। এগুলো আমাদের এক করবে, সে বন্ধন আমাদের শক্তি জোগাবে। তাই আমাদের চ্যালেঞ্জ হবে সব ভালোকে নিয়ে এক হয়ে কাজ করা। কারণ আমরাই পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তুলব আগামীর জন্য।

অনেক বছর আগে আমি যখন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন দেখেছি, কূটনীতি ছিল কিছু সুবিধাভোগী মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র, যারা বন্ধ দরজার মধ্যে সংকীর্ণ পরিবেশে কাজ করত। বর্তমানে আমাদের কূটনীতিবিদদের ক্ষেত্রটি আর সীমিত পরিসরে আবদ্ধ নেই। আমাদের কূটনীতিচর্চাও আর স্টেট বিভাগ ও এম্বাসিগুলোর মধ্যে নিবৃত্ত নেই। আমাদের একবিংশ শতকের দেশ পরিচালনার ভিত্তি তৈরি হয় এসবকে নিয়েই, নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, বড় শহরগুলোর ব্যবসায়ীদের আলোচনা কক্ষে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হলঘরে, তোমাদের আড্ডায় এবং বড় হাসপাতালগুলোর পরিচালনা কক্ষে। আমাদের চিন্তাশীল ক্ষেত্রে তোমরা এসে প্রবেশ করো। আমাদের কর্মতৎপরতায় তোমাদের অংশগ্রহণ আমাদের প্রভাবিত করে।

পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারকারী অনেক চ্যালেঞ্জই আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মোকাবিলা করবে বিশ্বের শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা, যাদের বয়স ৩০ বছরের নিচে। তরুণ প্রজন্ম অবশ্য এর মধ্যেই নিজেদের মেধা, কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তিকে ব্যবহার করে অভিনব কাজ করছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং রাজনীতি ও কূটনীতিচর্চাকে ভিন্ন আকার দিয়েছে। যেমন: কলম্বিয়ায় দুজন স্নাতক ফেসবুক ব্যবহার করে প্রায় দেড় কোটি

www.facebook.com/tanbir.ebooks
মানুষকে একত্র করেছে; সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে একটি দীর্ঘতম শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এসবই ইতিহাসকে বদলে দেয়। তাদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ককে যতটা ধ্বংস করেছে, তা বছরের পর বছর সামরিক সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েও সফল করা সম্ভব নয়।

আমি জানি, তোমাদের মধ্যে একজন কিলিমানজারো পর্বতের ঢালে মাসের পর মাস ধরে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মডেল তৈরির জন্য কাজ করছে, যা নারী ও পরিবারকে নিয়ে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তোমাদের আরেকজন সহপাঠী গত বছর চীনে ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের ত্রাণ ও সাহায্যের জন্য দিনরাত কাজ করেছে। ত্রাণ পৌঁছাতে চলে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে রুয়ান্ডায়। জাতিগঠন, বাণিজ্য পুনঃস্থাপন ও সরকার চালনায় জর্জিয়ায় কাজ করেছে পরিশ্রমের সঙ্গে। তরুণ প্রজন্মের তোমরা অনেকেই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বারাক ওবামাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারণা চালিয়েছ। তাই প্রেসিডেন্ট ওবামা ও আমি তরুণ প্রজন্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গেই অবগত।

আমি মনে করি, প্রতিটি দেশের তরুণদের সুযোগ গড়ে দিতে হবে, যেখানে তারা তাদের বিশ্বাস ও আদর্শকে কর্ম এবং বাস্তবতায় রূপান্তর করতে পারে। দেশের নেতৃত্বদানকারীদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে তাঁরা তোমাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারেন। সে কারণে আমরা স্টেট বিভাগসহ সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বের সঙ্গে নির্দেশনা দিই, যাতে তারা এ মূল্যবান জনমতকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করে।

আমি জানি, তোমাদের জন্য নতুন কোনো ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়ার দরকার নেই। তোমাদের নতুন করে কোনো কিছু শুরুর অপেক্ষা করতে হবে না। আমাদের বিশ্বায়নের আশীর্বাদে জীবন হয়ে গেছে অনেক গতিশীল।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আজ বাড়ি ফিরে অনলাইন ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে 'কে-আই-ভি-এ' (কিভা) নামের ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করে দেখতে পারো, যেখানে তোমরা সান মা নামের একজন ভিয়েতনামের মাকে সাহায্য করতে পারো, যে ধানের বীজ আর সার কেনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ খুঁজছেন। কিংবা হেইভার ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট লগ অন করে এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো এক ক্ষুধার্ত পরিবারকে কিছু অনুদান দিতে পারো। সাহায্য করতে পারো ওয়ানগারি মাথাইকে, তাঁর সবুজ বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে। মানুষের প্রতি তোমাদের এ সাহায্যের হাত এবং পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তোমাদের এ পদচারণ শুধু একটি সামান্য বিষয় বা ব্যক্তিকে বদলে দেয় না, এটি বদলে দেয় পুরো পৃথিবীকে। তোমাদের সারা বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ পৃথিবীর সঠিক অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠা করে। তাই আমাদের প্রয়োজন, সচেতন নাগরিক, যারা ঘর থেকে শুরু করে সমাজ ও দেশকে জবাবদিহি করবে।

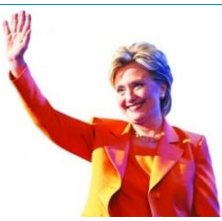
আমাদের এখন প্রত্যেককে প্রয়োজন সবার জন্য। এ প্রয়োজন সব সময়ই ছিল। আজকের পৃথিবীতে এটি আরও পরিষ্কার। যেকোনো মহামারি আজ একটি দেশ থেকে শুরু হয়ে দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়। কোনো একটি আগ্রাসী আদর্শবাদ অল্পসংখ্যক মানুষের কাছ থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিস্তৃত হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত করে বৃহৎ একটি ব্যাংক, বিমাপ্রতিষ্ঠানসহ ব্যবসায়ী প্রকল্প থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অবস্থানরত একজন সামান্য কৃষককে। এগুলো আজকের বাস্তবতা। কিন্তু আমাদের কাজে এ যুগে এমন কিছু মাধ্যম আছে, যা সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারে। সবার জন্য যা হুমকির সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে একত্রে অগ্রসর করতে পারে।

এখন তোমাদের কাছে আছে এক ঐতিহাসিক সুযোগ। একে কাজে লাগাতে হবে। আমি জানি, আজকের এ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তোমরা বিশ্বব্যাপী মন্দা সম্পর্কে অবগত। এ সময়টা হয়তো তোমাদের স্নাতকদের জন্য কঠিন ও

প্রতিকূল। কিন্তু এখনই সে সময়, যখন আমরা সবাই একত্রে জেগে উঠেছি। আমি জানি, আমাদের সামনে অনেক বাধা ও সম্ভাবনা আসবে। আমরা কেউ তা বলতে পারব না। তাই সামনের পথ হবে কঠিন। কিন্তু তোমাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিমা, যা তোমরা অর্জন করেছ, তা হলো নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা। আর তাই এ শিক্ষাকে ঢাল বানিয়ে নাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় নিজের সাফল্যকেই শুধু নিশ্চিত করবে না, নিজের ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে বৃহৎ ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। পরিবর্তনকে থামিয়ে রাখার কোনো পথ নেই। পরিবর্তন আসবেই। আমাদের শুধু সতর্ক থাকতে হবে, পরিবর্তন আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, না দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আজকের এ শুভক্ষণটি শুধু তোমাদেরই। যাও, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে, এই শহরকে, দেশকে ও পৃথিবীকে একটি মূল্যবান ভবিষ্যৎ প্রদান করো, যা নির্মাণের স্বপ্ন দেখি আমরা সবাই। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও যাত্রা সফল হোক।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ
শিখতী সানী

সমালোচক হচ্ছে দরকারি বন্ধু



সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি রডহাম ক্লিনটনের জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭।

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটিতে ১২ জুন ২০১২ তিনি এই বক্তব্য দেন।

শুভ অপরাহ। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে হয়তো আয়ারল্যান্ডে এটাই আমার শেষ সফর। আজ আমি মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামের চারটি সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলব। প্রথমেই আসে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের বিষয়টি। গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী যেখানে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমন অস্থির ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ সময়ে অনেক স্থানেই বিভিন্ন

গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোনো শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। এতে শুধু নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর জন্যই বিপদ নেমে আসছে তা নয়, বরং গোটা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সামাজিক কাঠামো তখনই শক্তিশালী বলে গণ্য হয়, যখন তা শুধু সবলের অধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট না হয়ে দুর্বলের জন্যও সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

বছর দুয়েক আগে মিশরের কায়রোর রাস্তায় তরুণেরা সত্যিকারের পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের অধিকার আছে স্বচ্ছ, উদারমনা, পক্ষপাতহীন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা পাওয়ার। মিসরের পরিস্থিতি আমাদের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে সময় এসেছে আলোচনার মাধ্যমে রক্তপাতহীন, শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বের করার।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ইন্টারনেটে তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা। ১০ বছর আগে হলে আমি হয়তো একে প্রথম চারটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতাম না, কিন্তু এই এক দশকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। চীন, রাশিয়া থেকে শুরু করে ভারত, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়া—এই দেশগুলোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশদূষণ ও দুর্নীতি নিয়ে জনগণের হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অনেক আগে আমি যখন প্রথম রাজনীতিতে জড়িত হই, তখনই শিখেছিলাম যে সমালোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়, তবে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নয়। আমাদের জানতে হবে সমালোচনা থেকে কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্যই সব সমালোচনা যৌক্তিক হয় না, সঠিকও হয় না। কিন্তু সমালোচকেরা অনেক সময় আমাদের সবচেয়ে দরকারি বন্ধুর ভূমিকা পালন করে।

আর এ ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহ দরকার, কারণ আজকের দিনে ইন্টারনেটেই অগণিত আলোচনা-সমালোচনা চলছে। ২১ শতকের সর্বজনীন প্ল্যাটফর্ম বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ইন্টারনেট ছাড়া

আর কিছু নয়। মত প্রকাশের অধিকার একটি সর্বজনীন ব্যাপার, তা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আড্ডায় বসে হোক, আর ফেসবুক পেজে হোক। স্বাধীনতা সব ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় ইস্যুটি হলো সুশীল সমাজের ভূমিকা। সমাজের সেই সব মানুষ, যাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন এবং সরকারকে সঠিক দিকে পরিচালিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা প্রতিটি দেশেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেসব দেশে অস্থিরতা বিদ্যমান, জনগণের ভবিষ্যৎ যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে সুশীল সমাজের সক্রিয় কার্যক্রম এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটা সত্যি যে রাষ্ট্রব্যবস্থার বাইরে থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা কিংবা অবকাঠামোগত সংস্কার করার সুযোগ অনেকাংশে সীমিত। অনেকে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েও নাগরিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করেন। আন্দোলনকারী ও সাংবাদিকেরা অনেক সময় হুমকির মুখে পড়েন, জেল-জরিমানা সহ্য করেন, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কাও থাকে। তবুও, সুশীল সমাজ সব সময়ই নিপীড়নকারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। সুশীল সমাজ নাগরিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে জনগণ সরকারের জন্য নয়, সরকার জনগণের জন্য। এটি জনগণকে অধিকার আদায়ে একত্র করে। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো নারী অধিকার। একে গত শতকের ফেলে রাখা কাজ বললে অত্যুক্তি হবে না। দেশের অর্ধেক জনগণকে অবজ্ঞা করে বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো গণ্য করে সবল অর্থনীতি কিংবা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাটাও বোকামি। কিন্তু অনেক দেশে এটাই বাস্তবতা, এমনটাই ঘটে চলছে নারীদের সঙ্গে। তাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই বললেই চলে, তারা ঘরে-বাইরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা নেই, বেঁচে থাকাই যেন তাদের জন্য বড় পাওয়া। অনেক মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা খেলার পুতুল কিংবা পণ্য, মানুষ নয়। আমি

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত যে নারীদের যদি সমান অধিকার ও সম্মান দেওয়া হতো, তাহলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হতো। শুধু নির্যাতনের ঘটনা কমে আসত না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতো।

আমি নিজে একজন মেয়ের মা এবং নারী-পুরুষ সম-অধিকার ও সমান সুযোগে বিশ্বাসী একজন মানুষ। আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করি, যখন আমি কোথাও যাই এবং পুরুষ নেতারা আমাকে আলাদা করে দেখে কিংবা আমাকে গুরুত্ব দেয় এই কারণে যে আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। হয়তো সেদিন খুব দূরে নয়, যখন কন্যাসন্তানেরা পুত্রসন্তানের মতো যত্ন পাবে, মেয়েরা ছেলেদের সমান পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে, নারীরা পুরুষদের মতো পরিবার ও সমাজে নিজেদের অবদান রাখতে পারবে। আমি যেসব অধিকারের কথা তুলে ধরলাম, সেসব আদায় করা সহজ নয়। আমাদের লেগে থাকতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। এ কাজগুলোর জন্য তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। তোমাদের সব আছে— প্রতিবাদী কণ্ঠ, ভোট দেওয়ার অধিকার, শিক্ষা, বুদ্ধি ও বিবেচনা। এ সংগ্রামের নেতৃত্ব তোমাদেরই দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা এক ছোট্ট মেয়ে হিসেবে আমি যে স্বপ্ন দেখতাম, আমি তারচেয়ে অনেক বেশি পথ পাড়ি দিয়েছি, অনেক বেশি দেশ ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি। এসব দেখে আমি বুঝেছি যে পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। আমি বিশ্বাস করি, এই চেতনা তোমাদের জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে, সামনের দিনগুলোতে আশার আলো জোগাবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

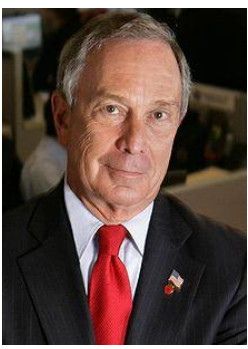
সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত

অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

Web: http://tanbircox.blogspot.com

মাইকেল ব্লুমবার্গ (নিউইয়র্ক সিটির মেয়র)

ঝুঁকি নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই



মাইকেল ব্লুমবার্গের জন্ম ১৯৪২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র। ২০০৭ সালে টাফটস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে তিনি এ বক্তৃতা করেন।

আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি পাঁচটি জিনিসের কথা উল্লেখ করব। নোট নেওয়ার দরকার নেই। কারণ, আপাতত তোমরা আর কোনো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ না! তোমাদের কেবল মন দিয়ে শুনতে হবে।

প্রথমত, তোমাকে অবশ্যই ঝুঁকি নিতে হবে। সেটা পছন্দের কাউকে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া, কঠিন কোনো কোর্সে যোগ দেওয়া কিংবা বন্ধুর কাছে টাকা ধার চাওয়া—যা-ই হোক না কেন, ঝুঁকি নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আমি জানি, আজকের এই দিনটিতে আসার জন্য তোমাদের এরই মধ্যে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

পৃথিবীটা প্রতিযোগিতায় ভরা। এখানে সবাই নিজের চিন্তাভাবনাকেই সবার সেরা মনে করে। কিন্তু তোমরা খেয়াল করে দেখবে, সফল তারাই হয়, যারা সেসব সেরা চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। আমি নিজের একটা গল্প বলি। আমার চাকরিজীবনের শুরু ওয়াল স্ট্রিটে। টানা ১৫ বছর আমি ছিলাম সেখানে। দারুণ কাটছিল দিনগুলো, আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশংসায় আমি প্রায় ভেসেই যেতাম। সবাই আমাকে ভালোবাসত, যত দিন না পর্যন্ত আমি চাকরিটা খোয়ালাম।

কিন্তু আমি আশাবাদী ছিলাম সব সময়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মধ্যেই আমি সুখ খুঁজে পেতাম। তাই চাকরি

হারানোর পরদিনই আমি আমার নিজের কোম্পানি খুলে বসলাম। এখানেই আমি প্রচণ্ড একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমার পরিবার, বন্ধুরা সবাই অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে; তাদের উদ্দেশ্য ভালো ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকে সেই ব্যবসা সফল হয়েছে, এতেই আমার সুখ। আমার সন্তানেরাও এতে খুশি।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো সফল হওয়া যায় না। তোমরা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে ভালোভাবেই এটি বুঝতে পেরেছ। যেকোনো দলগত প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা। শুধু শিক্ষাজীবনেই নয়, কর্মজীবনেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীটা যথেষ্ট জটিল, এখানে কারও পক্ষেই একা সব সমস্যা সমাধান করে ফেলা অসম্ভব।

তুমি একাকী কাজ করে মাঝারি গোছের কিছু একটা হবে, নাকি সবাইকে নিয়ে দলগতভাবে সফল হবে, তা সবাই মিলে একে অন্যকে সহযোগিতা করে কাজ করতে পারার ওপরই নির্ভর করে। তোমাকে অন্যের দুঃখ ও দায়িত্ব—দুটোর ভারই নিতে জানতে হবে, তাহলেই দলের প্রাপ্তিতে তোমার অংশ থাকবে।

আসলে বড় কিছু কখনোই একা করা যায় না। জীবনে চলার পথে যদি 'আমি' আর 'আমার' এই শব্দ দুটোর বদলে 'আমরা' আর 'আমাদের' ব্যবহার করতে পারো, তাহলেই দেখবে আগের চেয়ে অনেক ভালো করতে পারছ।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, যা বলার তা সোজাসুজি বলতে পারা। তোমার যুক্তিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই। কেউ যদি তোমার সঙ্গে একমত হতে না-ও পারে, তবু সে তোমাকে সততা আর সাহসের জন্য সম্মান না করে পারবে না। তাই তোমাদের নিজের আদর্শের প্রতি সৎ থাকতে হবে। যা মন থেকে বিশ্বাস করো, তা-ই জোর গলায় বলতে হবে।

চার নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বিশেষ করে, যখন মতের অমিল হয়, তখন শ্রদ্ধা বজায় রাখা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। যারা অন্যকে তাদের মতপ্রকাশে বাধা দেয়, তারা আসলে নিজেরাই হীনম্মন্যতায় ভোগে। আমি মনে করি, প্রতিপক্ষের যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে গেলে পুরো ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে ভাবতে হয়, যা শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান শক্ত করতেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তবে প্রথমে অবশ্যই অন্যকে বলার সুযোগ দিতে হবে আর তার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। আজকে যদি আমাকে একটিমাত্র উপদেশ দেওয়ার জন্য বলা হতো, তাহলে আমি এটাই বলতাম, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করো।

আজকের শেষ উপদেশ হলো, তুমি অন্যকে যত বেশি দেবে, নিজেও তত বেশি পাবে।

আমি যখন ব্যবসা করতাম, তখন সব সময় অন্যের জন্য কিছু করতে চেয়েছি। পরিবর্তন আনার অদম্য ইচ্ছা আমাকে এক বিশাল চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। অবশেষে ২০০১ সালে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিয়ে পাবলিক সার্ভিসে যোগদান করি। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, মানুষের জন্য কাজ করে যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, তা আর অন্য কিছুতে পাওয়া অসম্ভব। তুমি যদি জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করো, প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারা দিনে তুমি কী করেছ ভেবে তোমার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটবেই।

আর একটি কথা, মাকে ফোন করতে ভুলে যেয়ো না। আমার নিজের যদিও সব সময় মনে থাকে না, তবু চেষ্টা করি।

আমি যখনই কোনো সমাবর্তন বক্তৃতার শেষের দিকে আসি, আমার একটা কথাই বারবার মনে হয়—কী বলে আমি স্নাতকদের বিশ্বাস করাতে পারব যে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ তাদের নিজের হাতে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে তোমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ, তা তোমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবে। আমি বলব, তোমার বেতন অথবা পদমর্যাদা নিয়ে এখনই দুশ্চিন্তা কোরো না। মনে রাখবে, এটা অনেকটা ম্যারাথন দৌড়ের মতো, ১০০ মিটার স্প্রিন্ট নয়। তোমার প্রথম চাকরি

এমন হওয়া উচিত, যা থেকে তুমি শিখতে পারো, যা তোমার ভেতর উৎসাহ জাগিয়ে তোলে, তোমাকে বিনয়ী হতে শেখায়।

তোমাদের জন্য আমি বলব, অফিসে অন্য সবার আগে যাও, সবার শেষে বের হও আর পারতপক্ষে ছুটি নিয়ো না। সফল হতে হলে পরিশ্রম ছাড়া সত্যিই আর কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ, ভাগ্য বলে হয়তো কিছু একটা আছে। কিন্তু তুমি যত পরিশ্রম করবে, ভাগ্যও তোমাকে তত সহায়তা করবে। তাই পরিশ্রম করো, আর সে কাজই বেছে নাও, যা তুমি উপভোগ করো।

জীবনে চড়াই-উতরাই থাকবেই। আমি চাকরি পেয়েছি, বরখাস্ত হয়েছি, প্রশংসায় আপ্লুত হয়েছি, নিন্দার ঝড়ও সহ্য করেছি। কিন্তু সবকিছুর পরও আমি বিশ্বাস করতাম, আগামীকাল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সেই আশাতেই আমি আবার নতুনভাবে শুরু করতাম।

পৃথিবী তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমাদের মেধা, শক্তি, উৎসাহ—এ সবকিছুই আজ বড় বেশি দরকার। জেনে রেখো, আজ এখানে উপস্থিত সবাই তোমাদের নিয়ে গর্বিত। আমরা সবাই জানি, তোমরা তোমাদের স্বপ্নের জীবনকেই বেছে নিতে পারবে।

সূত্র: www.tufts.edu

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা! (ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট)

মুচি থেকে মহানেতা



দরজায় হেলান দিয়ে কাঁদছেন ২৫ বছরের অসহায় এক যুবক। ১৯৭১ সাল। তাঁর সামনে নিথর পড়ে আছে লক্ষ্মী বউয়ের লাশ। আট মাসের বাচ্চা পেটে ছিল বউটির। না, ঘটনাটি বাংলাদেশের নয়। যুবকটি ব্রাজিলের। হেপাটাইটিসের চিকিৎসার অভাবে ঘরের লক্ষ্মীর অকালমৃত্যু। অপরাধবোধের ঘোর অন্ধকার ছেয়ে ফেলে তাঁকে। জেদ চাপে মনে, একদিন অনেক বড় হবেন, যেদিন এভাবে কাউকে অর্থের অভাবে মরতে হবে না। বেছে নিলেন রাজনীতির পথ। তিনি আজ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট, লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা! সম্প্রতি টাইম সাময়িকীর বর্ষসেরা শত মনীষীর তালিকায় শীর্ষনেতা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। জন্ম ১৯৪৫ সালে। বয়সের ঘর থেকে মুছে গেছে তাঁর ৬৪টি বছর। কিন্তু মুছে যায়নি শৈশব-কৈশোরের কষ্টের স্মৃতিগুলো। তিনি প্রথম পড়তে শেখেন ১০ বছর বয়সে। এরপর চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সাত বছর বয়সে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এরপর সংসারের আয়রোজগারের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। বন্ধুরা যখন স্কুলে, ১৪ বছরের কিশোর লুলা দা সিলভা তখন রাস্তার মোড়ে বসে আছে রং-পলিশ নিয়ে। কী কাজ তাঁর? পথচারীর জুতা পলিশ। আজকের ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সেদিন ছিলেন রাস্তার মুচি! কিন্তু এই কাজে কত আর আসে? তাতে তো আর সংসার চলে না। কাজ নিলেন লেদ ফ্যাক্টরিতে। একদিন কাজ করতে

গিয়ে তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের অর্ধেকাংশ কেটে গেল। কাটা আঙুল নিয়ে দৌড়ে গেলেন আশপাশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার জন্য। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। কিন্তু সামান্য শ্রমিকের কথা কে শোনে! বিনা পয়সায় তো আর চিকিৎসা হয় না! এই ঘটনা তাঁকে প্রচণ্ড রকম নাড়া দেয়। তাঁর ইচ্ছে হলো, শ্রমিকদের নিয়ে একটা সংঘ গড়ে তুলবেন। এই ইচ্ছেটাই শেষে জেদে পরিণত হয়, যখন বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী মারিয়া। এরপর বড় ভাইয়ের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি। ২৭ অক্টোবর, ২০০২। সেদিন তাঁর ৫৭তম জন্মদিন। চারদিকে আনন্দ-আড্ডার আয়োজন। হাজার হাজার মানুষের শুভকামনায় সিক্ত তিনি। না, জন্মদিনের আয়োজন বা শুভকামনা নয়, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট! ২০০৬ সালে তিনি দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আর সে জন্যই টাইম সাময়িকী তাঁকে নির্বাচন করেছে ২০১০ সালের সেরা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। একজন সাধারণ মুচি থেকে মহানেতা! নিশ্চয়ই লুলা দা সিলভা বিশ্বের সব তরুণের এক আদর্শ অনুপ্রেরণা হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

ফেলিপে কালদেরন (মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি)

কখনো হাল ছেড়ো না



ফেলিপে কালদেরন মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি। ১৯৬২ সালের ১৮ আগস্ট তাঁর জন্ম। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি এ বক্তব্য দেন।

সর্বপ্রথম তোমাদের অভিনন্দন। আমি জানি, তোমরা তোমাদের অর্জনের জন্য অনেক আনন্দিত ও গর্বিত।

আজকের এই সমাবর্তন কোনো কিছুর শেষ নয়, বরং আজকের দিনটা হচ্ছে তোমাদের জীবনে একটা নতুন যাত্রা শুরুর দিন। একদিন তোমাদের মধ্যকার অনেকেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী, আইনজীবী, লেখক, চিকিৎসক অথবা প্রকৌশলী হবে। তা যা-ই হও না কেন, একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হোক তোমার জীবনের ব্রত। নিজের দেশের একজন ভালো নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীর একজন যোগ্য মানুষও তোমাকে হতে হবে। আজকে তোমরা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছো সবচেয়ে আধুনিক জ্ঞান নিয়ে। নিঃসন্দেহে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা সম্মানের এবং একই সঙ্গে দায়িত্বের। তোমাদের সুযোগ আছে অন্যদের জন্য কিছু করার। তোমরাই পারবে তোমাদের মেধা ও সাহস দিয়ে পৃথিবীকে সঠিক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিতে—যদিও অনেকের কাছেই তা অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধীর সেই কথাটা মনে করো। নিজেকে জিজ্ঞেস করো, যে পরিবর্তন তুমি দেখতে চাও, তা নিজেকে দিয়েই কি শুরু

করতে চাও?
তোমাদের আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম, মেক্সিকোতে তখনো স্বৈরাচারী শাসন ছিল। প্রতিটি প্রদেশের গভর্নর এবং সিনেটররা ছিলেন একই দলের সদস্য। বহু বছর ধরে সেই দলই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। যেমন—গণমাধ্যম কী বলবে, স্কুল কী শিক্ষা দেবে, কোন ধরনের রক কনসার্ট করা যাবে ইত্যাদি। একসময় তোমাদের মতো শিক্ষার্থীরাই এর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করল। রাষ্ট্রজুড়ে তখনো আশার আলো ছিল এবং গণতন্ত্রের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল। আমার বাবা সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খুব কঠিন সময় ছিল সেটা। আমার ভাইবোন ও আমি বাবার সঙ্গে ছিলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে, চিৎকার করে স্লোগান দিতে খুব ভালো লাগত আমার।
ধীরে ধীরে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নির্বাচনী জালিয়াতিও শুরু হলো। ক্ষমতার হতাশাজনক অপব্যবহার দেখে একদিন বাবাকে বললাম যে আমাদের সব চেষ্টা বৃথা। একদিকে সরকার ভোট চুরি করছে, অন্যদিকে দেশের মানুষও এসব নিয়ে ভাবছে না। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমার আক্ষেপের কারণ বুঝতে পারছি। আমরা যা করেছি, তা দেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। হয়তো আমাদের দল থেকে আমরা কোনো প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর পাব না। কিন্তু মেক্সিকোকে শান্তিপূর্ণভাবে বদলানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, এখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলানো। আমরা না করলে আর কেউ সেটা করবে না। গণতন্ত্র খুব ভালো করে আসার আগেই আমার বাবা মারা যান এবং এর কয়েক বছর পর সব ধরনের বিপত্তি কাটিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হই।
তোমরা কখনোই তোমাদের স্বপ্ন ও চিন্তার জগৎ থেকে সরে এসো না। বিশ্বাস করে লড়ে যাও। তোমার প্রচেষ্টার মধ্যে কখনো সংশয় রেখো না। কারণ, মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ধ্বংস করার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। জীবনকে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
অর্থপূর্ণ করে তোলো। তোমার নীতিতে অটল থেকো। পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আজকের পৃথিবী। যেমন—জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, বেকারত্ব ইত্যাদি।

প্রায় ৪০ বছর আগে ক্লাব অব রোমের বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা মানবতার ধারা নিয়ে গবেষণা করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তা হলো 'ম্যানকাইন্ড অ্যাট দ্য টার্নিং পয়েন্ট'। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে দুই ধরনের শূন্যতা চোখে পড়ে। একটা হলো মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে এবং অপরটা হলো ধনী-গরিবের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। দিন দিন দরিদ্রতা বেড়ে চলেছে। ১০০ কোটির বেশি মানুষ এখন এক ডলারের চেয়ে কম উপার্জনে বেঁচে রয়েছে। অন্যদিকে, কার্বন নিঃসরণের কারণে গত শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বেড়ে গেছে। সঠিক উদ্যোগের অভাব হলে এই শতাব্দীর শেষে তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব রয়েছে। অর্থনীতির উন্নয়ন নাকি পরিবেশ রক্ষা—কোনটাকে বেছে নেওয়া হবে, সেটা এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেও অর্থনীতির উন্নয়ন করা সম্ভব। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তন ও দরিদ্রতার সঙ্গেও একসঙ্গে লড়াই করা সম্ভব। একধরনের উভয় সংকটপূর্ণ অবস্থা দূর করার জন্য দরকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মন।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা অনেক দূর এসেছ। আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। একটা শেষ উপদেশ দিচ্ছি, জীবনটাকে উপভোগ করো, আনন্দ খুঁজে নাও—এটাই হলো বেঁচে থাকার নির্যাস। পৃথিবীতে তোমার বেঁচে থাকার অর্থ অনুসন্ধান করো। তুমি যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাও, তা নিয়ে ভাবো ও কাজ করে যাও। জীবনতরীকে ঝড়ের বিপরীতে চালাতে ভয় পেয়ো না। আজ থেকে তোমাদের নতুন এক যাত্রা শুরু হলো।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মারুফা ইসহাক

Web: http://tanbircox.blogspot.com

মনমোহন সিং(ভারতের প্রধানমন্ত্রী)

আশাবাদ বাড়িয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস



ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জন্ম ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ২০০৪ সাল থেকে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন কেমব্রিজ (১৯৫৭) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২) থেকে। ২০০৫ সালের ৮ জুলাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এ বক্তব্য দেন।

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে আমার রয়েছে দারুণ সব স্মৃতি। এখানে আমি অসাধারণ কিছু সময় কাটিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। জীবনে অনেক ডিগ্রি আমি পেয়েছি। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় যে প্রতিষ্ঠানটি আমাকে মায়ের মতো আগলে রেখেছিল, সে প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি পাওয়ার বিষয়ের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হতে পারে না। আমি আজ সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই দিনটিকে সত্যিই আমি হৃদয়ে ধারণ করি।

প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে পৃথিবীটা। আমার ছাত্রাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাজারো পরিবর্তন এসেছে চারপাশে। তবে কোনো কোনো সমস্যা এখনো আগের মতোই রয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমন বদলেছে সমস্যার ধরন, তেমনি বদলেছে এর সমাধানের কৌশলও। গত কয়েক যুগে বদলে গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাঠামো। তারা নতুন করে ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস। একজন ভারতীয় হিসেবে নতুন এই পৃথিবীটাকে নিয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। যেকোনো উদ্দেশ্য নিয়ে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
আমরা এখন এগিয়ে যেতে পারি নির্দ্বিধায়। এই নতুন ধরনের আশাব্যঞ্জক চিন্তাভাবনা দিনকে দিন বাড়িয়ে চলছে আমাদের আত্মবিশ্বাস। বাড়িয়ে চলছে কাজের গতি। এর সবটুকু কৃতিত্ব একদল শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের। এরাই একটি দেশের সুনাগরিক বলে বিবেচিত হয়। একটি জাতিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রয়োজন একদল মেধাবী ছাত্র। হাজারো তরুণ শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নতুন এক ভারত গড়ে তোলার কাজে অবদান রাখছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে অর্থনীতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা পেয়েছিলাম, তাতে ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী ও উপনিবেশ-পরবর্তী আশাবাদ। কিন্তু ষাট ও সত্তরের দশকে উন্নয়ন অর্থনীতির ভাবনাটাই গেছে বদলে। বিশ্ব বাণিজ্য থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো লাভবান হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

এখানে, এই অক্সফোর্ডে ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। সে সময় লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্যই মূলত তাঁর এই ইংল্যান্ড সফর। তারই অবকাশে অক্সফোর্ডের ব্যাল্লিওল কলেজের অধ্যাপক এ ডি লিন্ডসের বাড়িতে তিনি দুটি সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়েছিলেন। সে রকম এক সভায় মহাত্মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে কতটা আলাদা করতে চাইছেন?' খুবই সুস্পষ্ট ছিল মহাত্মার উত্তর, 'সাম্রাজ্য থেকে পুরোপুরি আলাদা হতে চাই; তবে যদি আমি ভারতীয়দের লাভবান হিসেবে দেখতে চাই এবং দুঃখ-দুর্দশামুক্ত দেখতে চাই, তাহলে ব্রিটিশ জাতি থেকে একেবারেই আলাদা হতে চাই না।' এরপর তিনি যোগ করেন, 'সাম্রাজ্য হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে আছে স্রেফ ভারতের জন্যই। সাম্রাজ্য বিষয়টাকেই দূর করতে হবে, ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে সম-অংশীদার হিসেবে, তাদের আনন্দ ও বেদনারও অংশীদার হব আমরা।' মহাত্মার এই অসামান্য ভাবনার ভিত্তিতেই আমরা ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলেছি।

১৯৯১ সালে যখন আমি ভারতের অর্থমন্ত্রী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
হিসেবে কাজ শুরু করলাম, তখন আমাদের সরকার ভারত-যুক্তরাজ্য পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর সবচেয়ে জোর দিয়েছিলাম। আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহই নেই, ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে চমৎকার অংশীদারির সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে দুই দেশের বেশির ভাগ ভাবনাতেই মতৈক্য রয়েছে।

ইংরেজি ভাষা এবং আধুনিক স্কুল-ব্যবস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এখানকার মানুষ হয়তো চিনতে পারবে না আমাদের বলা ভাষা, কিন্তু আমি তাদের আশ্বস্ত করতে পারি, এটা ইংরেজি! পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষ তাদের নিজেদের মতো করেই এই ইংরেজি ভাষা তৈরি করে নিয়েছে। আমরা যে ইংরেজিতে কথা বলি, সে ইংরেজিতে হয়তো যুক্তরাজ্যের রানি কথা বলেন না, আমরা হয়তো মূল ক্রিয়াকে ভেঙে উচ্চারণ করি, কোনো একটা বর্ণ ফেলে দিই, কিংবা অন্য কোনো বর্ণ যোগ করি, কিন্তু তাতে সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে এই ভারতীয় সৃজনশীল সবকিছুর মধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষাটাও উপকৃত হচ্ছে। আমরাই তো আপনাদের একজন আর কে নারায়ণ বা সালমান রুশদী উপহার দিয়েছি।

জাতি, ধর্ম আর বর্ণের ভিত্তিতে কখনো পার্থক্য করা উচিত নয়। সব মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, দিনমজুর, পুলিশ থেকে শুরু করে দেশের সব পেশার মানুষ রাষ্ট্র থেকে সমান সুযোগ পাবে। ক্ষমতার অপব্যবহার থাকলে কখনোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিভিন্ন ধরনের মানুষ একসঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করলেই সত্যিকারের গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া যাবে। অস্তিত্ব থাকবে না রাহাজানি, হানাহানি আর হত্যার মতো সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলিতে বলেছিলেন,

‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে— এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।’

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি আদান-প্রদানের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দারুণ একটি জায়গা। এখানকার মানুষগুলো মুক্তচিন্তার ধারক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পায় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। ভারতের মানুষের চালচলন, নীতি, জীবনযাপনের পদ্ধতি, সংস্কৃতি, ভাষা—এসব ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য যেসব অধ্যাপক কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ড. এস রাধাকৃষ্ণান, যিনি পরবর্তী সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ড. বিমল কৃষ্ণ মতিলালের কথা আমরা গর্ব করে বলতে পারি। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, যিনি ভারতকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করেছেন। তিনি লর্ড কার্জন। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'সকল ভাইসরয়ের কথা ভোলা গেলেও কার্জনের কাজের জন্য তাকে কেউ ভুলতে পারবে না। কারণ, সুন্দর এই দেশ ভারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য তিনি কাজ করেছেন।'

সুযোগ পেলেই আমি আবার ফিরে আসতে চাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহান কিছু মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি আমি এখানে। তাদের সঙ্গে কথা বলেছি নিজের স্বপ্নগুলো নিয়ে। জানতে পেরেছি মানবতাবোধ সম্পর্কে। নিজের কথাগুলো অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের বলতে পেরে ভালো লাগছে। এ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। জীবন এবং সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্য সবারই যেন সমান অবদান থাকে। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করা উচিত সবার।

সূত্র: www.hindu.com/thehindu/nic/0046/pmspeech.htm

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

Web: http://tanbircox.blogspot.com

রাহুল গান্ধী(ভারতের কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক)

শিখতে হবে সবার কাছে



রাহুল গান্ধী। ভারতের তরুণ রাজনীতিবিদ এবং লোকসভার সদস্য। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। ২০০৯ সালের ১৯ আগস্ট রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

এখানে এসে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতে পেরেছি, আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শিক্ষার্থীই নয়, অভিভাবক ও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবার কাছেই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষাজীবনের এই অসাধারণ দিনটিতে সবাইকে আমার অভিনন্দন।

একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমাকে দুটো ভূমিকায় কাজ করতে হয়। প্রথমে রাজনীতিবিদ হিসেবে সবকিছু বড় আকারে দেখতে হয়, যাতে আমি সমস্যাগুলো বুঝতে পারি এবং এর সমাধানের জন্য কাজ করতে পারি। দ্বিতীয়ত, একজন মানুষ হিসেবে আমার চেষ্টা থাকে বিবেকের কাছে জবাবদিহি করা এবং কিছু নৈতিকতা মেনে চলা, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ বলব তোমাদের বয়সে আমার ভাবনাগুলো কেমন ছিল এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার আলোকে কীভাবে তা বদলে গেল, সেসব কথা। শুরুতেই রাজনীতিবিদ হিসেবে কেন সবকিছু বড় করে ভাবতে হয় তা বলি। খুব শিগগির জনসংখ্যার দিক থেকে চীনকে পেছনে ফেলবে ভারত। পৃথিবীর সবচেয়ে জনসংখ্যাবহুল দেশ হওয়ার কারণে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। স্বাধীন হওয়ার পর গত ৬০ বছরে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি সামনের দিকে এগিয়ে

যাওয়ার জন্য। 'কিচ্ছু হবে না এই দেশের, কচ্ছপের গতিতে চলছে সব'—এসব বলে অভিযোগ করতে দেখা যায় অনেককেই। কিন্তু ঠিকমতো সব দিক বিবেচনা করে যদি দেখি, তবে দেখা যাবে, আমাদের অর্জন কম নয়। ৬০ বছর আগে দারিদ্র্যের চিহ্ন ছিল সব জায়গায়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার মানুষের একত্র হয়ে কাজ করার মানসিকতাও ছিল না। কয়েক বছর আগেও আমেথি, রায়বেরিলিসহ ভারতের আরও কয়েকটি জায়গায় ছিল না কোনো পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র। গ্রামের মানুষ ছিল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন।

গত ৬০ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো সব জায়গার এই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে একত্র করা। আমরা তাদের একত্র করেছি বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে। এ ছাড়া গত ২০ বছরে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা পালন করেছে।

আমরা একটি দরিদ্র জাতি হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বদলে যাচ্ছে সবকিছু। সমগ্র ভারতকে এখন দুটো অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশ খুবই উন্নত এবং মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দিল্লি, লক্ষে□ৌ, বেঙ্গালুরুর মতো দেশের বড় শহরগুলোর কথা। এরা ধনী এবং সামনের দিকে এগিয়েও যাচ্ছে খুব দ্রুত। অপর অংশের মানুষ খুব দরিদ্র এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। ভারতের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষই হচ্ছে এমন। চাকরির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে একত্র করা এবং দেশের উন্নতির চেষ্টা করেছি সবাই। ফলাফল, গত ৩০ থেকে ৪০ বছরে খুব দ্রুত এগিয়ে গিয়েছি সামনের দিকে। গত ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বলতে পারব, অর্থের অভাব নেই আমাদের। ভারতের একত্রিত মানুষগুলো এখন দ্রুত এগোচ্ছে সামনের দিকে।

পৃথিবীর অন্য দেশগুলো যখন অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে হতাশায় ছিল, তখনো আমাদের উন্নতির হার ছিল সাত শতাংশ। তাই আমরা এখন ঠিক

করেছি, ভারতের অনুন্নত জায়গাগুলোকে উন্নত করার লক্ষ্যে কাজে নামব। আর এ কাজে থাকবে তোমরা, তরুণেরা। সবাইকে একত্র করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে আমাদের।

তরুণদের দায়িত্ব এ দেশের প্রতিটি মানুষ যেন ভারতসহ সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা। এভাবে কাজ করতে পারলেই বদলে দেওয়া যাবে অনুন্নত জায়গাগুলোকে।

অনেক শিক্ষার্থীই আমাকে বলেছে, এরপর তারা চাকরি করবে। জীবনে থিতু হওয়ার চেষ্টা করবে। চাকরি করা মানে দেশকে ভুলে যাওয়া নয়। এর মাধ্যমেই তোমরা দেশের জন্য কাজ করে যাবে। তোমরা প্রকৌশলীরা যখন সেতু তৈরি করবে, বুঝবে দুটো অংশকে তোমরা একত্র করতে যাচ্ছ। চাকরির সত্যিকারের মানেটা উপলব্ধি করতে হবে সবাইকে। অনেকে হয়তো চাকরির বাইরেও দেশের জন্য অনেক কিছু করবে। আমি শুধু বলতে চাই, যে যেখানেই থাকুক না কেন, তারা যেন ভারতের এই দুটো অংশকে একত্র করার জন্য কাজ করে।

এখন আমি বলব, তোমাদের বয়সে আমার ভাবনাটা কেমন ছিল, তখন আমি পৃথিবীটাকে কীভাবে দেখতাম এবং এখন কীভাবে বদলে গিয়েছে আমার ভাবনাগুলো। এটা একটা বিশাল পরিবর্তন। তখন আমার কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে বলে মনে করতাম। কেউ কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলেই না ভেবে জবাব দিতাম ঝটপট। আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা ছিল, যা দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে এমন ধারণা ছিল। কিন্তু এমন করে ভেবে কাজ করতে যাওয়াটা ভুল। সবারই নিজস্ব কিছু ভাবনা থাকে। কিন্তু সে ভাবনা থেকে কাজ করতে যাওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিতে হবে। অন্যদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নিতে হবে সব। শুনতে হবে অন্যদের কথা। দিতে হবে তাদের মতামতের মূল্য। জ্ঞানার্জনের জন্য এটা খুবই ভালো একটা উপায়। সবার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
কাছ থেকেই শেখার কিছু না কিছু আছে। এভাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক পরিকল্পনাই বাদ দিতে হয়েছে আমাকে। এতে ক্ষতি নেই। আরও ভালো, নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করতে পেরেছি আমি পরবর্তীকালে। আজ যে ভাবনাকে তুমি নিখুঁত মনে করছ, কাল সেটির খুঁত বের হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এ পৃথিবীতে কেউই আমরা নিখুঁত নই। প্রতিনিয়ত নিজের ভাবনাগুলো নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকো। কাউকেই অবহেলা করা যাবে না। আমি খুবই ভাগ্যবান যে দেশের অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি। কথা বলেছি দরিদ্র মানুষের সঙ্গে। কথা বলেছি তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে। কৃষক থেকে শুরু করে প্রকৌশলী, চিকিৎসক—কারও কথাই ফেলনা নয়। একজন কৃষকও হয়তো কাজের ব্যাপারে তোমাকে দারুণ সাহায্য করতে পারেন। দরিদ্র মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি অনেক কিছু জেনেছি। আমি জানি না এমন অনেক কিছু শিখেছি তাদের কাছ থেকে।

সুতরাং, দুটো বিষয়ে নজর রাখা জরুরি। এক. নিজের চিন্তাভাবনা সঠিক কি না, তা নিজেসহ অন্যদের প্রশ্ন করা এবং তাদের মতামত জানা। দুই. যার কাছ থেকে তুমি শিখতে পারলে তাকে শ্রদ্ধা করা। তুমি শিক্ষিত, তাই তুমি সবকিছু জানো—এমনটা ভাবা খুবই ভুল। কোনো ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলে নিশ্চিত থাকো, আরও ভালো কোনো ভাবনা ধরা দেবে তোমার কাছে।

সবশেষে বলছি, তোমাদের মধ্যে আসতে পেরে আমি গর্বিত। অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই এবং তোমরা তরুণ শিক্ষার্থীদের জানাই ধন্যবাদ। তোমরা ছাড়া এ দিনটি কখনোই এত সুন্দর হতো না।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: কিঙ্কর আহ্সান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

এ পি জে আবদুল কালাম
(ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি)

ঠিক করো, কীভাবে নিজেকে স্মরণীয় করে রাখবে



চারোতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। আমি অভিবাদন জানাচ্ছি স্নাতকদের, তাদের শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য। আরও অভিনন্দন জানাই তাঁদের শিক্ষকদের, যাঁরা এই তরুণ আত্মাগুলোকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

'অসাধারণ গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে মহৎ করে তোলে'—এ বিষয়ে আজ আমি আমার কিছু অভিমত তুলে ধরব।

তৃতীয় বর্ষে বৈমানিক প্রকৌশলবিদ্যা পড়ার সময় পাঁচজন সহপাঠী নিয়ে আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো একটি নিম্নস্তরবর্তী আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধবিমানের নকশা তৈরি করার। সিস্টেম নকশা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব আমার। প্রকল্পটির আনুষঙ্গিক, বিমানের গতির হিসাব এবং কাঠামোগত নকশাও আমাকে দেখতে হবে। বাকি দলের কর্মীরা দেখবে বিমানের পরিচালনক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্বের ভূমিকাসহ অন্যান্য যান্ত্রিক বিষয়গুলো। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মাদ্রাজ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীনিবাস। আমাদের কাজ দেখে তিনি ঘোষণা দিলেন, প্রকল্পটির পুরোটাই হতাশাজনক। এতজনের নকশা একত্র করে এ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে আমরা যে কতটা পরিশ্রম করেছি এবং কতটা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এসেছি, সেটা তিনি কানেও তুললেন না। আমি এক মাস সময় চাইলাম। অধ্যাপক শ্রীনিবাস জবাব দিলেন, 'দেখো, ইয়ং ম্যান! আজ শুক্রবার দুপুরবেলা। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিচ্ছি। সোমবার সকালের মধ্যে এই নকশার কনফিগারেশন হাতে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
না পেলে তোমার স্কলারশিপ বন্ধ।' আমার পুরো জীবনটাই যেন কেঁপে উঠল। স্কলারশিপই আমার বেঁচে থাকার প্রধান মাধ্যম। নয়তো আমার পড়াশোনাই হয়তো থেমে যাবে। তাই এ প্রকল্পটি শেষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পুরো দল আমরা দিন-রাত কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। রাতে ঘুমাতাম না। খাওয়ারও ঠিক নেই। শনিবার নিলাম এক ঘণ্টার ছুটি। রোববার সকালে আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। হঠাৎ মনে হলো, ল্যাবরেটরিতে কারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনিবাস, যিনি আমাদের কাজের অগ্রগতি দেখছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে আমার পিঠ চাপড়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'আমি জানতাম আমি তোমাকে খুব চাপের মধ্যে রেখেছি। কিন্তু তুমি তোমার নকশা প্রণয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছ।' অধ্যাপক শ্রীনিবাসের দিকনির্দেশনায় আমি এবং আমার দলের প্রত্যেকেই সময়ের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে বুঝতে শিখেছি। আমি বুঝলাম যখন কোনো মানুষ চরমভাবে ঠেকে যায়, তখন তাঁর ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। সেটাই আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আমাদের শিক্ষাটি ছিল, আমাদের বিশেষ দক্ষতা যেটাই হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের পদ্ধতি ও প্রকল্পের প্রয়োজনে প্রস্তুত হতে হবে, যা তাদের নতুন উদ্ভাবন, যন্ত্রনির্মাণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করাতে সচেষ্ট করবে। একজন মহান শিক্ষক সেটাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তস্থ করে দেন।

বন্ধুরা, এ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে কেমন ভারত দেখতে চাও তোমরা? পৃথিবীর মানচিত্রে কীভাবে ভারত তার স্থান ধরে রাখবে? কী ধরনের উন্নত সুযোগ-সুবিধা পেতে চাও ভবিষ্যতে? বিগত বছরগুলোতে আমি বলে চলেছি তরুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কীভাবে ভারতের উন্নয়নের স্তম্ভ নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে। 'পিলারস অব ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট প্রোফাইল-২০২০'-এর মধ্যে কী কী আছে—

একটি জাতি, যেখানে শহর ও গ্রামের মধ্যে কোনো বিভক্তিরেখা থাকবে না। জ্বালানি ও বিশুদ্ধ পানি সমানভাবে বণ্টনের সুযোগ থাকবে; যেখানে কৃষি, শিল্প, চাকরির ক্ষেত্র একই সঙ্গে কাজ করছে। এমন একটি জাতি যেখানে সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মেধাবীকে মানসম্পন্ন

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। একটি জাতি যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাশালী বিদ্বান, বিজ্ঞানী এবং বিনিয়োগকারী অবস্থান করে। যেখানে শাসনপদ্ধতি হবে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত। যেখানে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা হয়েছে, অশিক্ষাকে দূর করা হয়েছে এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা হয়েছে। জাতি হিসেবে এটি উন্নত, স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ, সন্ত্রাসবাদমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সুখী এবং টেকসই উন্নতির পথে ধাবমান এবং পৃথিবীতে বাস করার শ্রেষ্ঠ দেশ এবং যে জাতি তার নেতৃত্বদানে গর্বিত।

এমন ভারতকে পেতে কৃষি এবং খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি এবং নিজস্ব উৎপাদন ও কারিগরি প্রযুক্তি—এই পাঁচটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। বন্ধুরা, অনুগ্রহ করে এ স্তম্ভগুলো মনে রেখো। তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দসই চ্যালেঞ্জ খুঁজে পাবে। প্রতিটি স্তম্ভই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বহন করে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন রূপান্তর একটি আরেকটির পরিপূরক। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তাদের গবেষণাগারগুলো ঘুরে দেখছিলাম, যেখানে পৃথিবীর স্বনামধন্য অধ্যাপকেরা নিয়োজিত থাকেন। আমি দেখছিলাম, কীভাবে অধ্যাপক হংকুন পার্ক তাঁর 'ন্যানো নিডলস' উদ্ভাবন-প্রক্রিয়া বর্ণনা করছিলেন। যা দিয়ে ক্ষুদ্রাতিস্তম্ভ প্রতিটি সেলকে আলাদা করে কাটা কিংবা বিভক্ত করা যায়। এটির সঙ্গে জৈববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমার দেখা হয়েছিল অধ্যাপক বিনোদ মনোহরণের সঙ্গে, যিনি জৈববিজ্ঞানের সঙ্গে 'ন্যানো ম্যাটেরিয়াল' প্রযুক্তির সংগতি নিয়ে কাজ করছেন। আমি দেখছিলাম, কীভাবে একটি গবেষণাগারে দুটি ভিন্ন বিজ্ঞানের শাখা একে অপরকে প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন তৈরি করার পথ খুলে দিচ্ছে। এমনটাই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভাবনের আশা করি। নতুন একটি পথ আজ উন্মোচনের পথে। তা হলো বাস্তুসংস্থানবিদ্যা, সারা পৃথিবীতে যার প্রয়োজন নতুনভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। একুশ শতকে এর নতুন মাত্রা আমাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। তাতে কি

Web: http://tanbircox.blogspot.com

আমরা প্রস্তুত?

বন্ধুরা, আমি গত ১০ বছরে প্রায় দেড় শ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ মিলিয়নেরও বেশি তরুণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিশেছি। তাদের সঙ্গে আমার কথোপকথনে আমার কাছে মনে হয়েছে, একুশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু নতুন দর্শনের জোগান দরকার। জাতির প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের অগ্রপথিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের সংশোধন করতে হবে, যাতে তা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। একজন ভালো শিক্ষক পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় থাকতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্ম করে দেওয়া। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রযুক্তির আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া।

সবশেষে, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা নিজেদের কীভাবে স্মরণীয় করে রাখতে চাও? তোমাদের উচিত, নিজেদের বিশ্লেষণ করে জীবনকে প্রকাশ করা। একটি কাগজে লিখেও রাখতে পারো। সেই কাগজটাই হয়তো মানব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে। তোমাদের জাতির ইতিহাসেও হয়তো ওই একটি পাতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেটা হতে পারে কোনো উদ্ভাবনের জন্য, কোনো কিছু নতুন করে পরিবর্তনের জন্য, আবিষ্কারের জন্য, সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য, দারিদ্র্য নির্মূলে অবদান রাখার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য। আমি নিশ্চিত, তোমরা অবশ্যই অভিনব কিছু করবে। সেগুলো হবে, ধরাবাঁধা গতানুগতিক ধারা থেকে ভিন্ন। সুতরাং কী হবে সেই অভিনব অবদানগুলো? সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শিখতী সানি

অং সান সু চি(মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক)

তরুণদের ভবিষ্যৎ মানে দেশের ভবিষ্যৎ



অং সান সু চি মিয়ানমারের (বার্মা) গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। ১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। জন্ম রেঙ্গুনে, ১৯৪৫ সালের ১৯ জুন। ১৯৬৯ সালে অক্সফোর্ডের সেন্ট হগস কলেজ থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে বার্মিজদের গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য সংগ্রামে নামলেন সু চি। এ জন্য তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। গত ২১ বছরের মধ্যে ১৫ বছরই কেটেছে তাঁর গৃহবন্দী অবস্থায়। গৃহবন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন ১৩ নভেম্বর, ২০১০। ১৯৯৯ সালের ১২ জুন পেনসিলভানিয়ার বাকনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাঁর লিখিত এই ভাষণ বার্মায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত (১৯৮৭-৯০) বার্টন লেভিন পাঠ করে শোনান। বাকনেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট পাওয়া সত্যি গর্বের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সুযোগ পাওয়াও অনেক গর্বের। সমাবর্তন অনুষ্ঠান যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক আনন্দের মুহূর্ত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য সদস্য এবং শিক্ষার্থী ও তাঁদের

পরিবারের মিলনমেলা বসে। কয়েক বছরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার কৃতিত্বের জন্য শিক্ষার্থীদের অভিবাদন জানাতে সবাই সমবেত হন সমাবর্তনে। ওহে গ্র্যাজুয়েটরা, তোমাদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। আমার নিজ দেশ বার্মা (মিয়ানমার)। সেখানে হাইস্কুল পাস করা শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগেরই দুর্ভাগ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়ার স্বপ্ন যেন সেখানে অসাধ্য, অবাস্তব। গণতন্ত্রের জন্য একটি স্বতঃস্ফূর্ত, জাতীয় আন্দোলনকে যখন ১৯৮৮ সালে সেনাবাহিনী দিয়ে দমন করা শুরু হলো, বার্মায় উচ্চশিক্ষা তখন থেকেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছিলেন আন্দোলনের মাধ্যমে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান যাঁরা, তাঁরা হয়তো বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পারছেন। কিন্তু বার্মার হাজার হাজার তরুণ উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ তাঁদের কোনো অপরাধ নেই।

বার্মায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়াটা হতাশার প্রতীকী চিহ্ন। যার কারণে দক্ষ জনশক্তির ও প্রাকৃতিক সম্পদের একটা দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় দুর্দশাগ্রস্ত, সামাজিকভাবে অস্থির ও অর্থনীতিতে হয়েছে হতদরিদ্র। এই হতাশার মূল কারণ জান্তা। ১৯৮৮ সালে বার্মার জনগণ গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে নেমেছিল। তিন দশক আগ থেকে শাসকের আসনে থাকা বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টিকে প্রত্যাখ্যান করার বহিঃপ্রকাশ ছিল সেই আন্দোলন। নিজেদের গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন বার্মিজরা সেদিন এমন একটা সরকার চেয়েছিল, জনগণের কাছে যে সরকারের জবাবদিহি থাকবে। এমনই একটি সরকার গঠন করতে ১৯৯০ সালের নির্বাচনে তাঁরা মূল্যবান ভোট দিয়েছিলেন। জান্তা সেই নির্বাচনের ফলাফল উপেক্ষা করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। সেই থেকে মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য জনগণকে লড়াই করতে হচ্ছে। বিশেষ করে জ্ঞানার্জনের জন্য

সংগ্রাম করছেন তরুণেরা।
এ দাবি কি ন্যায়সংগত নয় যে বিশ্বের সব তরুণের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার আছে বার্মিজ তরুণদেরও? জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস) ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সবারই আছে।' ধারাটি আরও বলছে, 'ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে/উন্নয়নে, মানবাধিকার ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষা দরকার। বোধশক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বের জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে শিক্ষা সাহায্য করবে। এবং শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের কর্মকুশলকে সহযোগিতা করবে।'
সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী, একটি দেশে শিক্ষা গ্রহণ কীভাবে সম্ভব, যে দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্বিত এবং যে দেশে মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং বিদেশিদের সম্পর্কে চালু রাখা হয়েছে এক ধরনের ভীতি আর ঘৃণা?
যেসব দেশে জনগণের উন্নয়নের জন্য যোগ্য যৌক্তিক সরকার আছে, সেসব দেশে বাধাহীন শিক্ষাপদ্ধতি কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়। পাঠ্যসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ, প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতামত প্রদান ও বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে এবং এটাই হওয়া উচিত। কোনো ধরনের বাধাবিপত্তি ছাড়াই তরুণেরা যেন ছোট স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন, একটি সমাজ ও তার রাজনৈতিক অবকাঠামোতে এটিই সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তাহলে শিক্ষাকে অধিকার বলে দাবি তোলার আর দরকারই পড়বে না। তাই এই সমাবর্তনে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সবার কাছে চাওয়া, আমার দেশ নিয়ে আপনারাও একটু ভাবুন। সেখানে শিশুরা ও তাদের মা-বাবারা সংগ্রাম করেন শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য।
আমাদের তরুণদের নিয়ে সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন, যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বন্ধ করে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, তরুণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার মানে দেশেরই ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার।

শিক্ষার মানে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনই নয়। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদে বলা হয়েছে, 'শিক্ষা হলো অন্যকে বোঝার ক্ষমতা, সহনশীলতা ও বন্ধুত্ব।' বিশ্বশান্তি রক্ষায় এগুলোই তো মূল উপাদান। আমি বারবার দেখেছি, এই ধারণা ও অন্যান্য নীতিবিধান যা আমাদের মানবিক হতে সাহায্য করে, আমাদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। বাকনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বার্মার দীর্ঘ ১৪০ বছরের বন্ধুত্ব। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের মধ্যে অটুট বন্ধনই প্রমাণ করে যে শেখার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে।

যতটুকু সম্ভব, বাকনেল বার্মার জন্য বন্ধুত্ব দেখিয়েছে। আমাদের দেশ ও তার মানুষ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অন্যান্য সমস্যায় বাকনেল পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা হলো একে অপরকে বোঝা এবং বিপদে সাহায্য করার মানসিকতা থেকে আমরা ভৌগোলিক সীমারেখা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে উপেক্ষা করে পারস্পরিক সহভাগিতা গড়ে তোলা। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এমন একদিন আসবে, যেদিন বার্মার জনগণও বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পারিস্পরিক সহভাগিতা গড়ে তুলবে। আজকের এই সমাবর্তনে যাঁরা আমার দেশের মানুষ উপস্থিত আছেন, আশা করব, তাঁরা বিশ্ববাসীকে এটাই দেখাবেন যে শান্তিকামী, সত্যিকারের উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে বার্মাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচারের সেই বার্মায় থাকবে স্বাধীনতা। প্রস্ফুটিত হবে শিক্ষার আলো।

হিউম্যানিটি ডট অর্গের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ জাহাঙ্গীর আলম

Web: http://tanbircox.blogspot.com

বেনজির ভুট্টো (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)

আত্মবিশ্বাসী মানুষই সফল হয়



বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। বেনজির ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত অক্সফোর্ডের লেডি মার্গারেট হল থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেন। এলএমএফ শেষে অক্সফোর্ডের সেন্ট ক্যাথরিন কলেজ থেকে ডিগ্রি নেন তিনি এবং এশিয়ার প্রথম নারী হিসেবে 'অক্সফোর্ড ইউনিয়ন বিতর্ক সোসাইটি'র সভাপ্রধান নির্বাচিত হন।

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৫৩ সালের ২১ জুন পাকিস্তানের করাচিতে তাঁর জন্ম।আমার বাবা ছিলেন আমার সারা জীবনের অনুপ্রেরণা। আমি যখন আমার পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে তাকাই, দেখি তখন প্রচণ্ডভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল, নারীদের প্রতি চরম বৈষম্য প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল। আর বাবা ছিলেন সব সময়ই এর বিরুদ্ধে। আমার মা ছিলেন সব ক্ষেত্রে পারদর্শী একজন নারী। করাচির রাস্তায় তিনি ছিলেন প্রথম একজন নারী, যিনি একা গাড়ি নিজেই চালাতেন। কিন্তু মা শেখাতেন, একজন নারী বিয়ে আর সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন-পালনের জন্যই তৈরি হয়। মা বাবাকে বলতেন, কেন তুমি ওকে পড়াশোনা শেখাচ্ছ? কোনো পুরুষই তো আর তাকে বিয়ে করবে না। সেই সময়ে মায়ের কাছে নারীর সফলতা মানেই ছিল, কীভাবে সে একজন ভালো স্বামী পেতে পারে, সন্তান বড় করতে পারে। অথচ আমার বাবা এসব কিছুকে পাত্তাই দিতেন না। উল্টো সব বাধা ভেঙে দিয়ে আমার উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বদা

সচেষ্টা থেকে গেছেন। বাবা বলতেন, 'ছেলে ও মেয়ে সবাই সমান, আমি চাই আমার মেয়ে সেই সব সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, যা একজন ছেলেকে দেওয়া হয় এবং যা মেয়ে হিসেবে ওর প্রাপ্য।'

বাবাকে কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, কেন তিনি এমনটা ভাবতেন। আমার সুযোগ হয়নি সেটা জানার। বিশ্ববিদ্যালয় শেষে আমি যখন ফিরে এসেছিলাম তখন তিনি জেলে ছিলেন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। আমার এক বান্ধবী ছিল, যার বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম—তারা তাদের ভাইয়ের খাওয়া শেষ না হলে খেতে পেত না। তাদের খাওয়া হলে পড়ে থাকা এঁটো খাবার বাড়ির মেয়েরা খেত। আমাদের বাড়িতে তেমনটা কখনোই হতো না। আমি টেবিলের প্রধান আসনে বসতাম, কারণ আমি পরিবারের বড় ছিলাম। বাবা আমাকে এটা শেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে মেয়েরা কোনোভাবেই পৃথিবীর হেয়প্রতিপন্ন প্রাণী নয়।

আমাকে জীবন সম্পর্কে আরও শিখিয়েছিলেন আমার নানরা। ছোটবেলায় আমি পড়তাম মিশনারিজ স্কুলে—কভন্যান্ট অব জোসেফ অ্যান্ড ম্যারি। মনে আছে, 'মাদার ইউজিন' আমাকে নিয়ে যেতেন সাহিত্য আর কাব্যের জগতে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন চাঁদ গ্রহপুঞ্জের সঙ্গে। এটা এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল, যে কেউ চাঁদ আর নক্ষত্রকে জয় করতে চাইবে। তাই আমার জীবনের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের তালিকায় আছেন, আমার বাবা এবং মাদার ইউজিন।

আমি ভালো ছাত্রী ছিলাম। আমার বাবা সব সময়ই পড়াশোনার ওপর বেশি জোর দিতেন এবং আমি দেখতাম, তিনি কতটা সন্তুষ্ট হতেন আমার ভালো ফল দেখে। আমি অনেক বেশি পরিশ্রমী ছিলাম এবং সবকিছু খুব ভালোবেসে শিখতে চাইতাম।

'আমার মনে হয়, আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো কেটেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি সেখানে এমন সময়টায় ছিলাম, যখন সেখানকার সমাজে একটা অভাবনীয় বদল

লেগেছিল। এমন একটা সময়, যখন ভিয়েতনাম-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমি যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলাম এবং আমি দেখেছিলাম, আমার আমেরিকান সহপাঠীরাও এ যুদ্ধের তীব্র বিপক্ষে ছিল। তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে নেমেছিল। আমি শিখেছি, যদি তুমি কোনো কিছুকে না সমর্থন করো, তাহলে তা রুখতে তুমিই ভূমিকা রাখতে পারো। আমি সে সময়টায় দেখেছি রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিংকে এবং দেখেছি আদর্শবাদকে, সিজার শাভেজ এবং শ্রম অধিকার নিয়ে আন্দোলনকে। তাই আমি ছিলাম পৃথিবী, সমাজ ও মানুষকে বাঁচানোর দলে। তখন সবাই এই বাঁচানোর দলে প্রাণপণ নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম, পুঁথিগত শিক্ষার গুরুত্ব নেই। পরীক্ষার কোনো দরকার নেই। যদিও আমি পড়তাম, পরীক্ষা দিতাম, আমার বাবার কথা চিন্তা করে। কিন্তু একটা সময় আমি আবিষ্কার করি পড়াশোনা, বাড়ির কাজ, টিউটোরিয়াল সব বাঁধাধরা গণ্ডি—এসব কিছু ছাড়াও জীবনে আরও অনেক বৃহৎ আলোচ্য বিষয় আছে, ক্ষেত্র আছে, যেখানে আমাদেরই ভূমিকা রাখতে হবে।

তখন নারী অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কেট মিলেট কেবল তাঁর বই লিখলেন, যা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। কথা বলেছি, নারী এবং তাঁর সাফল্য নিয়ে। আমার এক অসম্ভব প্রিয় বন্ধুর কথা মনে আছে—ইউন্ডি লেসার। আমরা অনেক সময় ধরে আলাপ করতাম। কীভাবে নারী সফল হবেন? কীভাবে সে বাধা তাঁরা প্রতিরোধ করবেন? তখন অনেক নারীই মনে করতেন, তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য পেশা-ভাবনা নয়, বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

হার্ভার্ড-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোই আমি পাকিস্তানে নিয়ে আসি আমার সঙ্গে। কেন আমরা আমাদের সরকার কিংবা সরকারব্যবস্থাকে বদলাতে পারব না। আমি দেখেছি, নিক্সনকে কীভাবে ইমপিচ করা হয়েছিল ওয়ারগেট কেলেঙ্কারিতে। আমি দেখেছি, গণতন্ত্র কতটা ক্ষমতাবান। এটা

সত্যিই অনেক প্রভাবশালী। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমি নিজে আমার ক্ষমতাকে অনুভব করতে পারি। আমি জানি, আমার কথাকে মূল্য দেওয়া হবে এবং সবাইকে। এখানে স্থান দেওয়া হয় সবাইকে। আমার বিদেশে উচ্চশিক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে বাবা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেমে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের সব সাধারণ মানুষকে আত্ম-অধিকারে সচেতন করতে চেয়েছিলেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, সেনা শাসকদের বিরুদ্ধে। আমি যখন পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলাম, এসব অভিজ্ঞতাই আমাকে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি, গণতন্ত্র কীভাবে সফল হতে পারে, সেটা পাকিস্তান কিংবা আমেরিকা, যেখানেই হোক না কেন।

যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমি সব সময় সংঘাত, হানাহানি, রক্তপাত—এসব কিছুর বিরুদ্ধে ছিলাম। পঞ্চাশের দশকে মানুষের বিনোদনই ছিল শিকারে যাওয়া, শিকার করা। একবার আমার বাবা ও ভাইদের শিকারে একটা টিয়াপাখি গুলির আঘাতে মাটিতে আছড়ে পড়ে। আমি তার রক্ত সহ্য করতে পারছিলাম না। হাস্যকর শোনাতে পারে। কিন্তু আমি ওই পাখিটার কথাই ভাবছিলাম, কেন তাকে এমন পরিণতি মেনে নিতে হবে। পরিহাসই বটে—ফাঁসির দণ্ড শোনার পর আমার বাবা বলে উঠলেন, 'আমার সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে পড়ছে, যে একটা পাখির জন্য কেঁদেছিল। আজ সে কী করবে?'

আমার বাবার মৃত্যুটাও আমাকে অনেকভাবে তৈরি করেছে। আমি আমার বাবার আত্মত্যাগ, সে সময়ে অন্যায়ভাবে নিহত সবার আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দিতে চাইনি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শুধু একজন নারী হিসেবে নয়, মাত্র ৩৫ বছরে মুসলিম একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারার তৃপ্তিটা ছিল এমন যে এ বিজয় নারীদের সবখানে। এ জয়ের পর আমার কাছে অনেক নারীর চিঠিও এসেছে—দেশের বাইরে থেকে, দেশের ভেতর থেকে, যে নারী হিসেবে দেশ চালানো ঠিক নয়। আমি জানি না,

www.facebook.com/tanbir.ebooks
কেন? এটা আসলেই বিচিত্র মানুষের পৃথিবী। আমার মনে আছে, সেই নারীর কথা, যে বিমানচালক হতে চেয়েছিল। সাক্ষাৎকারে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হয়, 'ফিরে এসো, যখন আমাদের এখানে একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হবে।' এ বিজয়ের পর সত্যিই সেই নারী ফিরে গিয়েছিল এবং পাইলট হতে পেরেছিল। বিতর্ক আরও উঠেছিল। আমার রাজনৈতিক আদর্শও বিতর্কের বাইরে ছিল না। কিন্তু আমি এসব কিছুর সঙ্গে লড়েছি, আমার এজেন্ডাগুলোর সঙ্গে। এজেন্ডাগুলো ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, দারিদ্র্য দূর করার জন্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। এবং আমরা সফল হয়েছিলাম। সমালোচনাও সব সময় ছিল। কিন্তু আমার প্রথম নির্বাচনের পর আমি শিখেছিলাম, সমালোচনাকে গ্রহণ করতে হয়।আমি দেখেছি, গণতন্ত্র কতটা ক্ষমতাবান, গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে কতটা ক্ষমতা জাগিয়ে দেয়। জীবনে আমাদের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু আমি মনে করি, নেতৃত্বই নির্ধারণ করে দেয় আমাদের ক্ষমতাকে—কতটুকু হারকে মেনে নেব এবং কীভাবে হারকে পরাভূত করব। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে থাকার পর আমি দৃঢ়ভাবে এই উপসংহারে আসি, যে সফল হয় এবং যে হেরে যায়, তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো কে তার সফলতা কিংবা বিফলতাকে কতটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং সেখান থেকে ফিরে আসার ক্ষমতা রাখে। কারণ সফল হওয়ার এই অভিযাত্রায়, সেখানে বিপর্যয় থাকবে, হতাশায় মুহ্যমান হওয়া মানুষ থাকবে এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ থাকবে যারা বলবে—না, আমরা এগিয়ে যাব। এটিই বিফলতাকে জয় করার আসল ক্ষমতা।অ্যাকাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট থেকে পাওয়া। ২০০০ সালের ২৭ অক্টোবর দেওয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখিত সানী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

লক্ষণ কাদিরগামার(শ্রীলংকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী)

আজ হেরেছ, কাল জিতবে



লক্ষণ কাদিরগামার শ্রীলংকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ২০০৫ সালে তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালের ১২ এপ্রিল। ২০০৪ সালে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফরকালে লঙ্কান ক্রিকেটারদের সম্মানে দেওয়া এক নৈশভোজে তিনি এ বক্তৃতা করেন।খুঁতখুঁতে ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন, ক্রিকেট আসলেই এক জঘন্য রাজনৈতিক কৌশল। খেলার ছদ্মবেশে তা আসলে যুদ্ধেরই বদলা। প্রজারা যাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ছেড়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তার জন্য ধুরন্ধর ব্রিটিশরা এটা আবিষ্কার করে। দুনিয়া দুই শিবিরে বিভক্ত—একদল ক্রিকেটের মারপ্যাঁচে মজা পায়, আরেকদল এর ফেরে পড়ে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না হাজার হাজার— এখন তো দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ দর্শকের তুমুল হাততালির জন্য একদল তেজি যুবক কেন তপ্ত সূর্যের নিচে অথবা কাঁপানো শীতের মধ্যে খোলা মাঠে একটি বলের পেছনে ছোটে বা লাঠি দিয়ে বারবার তাকে পেটায়। যারা ইতিমধ্যে এর জটিলতায় হতভম্ব, এই খেলার রহস্যময় ভাষায় তারা আরও বিভ্রান্ত হয়।অ-ক্রিকেটীয় বিশ্ব যেমন আমেরিকা, চীন, ইউরোপ ও রাশিয়ায় গেলে বোঝাতে বোঝাতে আমি হয়রান হয়ে যাই, ‘গুগলি’ কোনো ভারতীয় মিষ্টির নাম না; ‘স্কোয়ার কাট’ মাংসের কোনো পছন্দের টুকরা না; বাগানের একপাশের চত্বর না ‘কভার ড্রাইভ’; ‘বাউন্সার’ নাইট ক্লাবের পেশিবহুল দারোয়ান নয়; ‘ইয়র্কার’ ইয়র্কশায়ারের কোনো চমৎকার ককটেল না; অথবা ‘লেগ ব্রেক’ নয় প্রতিপক্ষের কোমরের নিচটা ভাঙার কুশলী চাল।

এবার দেখা যাক, ক্রিকেট আর রাজনীতির মধ্যে কোনো মিলের ব্যাপার আছে কি না। সন্দেহ

নেই, দুটিই খেলা। বাইরের দিক থেকে রাজনীতিবিদ ও ক্রিকেটারদের একই রকম লাগলেও, তারা বিস্তর আলাদা। নিষ্ঠুর জনতা উভয়কেই উসকায়, আজ তাদের অভিনন্দন জানায় তো কাল একেবারে ছুড়ে ফেলে। কঠিন খাটুনি যায় ক্রিকেটারদের; আর রাজনীতিবিদেরা পরিশ্রমের ভান করেন। ক্রিকেটাররা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন, রাজনীতিবিদেরা করেন বিভক্ত। ক্রিকেটাররা শৃঙ্খলাবদ্ধ; বেশির ভাগ রাজনীতিবিদ এর সঙ্গে অপরিচিত। ক্রিকেটাররা জয়ের স্বার্থে হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি নেন; আর রাজনীতিবিদেরা আপন স্বার্থে সমর্থক ও বিরোধীদের হাত-পা-জীবন নষ্টের পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেরা নিরাপদ থাকেন। ক্রিকেটাররা যোগ্যতাবলেই পুরস্কার পান; আর জনগণ যেমন, পুরস্কার হিসেবে তেমন রাজনীতিবিদই তাঁরা পান। ক্রিকেটাররা অন্যায্য হলেও আম্পায়ারের রায় মেনে নেন; আর রাজনীতিবিদেরা অপছন্দের বিচারকদের বদলি করে দেন। ক্রিকেটাররা জয়-পরাজয়ে দল ছাড়েন না, রাজনীতিবিদেরা প্রায়ই হারু পাট্টি ছেড়ে জয়ী দলে নাম লেখান। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ক্রিকেটাররাই ভালো জাতের। বলা হয়, দেশের খাতিরে বিদেশে অনর্গল মিথ্যা বলা পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাজের অংশ। কথাটা হয়তো সত্যি। আরো বেশি সত্যহলো, তাঁকে সব সময়ই স্বদেশের জন্য লড়তে হয়, দেশের সাফাই গাইতে হয়। আমাদের ক্রিকেটারদের হয়তো মনে পড়বে, ১৯৯৫ সালে বিশ্বকাপ-পূর্ব প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য কলম্বোয় আসতে অস্বীকার করে বসে অস্ট্রেলিয়া। শেন ওয়ার্ন বলেছিলেন, তিনি কলম্বোয় আসবেন না, কারণ সেখানে তিনি কেনাকাটা করতে পারবেন না। সাংবাদিকেরা আমাকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে বললে আমি বলি, 'কেনাকাটা মেয়েদের কাজ'। প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ায়...এক টেলিভিশন থেকে প্রশ্ন করা হলো, আমি কখনো ক্রিকেট খেলেছি কি না। বললাম, আপনার জন্মেরও আগে খেলেছি—হেলমেট ও থাই গার্ড ছাড়াই গর্ত আর পাথরভর্তি খোদরা-বোদরা ম্যাট উইকেটে;

অনেকগুলো ভাঙা হাড় তার সাক্ষী। আমার বন্ধু অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিবাদে নাক গলালেন এবং আমাকে ফোন দিলেন। দুজনে মিলে ঠিক করলাম, উত্তেজনা প্রশমিত করতে হবে। শিগগিরই ভারত-পাকিস্তানের যৌথ ক্রিকেট দল কলম্বো এসে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের দিন একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলল। সেটা ছিল দক্ষিণ এশিয় সংহতির এক ঝলমলে নজির। কঠিন নিরাপত্তা হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আমি পাকিস্তানি ও ভারতীয় বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাতে মাঠে গেলাম। ঝামেলা কেটে গেলে আমি আমার অস্ট্রেলীয় প্রতিপক্ষকে এক তোড়া ফুল পাঠালাম। ফুলও তো মেয়েদের জন্য।পরিষ্কার মনে আছে, অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে মুরালিধরনকে বল ছুড়ে মারার দায়ে অভিযুক্ত করা হলো। অর্জুনা রানাতুঙ্গা তখন পুরো দল নিয়ে বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন; অবশ্য চালাকি করে মাঠের সীমাটা ডিঙালেন না। কলম্বোয় বসে আমি দৃশ্যটা টেলিভিশনে দেখছিলাম। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, অর্জুনার জায়গায় থাকলে আমি কী করতাম? মনের ভেতরে মুরালির প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন টের পেলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন বেজে উঠল, ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পরামর্শ চান। বললাম, অর্জুনা উচিত কাজই করেছেন। কারণ অধিনায়ক হিসেবে মাঠের মধ্যে অবশ্যই তাঁকে দলের সবার পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের বাঁচাতেও হবে। তবে, এর পরিণতি যাতে বেশি দূর না গড়ায় সেটাও দেখতে হবে। ভালো উকিল নিয়োগ করতে হবে এবং অবশ্যই একটা আপসে পৌঁছাতে হবে। তাই-ই করা হয়েছিল। শ্রিলঙ্কার ক্রিকেট দলের ওই সফরের সময়েই আমিও সরকারিভাবে অস্ট্রেলিয়ায় গেলাম। আমার বন্ধু, সেই অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ডিনার বক্তৃতায় পরদিন ফাইনাল খেলা দেখতে তাঁর সঙ্গে তাঁর শহর আদেলাইদে যাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন। জবাবে বললাম, অস্ট্রেলিয়া 'এক চুলের জন্য জিতেছে' এই কথা বলবার জন্য আমি সেখানে যাব না। পরিকল্পনামাফিক, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার খাতিরে পরের দিনই দেশে ফিরে

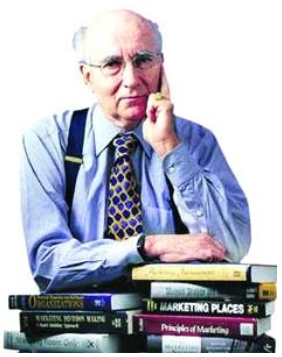
এলাম...।
পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মাঝেমধ্যে কঠিন সব পরিস্থিতিতে পড়েন। উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাই ধরুন। প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন তাঁকে জানালেন, তিনি দেশের নাম বদলে ইদি রাখতে চান। মন্ত্রীকে বলা হলো, দুই সপ্তাহের মধ্যে দুনিয়াজুড়ে এর পক্ষে প্রচার করে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু মন্ত্রী সেটা করলেন না। তাঁকে তখন তলব করে ব্যাখ্যা চাওয়া হলো। তিনি বললেন, 'জনাব প্রেসিডেন্ট, আমি শুনেছি সাইপ্রাস নামে একটা দেশ আছে। লোকে এর নাগরিকদের সাইপ্রিয়ট বলে; আমরা আমাদের দেশের নাম বদলে 'Idi' রাখলে আমাদের নাগরিকদের তো সবাই 'Idiot' ডাকবে। প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ মতি বদলালেন।
গল্প চালু আছে, এক হাঙরকে প্রশ্ন করা হলো, খাবার হিসেবে কেন সে কূটনীতিকদের পছন্দ করে। তার জবাব: 'তাদের মগজ ছোট হওয়ায় খেতে স্বাদ বেশি, মেরুদণ্ড নরম হওয়ায় আরাম করে মজ্জা চুষে খেতে পারি আর তাদের পাওয়া মদে চুবানো অবস্থায় পাওয়া যায় বিধায় খাওয়ার সুখটাই হয় অন্যরকম'।
ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষে আমি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দলের উদ্দেশে কিছু বলতে চাই। আজ আমরা একটা খেলায় হেরেছি। কিন্তু আমরা হেরেছি বৃষ্টি আর 'ডাকওয়ার্থ ও লুইসে'র দোষে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক উচ্ছ্বসিত বিজয় পেয়েছ। আবার তোমরা কালকে জিতবে। মনোবল ও চেতনা অটুট রাখাই সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ এখন।
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা সবাই, তোমাদের দেশবাসী নারী ও পুরুষ, সবাই তোমাদের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, পেশাদারি ও সংকল্প দেখে দারুণভাবে প্রভাবিত। জনগণ তোমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সবাই জানি, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতা শাণিত করায় ব্যস্ত রয়েছ। দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের শারীরিক সামর্থ্যও বেশ ভালো। এসব দেখে মানুষ অগাধ আনন্দ তো পায়ই, পাশাপাশি তাদের নৈতিকতাও জোরদার হয়। তারা জানে, শ্রীলঙ্কানরা লাগাতার নৈপুণ্য

www.facebook.com/tanbir.ebooks
দেখানোর চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম।
সব দলই হারে। খেলতে তো দুই পক্ষই লাগে। এদের একজনকে হারতে হয়। তোমরা যে ধাঁচে খেলবে, তাই দেবে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। দেখেও সুখ, একেবারে তরুণদেরও নিয়মিতভাবে জাতীয় দলে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দল ঐক্যবদ্ধ। এর ইতিবাচক প্রভাব দেশের সব জাতি ও ধর্মের মানুষের ওপরও পড়ে।
আজকের দিনে, বিশ্বের আর সব খেলার মতো ক্রিকেটও অতিমাত্রায় প্রতিযোগিতামূলক; এবং এটাই হওয়া উচিত এ রকমটাই থাকা উচিত। খেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা সব সময়ই এক মার্যাদার ব্যাপার। তোমরা সবাই আমাদের তরুণদের আদর্শ। কীভাবে তোমরা পরাজয়কে নিচ্ছ, তারাও তা দেখতে আগ্রহী। জয়ে আত্মহারা হওয়া সহজ; কিন্তু পরাজয়ের মুখেও স্থির থাকা পরিপক্কতার লক্ষণ। সৌখিন সমালোচকদের নিন্দামন্দকে একদম পাত্তা দেবে না। তারা অনেক তত্ত্ব কপচিয়ে বলবে, কীভাবে খেললে জয় আসতো। কিন্তু তাদের অনেকেই জীবনে একবারও ব্যাটে বল লাগাতে পারেনি। সৌখিন সমালোচনা তাদের অবসরের বিনোদন।
কমে আসা আলোয় ফাস্ট বোলিংয়ের মুখোমুখি হওয়া কেমন, তা তারা জানে না; শতেক প্রতিকূলতার মুখে রান বাড়িয়ে যাওয়ার সংগ্রাম কীরূপ তা তারা বুঝবে না। খেলার মাঠে লম্বা সময় জুড়ে পরিশ্রমের ক্ষমতা ও শারীরিক সক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার সমস্যা কী, তা তারা জানবেও না কোনোদিন। আধুনিক যুগে খেলোয়াড়দের কী পরিমাণ মানসিক চাপ বহন করতে হয়, তার খোঁজ তারা রাখে না। তাই, তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ, ওদের উপেক্ষা করো। শৃঙ্খলা বজায় রাখ এবং নিয়ম মেনে পরের খেলার জন্য তৈরি হও।
এখানে আমন্ত্রিত হওয়ার সময় কেউ আমাকে বলেনি যে, খাওয়ার শেষে একটা বক্তৃতাও করতে হবে। এসে বুঝলাম, বিনা প্রতিদানে আজকাল ডিনারও পাওয়া যায় না!
সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: ফারুক ওয়াসিফ

Web: http://tanbircox.blogspot.com

ফিলিপ কটলার(বিপণণ-গুরু নামে খ্যাত)

শূন্য থেকেও শুরু করা যায়



বিশ্বব্যাপী বিপণণ-গুরু নামে খ্যাত ফিলিপ কটলারের জন্ম ১৯৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ক্যামব্রিজ মার্কেটিং কলেজের মার্কেটিং-বিষয়ক এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে ১৯৯৭ সালের ৭ আগস্ট ফিলিপ কটলার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এই বক্তৃতা দেন

সবাইকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই। যুক্তরাজ্যের মার্কেটিং শেখার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজের একঝাঁক মেধাবী বিতার্কিক, শিক্ষার্থী এবং সেই সঙ্গে সম্মানিত শিক্ষকেরা আজ আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আমার সামনে অপেক্ষা করছেন, ভাবতেই ভালো লাগছে। এত বেশি মানুষের সামনে কথা বলতে পারার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই অতুলনীয়।

ভালো যেমন লাগছে, সেই সঙ্গে আরেকটা কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। সে অনেক দিন আগের কথা। আমি আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম আমেরিকান একটি বিপণন-প্রতিষ্ঠানে। ওখানে গিয়ে আমি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, আমার সামনে দর্শকসারিতে মাত্র একজন বসে বসে আমার কথা শুনছিলেন। হাস্যকর হলেও সত্যি যে সেই অবস্থায়ও মাইকে কথা বলে যাচ্ছিলাম আমি। হাজার হলেও আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলে কথা! তা যা-ই হোক, আমার জন্য তখনো আসলে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আমি আমার বক্তৃতা শেষ করে যেই না হল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করেছি, অমনি আমার সামনে বসে থাকা সেই দর্শক আমাকে থামালেন। 'আপনি এখন যেতে পারবেন না!' আমি তো আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, কেন যেতে পারব না? তখন তিনি আমাকে যা বললেন, তা

শুনে আমি হাসব না কাঁদব, ভুলে গেলাম। আপনারা কি জানেন, তিনি আমাকে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যেতে পারবেন না, কারণ, আপনার পরে আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা। আপনি চলে গেলে আমার বক্তৃতা শুনবে কে?'

যা-ই হোক, আজ যে সে রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো না, তা ভেবে বেশ ভালোই লাগছে। ক্যামব্রিজ মার্কেটিং কলেজের মতো জায়গায় মার্কেটিং-সম্পর্কিত আমার নিজের কিছু ধ্যান-ধারণা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে আমার খুব ভালো লাগবে।

প্রথমেই বলব চলমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মার্কেটিংকেও এগিয়ে যেতে হবে। কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এখন আর অঢেল সম্পত্তির দরকার হয় না। একেবারে শূন্য থেকেও তা শুরু করা যায় নিজের মধ্যে মার্কেটিংয়ের কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকলে। এ ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং কাজ করে ম্যাজিকের মতো। আমি এখন নিউইয়র্কের একজন ভদ্রলোকের কথা শোনাব তোমাদের। তিনি একদিন নিউইয়র্কের এক বড় ফ্যাশন হাউসে একটা সুন্দর সোয়েটার নিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে তিনি মালিকপক্ষকে জানালেন, তিনি এ রকম ভালো মানের আরও অনেক সোয়েটার তাদের দিতে পারবেন মাত্র ১০ ডলার দরে। আর ফ্যাশন হাউসগুলো তাদের ক্রেতাদের কাছে তা ২৫ থেকে ৩০ ডলারে বিক্রি করতে পারবে। সেই ফ্যাশন হাউস ভদ্রলোকের এই শর্তে রাজি হয়ে গেল। এবার লোকটি সোয়েটারের নির্মাতা হংকংভিত্তিক একটি গার্মেন্টসে যোগাযোগ করে মাত্র সাত ডলার মূল্যে অনেকগুলো সোয়েটারের অর্ডার দিলেন। তারপর একটি জাহাজ কোম্পানিতে সোয়েটারগুলো নিউইয়র্কে সরাসরি ফ্যাশন হাউসে চালান দেওয়ার অর্ডার দিলেন। এভাবেই সেসব মালামাল পৌঁছে গেল জায়গামতো। মাঝখান থেকে ভদ্রলোক কিছু অর্থ উপার্জন করলেন। এমনকি ওই সব মালামাল রাখতে কোনো গুদাম ভাড়া করার খরচও দরকার হলো না ওই ভদ্রলোকের।

তোমরা সবাই কমবেশি 'নাইকি'র নাম শুনেছ। 'নাইকি' কী করে জানতে চাইলে তোমরা হয়তো সবাই বলবে, নাইকি বিশ্বমানের উন্নত জুতা তৈরি করে। কিন্তু আমি যদি বলি, না। নাইকি কোনো জুতা তৈরি করে না। সত্যিই নাইকি কোনো জুতা তৈরি করে না। নাইকির জুতা তৈরির কোনো কারখানা নেই বিশ্বের কোথাও। তারা শুধু উন্নত মানের জুতার নকশা বানায় তাদের ল্যাবে। এরপর সেগুলো সঠিকভাবে বিপণন করে বিশ্বব্যাপী। কী! আশ্চর্য হচ্ছো তো? এটাই তো আসলে আউটসোর্সিংয়ের নিয়ম। তুমি একটা কিছু তৈরি করতে পারো যে খরচে, তার চেয়ে অনেক কম খরচে আরেকটি কোম্পানি যদি সেই একই জিনিস তৈরি করতে পারে, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, কেন তুমি বেশি খরচ করে সেই জিনিসটা বানাবে? তুমি তো তাদের কাছ থেকে সেই জিনিসটা কিনে নিয়ে বিপণন করলেই পারো। অর্থাৎ তোমার কোনো বড় কারখানা লাগবে না, অনেক বেশি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে না। শুধু সুন্দর সময়োপযোগী বিপণনব্যবস্থা জানলেই চলবে। তবে মনে রেখো, মার্কেটিং মানে শুধু ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন নয়, ক্রেতারা কী চায়, কীভাবে চায়, কেন চায়, ক্রেতারা তাদের পয়সা ঠিকভাবে উসুল করতে পারছে কি না, তা নিশ্চিত করাও তোমাদের দায়িত্ব। ইউরোপের একটা এয়ারলাইনসের কথা বলি। সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইনসের স্লোগান হলো, 'লেস ফর মাচ লেস!' (কম সেবা আরও অনেক কম দামে!)। বিষয়টা খুলেই বলি। আমরা বিমানে ভ্রমণের সময় প্রকৃত ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া গুনতে হয় বিমানে পরিবেশিত খাবারের জন্য, এয়ার হোস্টেসের সহযোগিতার জন্য, মালপত্র রাখতে কেবিন ক্রুদের সাহায্যের জন্য, টিভি দেখার জন্য বা গান শোনার জন্য। এখন তুমি যদি ভ্রমণের সময় খাবার খেতে না চাও, টিভি দেখতে না চাও, নিজের মালামাল নিজের কাছেই গুছিয়ে রাখতে চাও নিজ দায়িত্বে, আর এর বিনিময়ে ওসব বাবদ বিবিধ চার্জ বাদ দিয়ে কম ভাড়ায় যেতে চাও, তাহলে তা কি সম্ভব? অন্য কোথাও সম্ভব না হলেও সাউথ ওয়েস্ট

এয়ারলাইনসের বিমানে তা সম্ভব। এই বিমানে তুমি শুধু ভ্রমণ করতে পারবে। কোনো খাবার পরিবেশিত হবে না, গান শোনা, টিভি দেখা যাবে না, নিজের ব্যাগ নিজেকেই রাখতে হবে, এয়ার হোস্টেস থাকবে না। কিন্তু ভাড়া অন্য যেকোনো এয়ারলাইনসের তুলনায় অর্ধেক! এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে গ্রাহককে কোনো কিছু যেকোনোভাবে গছিয়ে দেওয়াটা মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্য নয়। সঠিক নীতি বজায় রেখে সুষ্ঠু বিপণন করেও সফল হওয়া যায়।
আর বেশি কথা বাড়াতে চাই না। আমরা কেউ আসলে সঠিকভাবে জানি না যে আমরা আসলে বিপণনকর্মীরাই (মার্কেটিয়াররা) কি বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে গেছি, নাকি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং চরম প্রতিযোগিতামূলক বাজার এই কৃতিত্বের দাবিদার? কারণটা যা-ই হোক না কেন, তোমাদের মানে ভবিষ্যৎ বিপণনকর্মীদের বড় দায়িত্ব হলো, মার্কেটিংয়ের নৈতিকতা সঠিকভাবে অনুসরণ করে বিশ্বব্যাপী আরও নতুন বিপণনক্ষেত্র (বাজার) সৃষ্টি করা। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।
সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত
অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

শিশুরাই হতে পারে সামাজিক বিপণনের দূত

বিশ্বব্যাপী বিপণন-গুরু হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক ফিলিপ কটলার। তাঁর নতুন মিশন সামাজিক বিপণন। এটি কীভাবে সমাজকে বদলে দিতে পারে, সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তা-ই শুনিয়ে গেলেন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব বিপণন সম্মেলনে (ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং সামিট)। ১ মার্চ গণমাধ্যমের কর্মীদের সামনে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন।
আমি বিশ্ব বিপণন সম্মেলন ও সামাজিক বিপণন নিয়ে কিছু কথা বলতে আপনাদের সামনে এসেছি। বর্তমানে গণমাধ্যম সমাজের খুবই প্রভাবশালী একটি অনুষঙ্গ। নানা বিষয় মানুষকে জানানোর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা সমাজকে এগিয়ে নিচ্ছেন।
বর্তমানে বিপণন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনকার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
বিপণনব্যবস্থায় বিদ্যমান পণ্য সম্পর্কে জানাতে হয়। কোনো একটি ধারণা তৈরি ও এর প্রসার ঘটাতে হয়। মানুষকে ওই ধারণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হয়। মূলত পণ্যের সঙ্গে ভোক্তাদের সংযোগ তৈরি করাই বিপণনের মূল লক্ষ্য। এখনকার বিপণনব্যবস্থায় যে জিনিস উপেক্ষিত তা হলো, কীভাবে আরও উন্নত জীবনযাপন করা যাবে, কীভাবে জীবনযাপনে সন্তুষ্টি আনা যাবে সেটি বিপণনে থাকছে না। এ জন্যই প্রয়োজন সামাজিক বিপণন।

সামাজিক বিপণন হচ্ছে একটা নতুন বিপণনব্যবস্থা, যেখানে সামাজিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটি এমন একটি কৌশল, যা মানুষ ও সমাজের ভালোর জন্য ব্যবহৃত হবে। সামাজিক বিপণন অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা সমাধানের কার্যকর পন্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পরিবার পরিকল্পনার কথা। বাংলাদেশে অনেক পরিবারই জন্মনিয়ন্ত্রণ করে না, বেশি সন্তান নেয়। কীভাবে তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো যায়, সে বিষয় নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। নানা কর্মকাণ্ড ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো যায়। এটি সামাজিক বিপণন।

তামাক ও মদের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে, জুয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। দরিদ্র মানুষের জন্য ধূমপান শুধু অর্থের অপচয়ই নয়, স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। অনেকেই মদে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানে না। এসব বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো উচিত।

বিপণনের মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব গড়তে আমরা একটি মডেলের কথা বলছি, যার নাম দেওয়া হয়েছে ইনকিউবেটর। এ মডেলের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করার বিষয় আলোচনা হচ্ছে। আটটি ইনকিউবেটর এসব বিষয় নিয়ে কয়েকটি দেশে কাজ করবে।

এখন ভাবা হচ্ছে, বিপণন কর্মকর্তারা কীভাবে শিক্ষাকে উন্নত করতে পারেন। অসুখ হলে অনেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে পাশের ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খান এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ কাজ নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিপণন ভূমিকা রাখতে পারে।

বিপণন কীভাবে শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
পারে? একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। মুঠোফোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মটোরোলা সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশ বিনিয়োগ করেছে। ভালো প্রকৌশলী তৈরির তাগিদ থেকেই তারা এ কাজ করেছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি একদিকে যেমন সমাজের জন্য একটি বড় কাজ করল, তেমনি ভবিষ্যতে নিজের প্রতিষ্ঠান চালাতে দক্ষ ও যোগ্য প্রকৌশলী পাবে।

একইভাবে বেভারেজ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে পানির মান বাড়াতে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে পানির বিষয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে পারে। মোট কথা, বিপণন শুধু নতুন নতুন ধারণাই তৈরি করবে না, এগুলো কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পঁৌছানো সম্ভব, সে বিষয়েও কাজ করবে।

সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিবারের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে শিশুরা হতে পারে বড় প্রভাবক। তারা সামাজিক বিপণনের সবচেয়ে বড় দূত। কারণ, শিশুরা তাদের মা-বাবার ওপর ভালো প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই তাদের উদ্দেশ করে বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হলে তা দিয়ে তাদের মা-বাবার খারাপ আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সরকার কীভাবে কার্যকরভাবে সামাজিক বিপণন করতে পারে এটা একটা ভালো প্রশ্ন। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই তিনটি প্রধান খাতে উন্নয়নকাজ হয়। সরকারি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ও এনজিও। এ ক্ষেত্রে সরকারি খাতের বিপণন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নাগরিকদের সেবা করার জন্যই সরকার থাকে। রাজনীতিবিদেরা হচ্ছেন জনগণের সেবক। তাই সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার তার জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তারা জনগণকে সাহায্য করতে চায়। বাংলাদেশ একটি দ্রুত অগ্রসরমান দেশ, ধীর প্রবৃদ্ধির নয়।

কোনো প্রতিষ্ঠান সামাজিক বিপণন করছে কি না, সেটা জানতে হলে প্রথমে সিএসআর ও সামাজিক বিপণনের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে। আমরা

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
চাই, সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই মুনাফা করুক। কিন্তু এর পাশাপাশি মুনাফার একটি অংশ সাধারণ মানুষের উন্নয়নেও ব্যয় করা প্রয়োজন। এটিই সিএসআর। আর কোনো প্রতিষ্ঠান যখন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করে, সেটা সামাজিক বিপণন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই সুনির্দিষ্ট একটি সামাজিক বিষয়কে ফোকাস করে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সেগুলোই স্মার্ট প্রতিষ্ঠান, যেগুলো কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি একদিকে যেমন তাদের বর্্যান্ডের পরিচিতি বাড়াবে, তেমনি সমাজেরও উপকার হবে।

বাংলাদেশের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বাংলাদেশের দারিদর্্য দূর করতে চান; এ দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে চান।

বিপণনের নৈতিকতা নিয়ে আজকাল প্রশ্ন উঠছে। অনেক অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। আমার মতে, বিপণনের সবচেয়ে বড় নৈতিক সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। দেখুন, যেসব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি করতে ভয় পায় না, সেসব প্রতিষ্ঠানেই প্রচুর দুর্নীতি হয়। তাই দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

বিপণন নৈতিকতার কথা বলতে হলে বিজ্ঞাপনের কথা বলতেই হয়। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় নৈতিকতা মানা হচ্ছে না। কোন বিজ্ঞাপনে কতটুকু বলা যাবে, কোন বিষয়গুলো বলা অনৈতিক হবে না, তা এখন ভেবে দেখা দরকার। অনেক বিজ্ঞাপনেই বলা হয়, ক্রিম মাখলে কয়েক সপ্তাহেই তোমার ত্বক লাবণ্যময় হয়ে যাবে। সেটা দেখে ভোক্তা ওই ক্রিম কিনছে। কিন্তু কেনার পর হতাশ হচ্ছে। আবার বিজ্ঞাপনে বলা হয়, এ গাড়ি খুবই স্মার্ট। ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার যায়। কিন্তু কেনার পর দেখা গেল এটি ঘণ্টায় যায় ২০ কিলোমিটার। তাহলে তো আপনাকে মিথ্য তথ্য দেওয়া হলো, এটা অনৈতিক।বাংলাদেশে আমি আগেও এসেছি। বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। এর মানুষও শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শান্তির বিপণনকারী। আমি এ দেশের অনেক সম্ভাবনা দেখি।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: আবুল হাসনাত

Web: http://tanbircox.blogspot.com

Howard H. Stevenson (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট হতে জেনে নিন কেন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারছেন না!!!



Howard H. Stevenson হচ্ছেন আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের Sarofim-Rock Baker Foundation Professor, Senior Associate Dean এবং Harvard Business Publishing Company board এর চেয়ারম্যান। তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের Senior Associate Dean এবং Director হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত Latin American Faculty Advisory Group এর চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত Harvard University Resources and Planning এর Vice Provost এবং Senior Associate Provost হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে রচিত "A Perspective on Entrepreneurship" আর্টিকেলে তিনি ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা তুলে ধরেছেন। এই আর্টিকেলটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই সারা বিশ্বে আজও খুব সমাদৃত। উদ্যোক্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'উদ্যোক্তা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ গ্রহণ করে এবং সেই সুযোগ বাস্তবায়ন করে'। তিনি আরও বলেন,

‘অনেক মানুষই চাকুরি ছেড়ে নিজস্ব ব্যবসার মালিক তথা উদ্যোক্তা হতে চায়। কিন্তু অধিকাংশ চাকুরীজীবী বা অন্য পেশার মানুষ শেষ পর্যন্ত কখনই উদ্যোক্তা হতে পারে না। এর মূল কারণ হল ব্যবসা শুরু না করার পেছনে তারা অসংখ্য অজুহাত তৈরি করে’। তার মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি হল:

- ব্যবসা করতে প্রচুর টাকা লাগে। আমার যথেষ্ট টাকা নেই।
- আমি কখনই চাকুরি ছাড়তে পারবনা যেহেতু আমার সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার।
- আমার মানুষের সাথে তেমন পরিচয় নেই/আমি খুব আত্মকেন্দ্রিক। আমাকে দিয়ে হবেনা।
- আমি সফল ব্যক্তিদের মত অতটা স্মার্ট নই।
- ব্যবসা করার জন্য আমার হাতে একটুও সময় নেই। আমি অন্য কাজে প্রচুর ব্যস্ত থাকি।
- আমাকে ব্যবসায় সাহায্য করতে পারে এমন একজনকেও আমি খুঁজে পাইনি এবং পাবওনা।
- একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে প্রচুর সময় দিতে হয়। আমার অত ধৈর্য্য নেই।
- আমার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। এসময় নতুন করে ব্যবসা শুরু করা কঠিন।
- আমি কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করা পছন্দ করি না/নিয়ন্ত্রণ করতে ভয় পাই।
- ব্যবসা মানেই হচ্ছে ঝুঁকি নেয়া। আমি ঝুঁকি নেয়া মোটেই পছন্দ করি না/ঝুঁকি নিতে ভয় পাই।
- টাকায় টাকা আনে। যেহেতু আমার এখন টাকা নেই তাই আমি কখনই অনেক টাকার মালিক হতে পারবনা।
- আমি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছি। এখান থেকে কিছুই করা সম্ভব নয়।
- আমার পরিবার বা গোষ্ঠীতে কেউ ব্যবসা করেনি। তাই আমিও করতে পারব না।
- ব্যবসা করার মত কোন সুযোগ আমার কাছে নেই।

- ⇨ ব্যবসা করার জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তার কোনটাই আমার মধ্যে নেই।
- ⇨ আমার স্ত্রী/স্বামী/পরিবার/আত্মীয়-স্বজন কখনই ব্যবসা করার বিষয়টা সাপোর্ট করবে না।
- ⇨ আমি ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র নই। তাই ব্যবসার বিষয়াদি সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই।
- ⇨ এখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। এসময় ব্যবসা শুরু করলে নিশ্চিত লোকসান হবে।
- ⇨ ব্যবসাতে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার হারই বেশি। আমি ব্যর্থ হতে চাই না।
- ⇨ চাকুরির বদলে ব্যবসা করে খুব কম মানুষই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পেরেছে।
- ⇨ ব্যবসায়ীদের মত আমি অত ভাগ্যবান নই। আমার ভাগ্য আমাকে কখনই সাহায্য করবে না।
- ⇨ আমি ব্যবসা করতে নামলে আমার পরিচিতজনেরা আমাকে নিয়ে সমালোচনা করবে।
- ⇨ ব্যবসায়ীরা অসাধু এবং বিবেকহীন মানুষ। তারা মূলত মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে।
- ⇨ মানুষ ব্যবসায়ীদেরকে সম্মান করেনা। আমার কাছে অর্থের চেয়ে সম্মানের মূল্য বেশি।
- ⇨ ব্যবসা বিষয়টাকেই আমার ভাল লাগেনা তা সেটা যে ধরনের ব্যবসাই হোক।
- ⇨ ব্যবসায় ঝামেলা বেশি। আমি ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করি।
- ⇨ ব্যবসা শুরু করার পর লোকসান হলে আমি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারব না।
- ⇨ অনেক দক্ষ, শিক্ষিত এবং যোগ্য ব্যক্তিও ব্যবসায় লোকসান করেছে। সেখানে আমার মত মানুষ কখনই লাভ করতে পারবে না।
- ⇨ ব্যবসার বিষয়টা আমি একটু ভেবে দেখি। যদি মন:পূত হয় তবে শুরু করব।
- ⇨ ব্যবসা না করেও হাজার হাজার মানুষ সুখী জীবন-যাপন করছে। সুতরাং ব্যবসা যে

করতেই হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

⇨ আমার জন্ম যদি আজ থেকে ৪০-৫০ বছর পূর্বে হত তাহলে খুব সহজেই ব্যবসা করতে পারতাম।

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিন্তা করে তারা তাদের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অথবা চাকুরির পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তুলবে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যর্থ হবার ভয়ে তারা শুরু করে না। তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের নিয়মিত চাকুরিতেই পুনরায় মনোনিবেশ করে।

এদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি অজুহাত হল:

⇨ আমি কিছুদিন পর শুরু করব।

⇨ যখন সর্বোত্তম সুযোগটি আসবে তখন আমি ব্যবসা শুরু করব।

⇨ যখন আমার হাতে টাকা আসবে আমি তখন শুরু করব।

⇨ যখন সঠিক সময় আসবে তখন আমি শুরু করব।

⇨ যখন আমার প্রচুর অবসর সময় থাকবে তখন আমি শুরু করব।

⇨ যখন আমি সঠিক পার্টনার পাব তখন আমি শুরু করব।

⇨ যখন আমার সন্তানের পড়াশোনা শেষ হবে তখন আমি শুরু করব।

⇨ পারিবারিক সূত্রে ব্যবসার মালিকানা পেলেই লাভ করা সম্ভব, অন্যথায় নয়।

⇨ আমার ইচ্ছে আছে কিন্তু আমার পরিবার/স্বামী/স্ত্রী চায় আমি চাকুরিতেই থেকে যাই।

⇨ আমি আমার চাকুরিতে পরবর্তী পদোন্নতির জন্য অপেক্ষা করছি। যদি আমি সেটা না পাই তবে আমি শুরু করব।

⇨ আমার মনে হয় শুরু করার আগে কলেজ/ভার্সিটিতে গিয়ে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কিছু পড়াশোনা করে আসা উচিৎ।

⇨ আমি চাকুরিতে কঠোর পরিশ্রম করতে রাজি আছি কিন্তু ব্যবসা গড়ে তোলায় পরিশ্রম করতে পারব না।

- ⇨ চাকুরিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা লাগে কিন্তু ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করা লাগে যা আমি পারব না।
- ⇨ বিক্রির বিষয়টা আমার পছন্দ নয়। চাকুরিতে কোন কিছু বিক্রি না করেও বেতন পাওয়া যায়।
- ⇨ যদি আমি ব্যর্থ হই তবে আমার কি হবে?
- ⇨ চাকুরিতে বেতনের নিশ্চয়তা আছে কিন্তু ব্যবসায় সেটা নেই। আমি নিশ্চিত বেতন ছেড়ে ব্যবসা করতে পারবনা।

ব্যবসা করে অর্থোপার্জন করাটা চাকুরির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এবং কষ্টকর। শুধু শুধু কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।

জীবন-যাপন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং চাকুরির বেতনই যথেষ্ট, ব্যবসা করাটা খুব বেশি জরুরী নয়।

আমি ব্যর্থ হলে মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারব না।

অধ্যাপক এ সম্পর্কে বলেন, ‘একটি দুই বছরের শিশুও এসব অজুহাত তথা খোঁড়া যুক্তি তৈরি করতে সক্ষম। কিন্তু যারা সফল ব্যবসায়ী তারা কখনই অজুহাতের আশ্রয় নেয়না। যেসব মানুষের অজুহাতের শক্তি তাদের স্বপ্নের শক্তির চেয়ে বেশি সেসব মানুষ কখনই উদ্যোক্তা হতে পারে না কেননা সাফল্য এবং অজুহাত কখনই একসাথে অবস্থান করে না। তাই অজুহাত বর্জন না করতে পারলে ব্যবসায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জন একেবারেই অসম্ভব’।

তিনি আরও বলেন, সফল উদ্যোক্তাদের কাজের ধাপগুলো ভিন্ন। এই ভিন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিচের মডেলটি উল্লেখ করেন। এই মডেলে যে ধাপগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো একজন সফল উদ্যোক্তার জন্য অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন :

- ⇨ ব্যবসার আইডিয়া পাওয়ার পর সেটা সতকর্তার সাথে পরীক্ষা করা এবং যদি আইডিয়াটি বাস্তবমুখী হয় তবে অবিলম্বে ব্যবসা শুরু করা।

- ⇨ ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।
- ⇨ একজন পথপ্রদর্শক খুঁজে বের করা এবং তার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা।
- ⇨ পুনরায় ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতা থেকে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করা।
- ⇨ পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্যে এসে অধিক অধিক পরামর্শ গ্রহণ করা।
- ⇨ প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতা থেকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করা।
- ⇨ সফল হবার আগ পর্যন্ত ১ থেকে ৬ নম্বর ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তি করা।
- ⇨ সফলতার অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করা।
- ⇨ ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ হিসেব করা। পাশাপাশি সাফল্য এবং ব্যর্থতার পরিমাণ হিসেব করা।
- ⇨ পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা।

ক্যামেরন হ্যারল্ড(খ্যাতিমান উদ্যোক্তা)

উদ্যোক্তা হতে চাও?



খ্যাতিমান উদ্যোক্তা ক্যামেরন হ্যারল্ডের জন্ম কানাডায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম ব্যবসা শুরু করেন। বিভিন্ন দেশে নতুন উদ্যোক্তাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ২০১০ সালের মার্চ মাসে কানাডার এডমন্টনে টিইডির একটি অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমি সবচেয়ে মাথামোটা! কারণ, আমি ভালোভাবে স্কুলই পাস করতে পারিনি। কিন্তু ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমি ব্যবসা বেশ ভালো বুঝি আর বড় হয়ে আমি উদ্যোক্তা হতে চাই।

ছোটবেলায় আমাদের অজস্র স্বপ্ন থাকে, শখ থাকে, জীবনে অনেক কিছু করার প্রবল ইচ্ছে থাকে। আর যখন আমরা বড় হয়ে যাই, আস্তে আস্তে সেসব স্বপ্ন বিবর্ণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। আমাদের শুধু বলা হয়, পড়াশোনা করতে হবে, আরও অনেক পড়তে হবে প্রতিদিন, আরও

মনোযোগী হতে হবে, আরও একজন শিক্ষকের কাছ প্রাইভেট পড়তে হবে! আমার মা-বাবা একজন শিক্ষক রেখেছিল আমাকে বাসায় এসে ফরাসি পড়ানোর জন্য; কিন্তু কোনো লাভই হয়নি। দুই বছর আগে এমআইটির (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) ব্যবসায় উদ্যোগ-বিষয়ক মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমি সেরা প্রভাষক নির্বাচিত হই। সেখানে আমাকে সারা পৃথিবী থেকে আসা উদ্যোক্তাদের সামনে বক্তব্য দিতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখনই শহরের একটা বক্তব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাই। কিন্তু তখন কেউ আমাকে এতটুকু উৎসাহ দিয়ে বলেনি, 'এই ছেলে তো দারুণ কথা বলতে পারে! হয়তো পড়াশোনায় তেমন মনোযোগী নয়, কিন্তু ও মানুষকে চমৎকারভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।' কেউ একবারও আমার মা-বাবাকে বলেনি, 'ওকে বক্তৃতা শেখার জন্য একজন শিক্ষক দাও।' সবাই বলেছে, 'যেসব বিষয়ে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, সেগুলো পড়তে পাঠাও।'

তাই শিশুদের শুধু চিকিৎসক বা প্রকৌশলী বানানোর চেষ্টা না করে উদ্যোক্তা হওয়ারও সুযোগ দিতে হবে। এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের স্কুল-কলেজগুলো সবাইকে এটাই বোঝায় যে চিকিৎসক হতেই হবে, কিংবা প্রকৌশলী হতেই হবে। এতে আমরা অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাকে নিজেদের অজান্তেই হারিয়ে ফেলছি। এমন অনেকে হয়তো এই কক্ষের মধ্যেই আছেন, যাঁদের কোনো কিছু করার তীব্র ইচ্ছে আছে, দারুণ কোনো পরিকল্পনা আছে। আমরা তাঁদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে পারি।

একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, 'তুমি যদি কাউকে একটি মাছ দাও, তাহলে তুমি তার এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা করলে। কিন্তু তুমি যদি কাউকে মাছ ধরা শেখাও তাহলে তুমি তার সারা জীবনের খাবারের ব্যবস্থাই নিশ্চিত করে দিলে।' অভিভাবক ও সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত শিশুদের হাতে মাছ তুলে না দিয়ে তা ধরতে শেখানো। আমরা যদি

উদ্যোক্তা হওয়াকে একটি সম্ভাবনাময় জীবিকা হিসেবে মেনে নিয়ে ছেলেমেয়েদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহ আর সহায়তা দিই, তাহলে সরকারকে আর কখনো বেকারসমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

আমরা সারা দিন বসে বসে শিশুদের জ্ঞান দিই, কী কী করা উচিত নয়। কাউকে মেরো না, কামড় দিয়ো না, তর্ক কোরো না, এমন আরও শত শত বিধি-নিষেধ! আমরা তাদের বলি, সবচেয়ে ভালো চাকরিটাই পেতে হবে। স্কুলের শিক্ষক বলেন, চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হতে না পারলে আর জীবনে হলোটা কী! টেলিভিশন আর পত্রিকা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়, যদি একবার মডেল, গায়ক কিংবা নায়ক হতে পারো, তাহলে তোমাকে আর পায় কে!

আমাদের এমবিএ প্রোগ্রামে কখনো উদ্যোক্তা হতে শেখানো হয় না। সেখানে শুধু শেখানো হয়, কীভাবে বড় বড় কোম্পানির হয়ে চাকরি করতে হবে। কিন্তু একবার কি কেউ ভেবে দেখেছে, এসব বড় কোম্পানি তৈরি করছে কারা? তারা সংখ্যায় হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ, তারা উদ্যোক্তা। আর এদিকে আমরা কেবলই তোতাপাখির মতো শিখিয়ে যাচ্ছি, 'উদ্ভট কিছু করার চেষ্টাও কোরো না। সবাই যা করে, সেটাই করো। ভালো ছাত্র হও।' কিন্তু দুঃখিত, ক্লাসে প্রথম হলেই যে কেউ সবকিছু পারবে, তেমন নয়। আমি জোর গলায় স্বীকার করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে আমি অন্যদের দিয়ে আমার অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নিতাম।

এখন সেই একই বিষয়ের বইয়ে আমার উদাহরণ দেওয়া আছে। সারা কানাডার শিক্ষার্থীরা তা পড়ছে। বইটি লেখার সময় তাঁরা যখন আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন, আমি না বলে পারিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে এই কোর্সে আমি কীভাবে পাস করেছিলাম!

উদ্যোক্তা হতে হলে এমবিএ করতেই হবে, স্কুলে ভালো ফল করতেই হবে—এমন কোনো কথা নেই।

আমরা কেন শিশুদের শেখাই না যে টাকাপয়সা যখন খুশি খরচ না করে কীভাবে জমিয়ে পরে ভালো কিছু করা যায়? আমি বড় রাস্তায় একবার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
একটা পয়সা ফেলে দেওয়ায় আমার বাবা আমাকে একা একা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে সেটা তুলে আনার আদেশ করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি খুব কষ্ট করে টাকা উপার্জন করি। আর তাই একটি পয়সাও নষ্ট হওয়া দেখতে চাই না।' সেদিনের কথা আমি আজও ভুলিনি।

হাতখরচ শিশুদের একটি বাজে ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলে। এটি তাদের 'বেতন' আশা করতে শেখায়। একজন উদ্যোক্তা কখনো নির্দিষ্ট অঙ্কের বেতনের পেছনে ছোটেন না। আমার তিন ছেলেমেয়ে। আমি তাদের বলি বাড়িতে কোথাও কিছু ঠিকঠাক করা বা গোছানোর দরকার আছে কি না, তা খুঁজে বের করতে। তারা আমাকে এসে জানায়। তারপর আমরা আলোচনা করে ঠিক করি, কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাদের আমি কত পারিশ্রমিক দিতে পারি! হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে আমরা দর-কষাকষিও করি! কিন্তু এতে তাদেরই উপকার হয়। তারা চারপাশ থেকে সুযোগ খুঁজে নিতে শেখে, নিজের কাজ নিজেই করতে শেখে। এ ছাড়া কীভাবে কাজের যথাযথ দাম আদায় করতে হয়, তা-ও শিখে নেয়।

আমি বলব, শিশুদের ঘুমানোর সময় প্রতিদিন গল্প না শুনিয়ে সপ্তাহে তিন দিন অন্তত তাদের গল্প বলতে দেওয়া উচিত। তাদের জামাকাপড়, খেলনা কিংবা কম্পিউটার নিয়েই কিছু বলতে দিয়ে দেখুন না, সে কী গল্প বানায়!

আমারসন্তানদের আমি এমনটি প্রায়ই করাই, এতে তারা সৃজনশীল হতে শেখে, নিজেদের মতো করে আনন্দও পায়। তাই শিশুদের কথা বলতে দিন, যা কিছু নিয়েই হোক না কেন। উদ্যোক্তা হতে হলে এসব দক্ষতা খুব প্রয়োজন। আমরা নিজেদের জীবনে এগুলো নিয়ে সমস্যায় পড়লেও আমাদের শিশুদের গড়ে তোলার বেলায় এগুলোর কথা ভুলে যাই, আমরা শুধু ক্লাসের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য প্রাইভেট টিচার দিয়েই মনে করি দায়িত্ব শেষ! কিন্তু না, তাদের নেতৃত্ব দিতে শেখাতে হবে। তাদের মনে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে জানতে হবে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

রজার হ্যারোপ (ব্যবসাবিষয়ক পেশাদার বক্তা)

নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ১০ পরামর্শ



পেশাদার বক্তা ও লেখক রজার হ্যারোপের জন্ম যুক্তরাজ্যে। হ্যারোপ বিভিন্ন কোম্পানির উর্ধ্বতন পদে চাকরি করেছেন। এখন তিনি ব্যবসাবিষয়ক পেশাদার বক্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। আমি একসময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার শুরু করেছি। এখানে আমি কারও হয়ে চাকরি করি না। আমার এই দ্বিতীয় ক্যারিয়ারে আমি একজন পেশাদার বক্তা। এর অংশ হিসেবে দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করে বেড়াই আমি। আমি ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করি। বিভিন্ন বিপদাপন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিপদ বা লোকসান থেকে উদ্ধারের জন্য পরামর্শ দিই আমি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে সব প্রতিষ্ঠানের সব সমস্যাকে একটু অন্যভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি। আর এটা আমি করতে পারি; কারণ, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে ব্যবসা-বাণিজ্য আসলে তেমন কঠিন কিছু নয়।

যা হোক, আজ আমি নতুন উদ্যোক্তাদের (entrepreneur) জন্য ১০টি পরামর্শ দেব।

১) আমার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, সবার আগে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানো। নিজের ভালো দিকটা সবাই জানে, কিন্তু মন্দ দিকটা খুঁজে বের করা আসলে বেশ কঠিন। নিজের সঙ্গে এমন দ্বিতীয় কাউকে রাখো, যে কিনা নির্দ্বিধায় তোমার ভালো-মন্দ দুটো দিকই ধরিয়ে দিতে পারবে। তুমি যদি ভালো করে চিন্তা করো, তাহলে দেখবে দুনিয়াজুড়ে যাঁরাই সফল হয়েছেন, উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁদের সবার সঙ্গেই দ্বিতীয় কেউ

ছিলেন, যে কিনা তাঁকে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সহায়তা করেছেন।

২)নিজে কী পেতে চাও, কেন করছ কাজটা, তা থেকে তুমি কী পাবে, কীভাবে কাজে আসবে তোমার উদ্যোগ—সেসব সম্পর্কে একেবারে স্পষ্ট ধারণা থাকাটা খুব বেশি দরকার। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে প্রথমেই।

৩)নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, নিজের কাজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। নিজে যা করছ সেটার ওপর যদি নিজেরই আস্থা না থাকে, তাহলে অন্যরা কীভাবে তোমার ওপর আস্থা রাখবে। নিজের ওপর আস্থা না থাকলে তোমার সহকর্মীরাও তোমার ওপর থেকে তাদের আস্থা তুলে নেবে।

৪)নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। যদি তা না থাকে, তবে তুমি কখনোই তোমার কাজে সফল হতে পারবে না। আত্মবিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎ সাহস—এই তিনটি জিনিসই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন উদ্যোক্তার জন্য।

৫)সাহস ছাড়া বড় কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। ভালো কিছুর জন্য যদি ঝুঁকি নেওয়া দরকার হয়, তবে তা-ই নিতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে সহজ কাজ হলো ঝুঁকি না নেওয়া—এটা সবাই জানে। কিন্তু ঝুঁকি না নিলে নিরাপদে থাকা যায়, তাও কিন্তু সব সময় সত্য নয়। আমি এমন অনেক উদাহরণ দিতে পারব, যেখানে কিনা বংশপরম্পরায় চলে আসা ব্যবসা ধরে রাখতে গিয়ে অনেকেই পুরো ব্যবসাই হারিয়ে ফেলে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এর কারণ একটাই—নতুনেরা তাদের বংশপরম্পরায় চলে আসা ব্যবসাকে নতুন দিনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। কারণ, তারা সব সময় ঝুঁকিমুক্ত থাকতে চেয়েছে, আর এভাবেই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে তারা সব হারিয়েছে।

৬)আমি আমার জীবনে এমন কোনো উদ্যোক্তাকে দেখিনি, যে কিনা তার আশপাশের মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, কোনো অবস্থায়ই কারও সঙ্গে বাজে ব্যবহার করা যাবে না। এটা

www.facebook.com/tanbir.ebooks
খুবই স্বাভাবিক যে কাজ করতে নামলে অনেকের অনেক কথাই তোমার পছন্দ হবে না, অনেকের অনেক প্রস্তাবেই না বলতে হবে। কিন্তু যা-ই করো না কেন, আশপাশের সবার সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার করতে হবে, কাউকে না বললেও তা সুন্দরভাবে বলতে হবে।

৭)বিকল্প কোনো পরিকল্পনা ছাড়া কখনোই কোনো কাজে নামা যাবে না। মারফির তত্ত্ব কখনো ভুলে যেয়ো না, 'যদি কোনো কাজে কোনো ভুল ধরা পড়ে, তাহলে বিকল্প রাস্তা অনুসরণ করো'।

৮)সব সময় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো। নিজের চিন্তাভাবনাকে জটিল করে তুলো না কখনোই। আমি আগেই বলেছি, ব্যবসা আসলে খুব সহজ। আর এই সহজ কাজটা করতে গিয়ে নিজের আশপাশে অজস্র লোককে ঘেঁষতে দিয়ো না। কারণ, এরা হয়তো অযথা বিভিন্ন ধরনের যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে তোমাকে তোমার মূল লক্ষ্য থেকেই সরিয়ে ফেলবে।

৯)মাথা খাটিয়ে কাজ করো, বল খাটিয়ে নয়। এর মানে হলো, শুধু কাজপাগল হলেই হবে না, অযথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনে ১৮-২০ ঘণ্টা খেটে নিজের ক্ষতি করো না বরং সবচেয়ে কম খাটুনি দিয়ে কোন কাজ কীভাবে করা যায় সেটা খুঁজে বের করো। বুদ্ধিমান মানুষ শক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধির জোরে কাজ করে। সব সময় কেতাদুরস্ত হয়ে অফিসে বসে মিটিং করতে হবে তা নয়, যারা কাজ জানে তারা খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও নিজের কাজটা বের করে নেয়।

১০)সবশেষ এবং সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শটা হলো, জীবনে যা-ই করো না কেন, যেভাবেই করো; জীবনটাকে উপভোগ করো, প্রতিটা দিন থেকে, প্রতিটা মুহূর্ত থেকে আনন্দ খুঁজে নিয়ো। এটা নিশ্চিত যে জীবনের শতভাগ সময়েই আনন্দ করতে পারবে না, তাই বলে কখনোই আশা ছেড়ে দিয়ো না, আনন্দ খুঁজে নিতে না পারো, চেষ্টাটা তো অন্তত করো।

মনে রেখো, নতুন উদ্যোক্তাদের ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন সফল হয়, তুমি যদি তার একজন হতে পারো, তবে মন্দ কী! তোমাকে আগাম অভিনন্দন। সূত্র: ওয়েবসাইট।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

মার্থা স্টুয়ার্ট (মার্কিন উদ্যোক্তা, লেখক ও ম্যাগাজিন প্রকাশক)

সততাই সাফল্যের মূলমন্ত্র



মার্থা স্টুয়ার্ট। মার্কিন উদ্যোক্তা, লেখক ও ম্যাগাজিন প্রকাশক। রান্না, হস্তশিল্প, বাগান করা ইত্যাদি বিষয়ে বই লিখেছেন, টেলিভিশন শো করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মার্থা স্টুয়ার্ট লিভিং ওমনিমিডিয়া বছরে প্রায় ২৩ কোটি ডলার আয় করে

আমার মা-বাবা দুজনই শিক্ষক। আমার স্কুলের দুজন শিক্ষকও আমাকে দারুণ অনুপ্রাণিত করতেন। সে সময় আমি শিক্ষকই হতে চাইতাম। কলেজে আমি নানা বিষয়ে জানলাম। স্টক মার্কেট আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। স্টক ব্রোকার হয়েছিলাম আমি। এখন আমি চাই নানা বিষয়ে জানা একজন মানুষ হতে, নতুন নতুন বিষয় শিখে সবাইকে যাতে শেখাতে পারি। এখন আমি তা-ই করছি। তাই আমি মনে করি, আমি একজন শিক্ষক।

মায়ের ৮০তম জন্মদিনে আমার এক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি যেন একেকটা ছোটখাটো শক্তির উ ৎ স। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না, তাতে কিন্তু তাঁর ভালোবাসার কমতি হয়নি। তিনি ছিলেন পক্ষপাতহীন, কিন্তু কঠোর; কঠিন কিন্তু ক্ষমাপরায়ণ। তিনি ছিলেন আমার চোখে আদর্শ শিক্ষক।

এক বছরে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি আমি, যাঁদের আমি বলি আমার পরামর্শদাতা। এই দলে নানা ধরনের মানুষ পড়েন। আমার পথের পাশের বাগানের মালী এমন একজন। চেনা একজন গোয়ালাও হতে পারেন। কারও সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়নি, কেবল পড়েছি তাঁর কথা। যেমন—গার্সিয়া মার্কেস। আরও আছেন জর্জ এলিয়ট, জেন অস্টিন।

ছোটবেলা থেকেই প্রচুর বই পড়তাম। আমাদের

www.facebook.com/tanbir.ebooks
পাবলিক লাইব্রেরির নিয়মটা হলো, একটি পরীক্ষায় পাস করলে ছোটদের লাইব্রেরির পরের ধাপে যেতে দেওয়া হবে, যেখানে থাকত বড়দের পড়ার উপযোগী নানা বই। আমি-ই প্রথম সেই পরীক্ষায় পাস করেছিলাম। বাড়িতে অনেক কাজ থাকত, কিন্তু আমাদের পড়ার সময়টা দেওয়া হতো। আমার প্রিয় একটা চেয়ার ছিল, এমনকি প্রিয় একটা গাছও ছিল, যার তলে বসে আমি পড়তাম। রোববার সবার সঙ্গে চার্চে যাওয়ার পথে গাড়িতেও বসে পড়ে ফেলতাম অনেক বই। লাইব্রেরির এ থেকে জেড পর্যন্ত—সবই একসময় পড়ে ফেলেছিলাম। তবে পরে বেছে বেছে পড়তে শুরু করলাম। এ জন্য পরামর্শ নিতাম লাইব্রেরিয়ানের, বইয়ের রিভিউ পড়তাম।

এখনো প্রচুর পড়ি। বই পড়াটা আমার জানার দারুণ একটা সুযোগ মনে হয়। এমনকি আমি জানতে পারি, আমার পাঠকেরা কোন বিষয়ে জানতে চায়। এখন যেমন বাগান করা নিয়ে পড়ছি।

এসব বিষয়ে আমার উ ৎ সাহের কমতি নেই। পথে হাঁটতে হাঁটতেই নতুন সব আইডিয়া পেয়ে যাই। এসব জিনিস হয়তো আগেও দেখেছি, কিন্তু এখন আমার চোখ আরও সতর্ক। রোজকার নানা সমস্যার জন্য খুব সহজ সমাধান খুঁজে বেড়াই আমি। আমার বেশি ঘুমের প্রয়োজন নেই। কৌতূহলী মানুষের জীবনে ঘুম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া। আমি তাই রাতে পড়াশোনা করি। এটা একটা অদ্ভুত জীবন, কিন্তু মজার। আমি এখনো ঠিক আগের মানুষটাই আছি। আমার কাজ আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। সফল একটা ব্যবসা চালাচ্ছি। কিন্তু মানুষ হিসেবে একদম বদলাইনি। আমার পছন্দ-অপছন্দও একই রয়ে গেছে। বোধ হয় আমার রুচির একটু পরিবর্তন হয়েছে, আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। এখনো আমি ঘুম থেকে উঠে বিড়ালের বর্জ্য পরিষ্কার করি। বাগানে গিয়ে আগাছা তুলি। পা দুটো আমি মাটিতেই রাখি। আর এ জন্যই পরিষ্কার বুঝতে পারি, আমার জীবনে আশপাশে কী ঘটছে।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জীবনযাত্রা, পরিবার—এসব এখন মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক দিন ধরেই আমি এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি কখনো বলতে যাইনি, দেখো, এত দিন ধরে আমি-ই তো এসব বলে যাচ্ছি। আমার কথা হলো, কাজ করে যাও। একদিন তার স্বীকৃতি পাবেই। আমার প্রথম বই লেখাটাই যেন আমার জীবনটা বদলে দিল। এ ব্যাপারে আমি খুব খুঁতখুঁতে। ভালো কিছু না হলে আমি সেটা করি-ই না। আমার সব বই পাঠকপ্রিয় হয়েছে। আমি একটা মান তৈরি করেছি। সেটা আমি ধরে রাখব। চাইলে হয়তো আমার ব্যবসা আরও বড় করতে পারতাম, কিন্তু মান ধরে রাখার জন্যই আস্তে আস্তে এগিয়েছি।

সাফল্য পেতে হলে কোনো বিষয়ে আগ্রহ ধরে রাখতে হবে। খোলা মনে মানুষ হতে হবে। বড় শিল্পীরা সবাই এমন মানুষই। যদিও কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁদের খুব নির্দিষ্ট মনে হয়, যেমন—পিকাসো। কিন্তু একই সঙ্গে আপনার দুটো গুণই থাকতে হবে। আমার মনে হয়, কাজের প্রতি খুব মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু এটা নয় যে জীবনের হালকা দিকগুলো আপনার নজর এড়িয়ে যায়।

২৫ বছর ধরে আমি একই বাড়িতে বাস করছি। আমি কোনো প্রাসাদের মতো বাড়ি কিনতে যাইনি। আমার কাজের বিষয়টাই হলো জীবনযাত্রা। কিন্তু প্রাসাদের জীবনযাত্রা আমার পাঠকদের কোনো কাজে আসবে না। পাঠকদের মধ্যে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে হবে। তাই এ বাড়িটাকেই আমি মনের মতো করে সাজিয়েছি। একটু একটু করে আরও সুন্দর করে তুলেছি। অনেকেই ভাবে, আমি কী দারুণ একটা বাড়িতে থাকি! কিন্তু এটা আমার সেই আগের বাড়ি-ই।

আমি মনে করি, আপনি যা-ই তৈরি করেন বা বিক্রি করেন, তা ভালো হতে হবে। একটা খারাপ জিনিস মানেই বাজার থেকে আপনার হারিয়ে যাওয়া। কাজের প্রতি সততাই হলো সাফল্যের মূলমন্ত্র।

সূত্র:একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: রুহিনা তাসকিন

Web: http://tanbircox.blogspot.com

ওয়ারেন বাফেট (বিল গেটসকে বাফেট যা বলেছিলেন)

বিল গেটসকে বাফেট যা বলেছিলেন



বিশ্বের জনপ্রিয় এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের রয়েছে বর্ণাঢ্য জীবনকাহিনি। সবাই যে খুব ভালো অবস্থান থেকে এসে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন নয়। নিজ নিজ যোগ্যতায় বিখ্যাত, প্রভাবশালী হয়ে ওঠার আছে নানা উদাহরণ। তাঁদের জীবনকাহিনি অনুসরণীয়। নিজ গুণে এবং যোগ্যতায় বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হচ্ছেন ওয়ারেন বাফেট। ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার ওমাহা এলাকায় জন্ম নেওয়া বিশ্বের অন্যতম সফল এ বিনিয়োগকারী গত বছর একটি দাতব্য সংস্থায় তিন হাজার ১০০ কোটি ডলার দান করেছেন। বিনিয়োগের নেশাটা শুরু হয় ছোটবেলা থেকেই এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনেন তিনি! শুনতে অবাক লাগলেও মাত্র ১৪ বছর বয়সে সংবাদপত্র বিক্রি করা অর্থ দিয়ে একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন ওয়ারেন বাফেট!

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কনজিউমার নিউজ অ্যান্ড বিজনেস চ্যানেলে (সিএনবিসি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তরুণদের বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। এ কথাগুলোই তিনি পরে বলেছেন বিল গেটসকে। নিজের ১১ বছর বয়সে শেয়ার কেনার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘যেখানেই কম খরচ দেখবে, সেখানে নিজের সন্তানদের

বিনিয়োগে উৎসাহিত করা উচিত।' কম বয়সে কেনা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মতামত, জমা করা ক্ষুদ্র অর্থ দিয়ে সন্তানদের যেকোনো রকমের ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে আগ্রহী করাটা ভালো।

বিয়ের ৫০ বছর পরও তিনি বাস করছেন নিজ শহরে ছোট তিন বেডরুমের একটি বাড়িতে, বাড়িটি দেয়ালঘেরা নয়। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'যা প্রয়োজন শুধু তাই কেনা উচিত, এ ব্যাপারে সন্তানদেরও উৎসাহিত করা জরুরি।' শুনতে অবাক হলেও বিশ্বের এ দ্বিতীয় ধনকুবের ব্যক্তিটি নিজেই নিজের গাড়ি চালান এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য নেই কোনো নিরাপত্তা কর্মীও! নিজের প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকশেয়ার হ্যাথওয়ে, যার চেয়ারম্যান তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে সারা বিশ্বে রয়েছে ৬৩টি প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থাও। কিন্তু কোনো দিনও বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করেননি ওয়ারেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সব সময়ই ভাবুন, অর্থনৈতিকভাবে কোন কাজটি সুবিধাজনক। মূল প্রতিষ্ঠানের এতগুলো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রতিবছর তিনি একটিমাত্র চিঠি দেন! এ ছাড়া তেমন কোনো বৈঠক কিংবা নিয়মিত যোগাযোগও করেন না তিনি। এ ব্যাপারে মনেপ্রাণে একটি কথা বিশ্বাস করেন এবং বলেন, সঠিক জায়গায় সঠিক লোক নিয়োগ দেওয়া উচিত, যাতে কাজটা হবে—এমন নিশ্চিন্তে থাকা যায়। অধীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো চিঠিতে দুটি নিয়মের কথা থাকে সব সময়ের জন্য। যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নিজ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিকদের টাকার কোনো ক্ষতি করা যাবে না এবং দ্বিতীয়টি প্রথম নিয়মটি কখনো ভোলা যাবে না! এতে করে শেয়ার মালিকদের বিশ্বাস আর এগিয়ে যাওয়ার পথ সহজ হবে। কাজের সময় বাইরে সমাজের উচ্চপদস্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তেমন অভ্যস্ত নন ওয়ারেন। কাজের সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু ঘরে বসে পপকর্ন খেয়ে আর টিভির সামনে কাটিয়ে দেন তিনি! মজার বিষয় হচ্ছে, নিজে কখনো কোনো

মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখেন না এবং নিজের ব্যক্তিগত অফিস টেবিলেও নেই কোনো কম্পিউটার!

বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের বিল গেটস একবারই মাত্র দেখা করেছেন ওয়ারেন বাফেটের সঙ্গে। দেখা করার সময় যে খুব উপভোগ্য হবে না, এমনটাই ভেবেছিলেন বিল গেটস। কেননা, দুজনের সাফল্যের পথ আলাদা, জীবন যাপনেই নেই মিল। তাই বিল গেটস ভেবেছিলেন, আধা ঘণ্টাই যথেষ্ট। আধা ঘণ্টার সেই সাক্ষাতের সময় পরে শেষ হয়েছে ১০ ঘণ্টায়। বিল গেটস তো বটেই, তরুণদেরও নানা বিষয়ে পরামর্শ দেন ওয়ারেন বাফেট। এরপর থেকেই বিল গেটস তাঁর দারুণ ভক্ত। একেবারে ডাই হার্ড ফ্যান।

ওয়ারেন তরুণদের ক্রেডিট কার্ড (ব্যাংক ঋণ) ব্যবহারের চেয়ে বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে অর্থ কখনো মানুষ তৈরি করতে পারে না বরং উপার্জন করে নিতে হয়। যতটা সম্ভব সহজভাবে জীবন যাপন করা উচিত এবং কে কোথায় কী বলে, সেটা শুধু শুনে যাও, তবে নিজের যেটা ভালো লাগে, সেটাই করবে। শুধু ব্র্যান্ড দেখেই পোশাক পছন্দ করতে হবে, এমন যুক্তির পক্ষে নন তিনি। তাঁর মতে, যা নিজের সঙ্গে মানিয়ে যায় এবং আরাম দেয় তা-ই পরবে।

সব মিলিয়ে জীবনটা তোমারই, তাহলে কেনই বা অন্য একজনকে সুযোগ দেবে তোমার জীবনের নিয়ম তৈরিতে।

আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ পেশকভ (মাক্সিম গোর্কি)

পেশকভের মাক্সিম গোর্কি হয়ে ওঠা



সাড়া জাগানো মা উপন্যাসের কাহিনি কার না জানা! তবে এই উপন্যাসের লেখক মাক্সিম গোর্কির জীবনের কাহিনি অনেকেরই অজানা। তাঁর জীবন উপন্যাসের মতোই। বেশ কাঁচা বয়সে নিজের কাছেই হেরে বসে ছিলেন তিনি। তারপর দ্বিতীয় জীবনে হয়ে উঠলেন বিখ্যাত লেখক মাক্সিম গোর্কি। অবশ্য যারা তাঁর আত্মজৈবনিক ট্রিলজি পড়েছেন (আমার ছেলেবেলা, পৃথিবীর পথে, পৃথিবীর পাঠশালায়), তারা জানেন গোর্কির ছেলেবেলা সম্পর্কে। তারপরও, তাঁর জীবনকাহিনি এতোটাই রোমাঞ্চকর যে বার বার পড়া যায়। চলুন শুনি তাঁর সাফল্যের কাহিনি।

যে মাক্সিম গোর্কিকে আমরা জানি, তাঁর প্রকৃত নাম আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ পেশকভ। এই রুশ লেখকের জন্ম ১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ। ছোটবেলায়ই হারিয়েছিলেন মা-বাবাকে। এরপর শুরু হয় তাঁর কঠিন জীবন। প্রথমেই একটি শৌখিন জুতার দোকানে কাজ শুরু করেন তিনি। সেখানে সারা দিন শ্রম দিতে হতো তাঁকে।

এরপর কিশোর পেশকভ কাজ নেন কয়েদি বহনের জাহাজে। তাঁর কাজ ছিল জাহাজের কর্মচারীদের বাসন ধোয়া। সেখানের কাজটাও তাঁর জন্য সহজ ছিল না। ভোর ছয়টা থেকে মাঝরাত অবধি তাঁকে কাজ করতে হতো। এই বয়সে কার এসব ভালো লাগে! এটা তো স্কুলে যাওয়ার বয়স, পাখি হয়ে উড়ে বেড়ানোর বয়স। কিন্তু পেটের তাগিদে এসব করা ছাড়া পেশকভের আর কোনো উপায়ও ছিল না। ভালো কাজের আশায় পেশা বদলাতে থাকেন পেশকভ। কিন্তু কোথাও শান্তি পাননি তিনি।

তবে পেশকভ শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন বইয়ের পাতায়। একটা ভালো নেশা ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন বইয়ের পোকা। অভাব-অনটন, হাড়ভাঙা পরিশ্রম—এত কিছুর মধ্যেও থামেনি তাঁর বই পড়া। কত শত বইয়ের মধ্যে রুশ কবি পুশকিনের একটি কবিতার বই তাঁকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি যোগ দেন বিপ্লবী দলে। বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে জার শাসকের সন্দেহেও পড়েন তিনি।

আগেই বলেছি, দারিদ্র্য ছিল পেশকভের নিত্য সঙ্গী। একপর্যায়ে তিনি কাজ নেন একটি রুটির কারখানায়। এখানে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পরদিন দুপুর পর্যন্ত একটানা কাজ করতে হতো তাঁকে। দারিদ্র্যের কশাঘাত আর দিনের পর দিন হাড়ভাঙা শ্রমের ধকলে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। জীবন হয়ে পড়ে তাঁর কাছে মূল্যহীন, বেঁচে থাকা হয়ে পড়ে নিরর্থক। তিক্ত জীবনের অবসান ঘটাতে পিস্তল কেনেন তিনি।

১৮৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর। বয়স তখন তাঁর মাত্র ২০। নদীর তীরে গিয়ে নিজের বুকেই গুলি করলেন পেশকভ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় জীবন। নব-উদ্যমে জীবন শুরু করেন পেশকভ। শুরু করেন লেখালেখি। ধারণ করেন নতুন নাম—মাক্সিম গোর্কি। রুশ ভাষায় গোর্কি শব্দের অর্থ তেতো। প্রথাগত রচনার বাইরে গোর্কির লেখায় প্রাধান্য পায় সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবনালেখ্য।

তখনো গোর্কির যশ-খ্যাতি ততটা হয়নি। ১৮৯৮ সালে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে একটি ছোট সংকলন প্রকাশিত হয়। সংকলনটির নাম দেওয়া হয় রেখাচিত্র ও কাহিনি। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গোর্কির খ্যাতি।

১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় গোর্কির সার্থক উপন্যাস ফোমা গর্দিয়েভ। গোর্কির লেখার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জীবনবোধ ও ক্ষুরধার রাশিয়ার জার শাসকদের বিচলিত করে তোলে।
১৯০১ সালে বিপ্লবী ছাত্রদের হত্যার প্রতিবাদে গোর্কি রচনা করলেন 'ঝোড়ো পাখির গান' নামের কবিতাটি। 'ঝোড়ো পাখির গান' হয়ে ওঠে বিপ্লবের মন্ত্র। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে প্রতিবাদের মুখে তাঁকে আবার ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয় সরকার।
ক্রমে গোর্কি হয়ে ওঠেন লেলিন আদর্শের কর্মী। হয়ে ওঠেন লেখনীর মাধ্যমে মানবিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরার সুদক্ষ শিল্পী। গোর্কিকে নির্বাসনে দেয় শাসকচক্র। নির্বাসনে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পাঠানো হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সুস্থ হয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন গোর্কি। ১৯০২ সালে লিখলেন নাটক লোয়ার ডেপথ (নীচুতলা)। এই নাটকের বাণী ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের সর্বত্র। তখন গোর্কির পরিচিতি রাশিয়ার সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ইউরোপে। গোর্কি হয়ে ওঠেন ইউরোপের শাসিত মানুষের কণ্ঠস্বর।
লেখনীর কারণে জীবনে বহুবার জার শাসকের রোষানলে পড়েছিলেন গোর্কি। বারবার তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে। আবারও গ্রেপ্তার হতে পারেন—এমন খবর জানতে পেরে দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। অবশেষে তিনি জার্মানি ও ফ্রান্স হয়ে পাড়ি জমান আমেরিকায়। ১৯০৭ সালে সেখানে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মা। মা উপন্যাস লিখে গোর্কি উঠে আসেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। নাম লেখান অমরত্বের খাতায়।
মা ছাড়াও গোর্কি অসংখ্য জনপ্রিয় গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা ও আত্মজীবনী লিখে গেছেন। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন এই মহান লেখকের জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু গোর্কি আজও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে চির-অম্লান হয়ে আছেন মানুষের হৃদয়ে।
২০ বছর বয়সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ পেশকভ সত্যিই বড় ভুল করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন মাক্সিম গোর্কি। তাই নয় কি?

Web: http://tanbircox.blogspot.com

স্যামুয়েল ক্লিমেন্স (মার্ক টোয়েন)

কখনো স্কুলে যাননি মার্ক টোয়েন



তাঁর প্রকৃত নাম স্যামুয়েল ক্লিমেন্স। কিন্তু হাস্যরসমূলক লেখালেখির জন্য বিশ্বখ্যাতি তাঁর মার্ক টোয়েন নামে। মার্ক টোয়েন কখনো স্কুলে যাননি। কিন্তু লেখালেখির জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছিলেন সম্মানসূক ডি. লিট ডিগ্রি। তাঁর সব লেখাই কৌতুক করে লেখা। অনেক মজার মানুষ ছিলেন মার্ক টোয়েন। আজ ২১ এপ্রিল তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকী। রসাল-কৌতুককর লেখার জন্য আজও তিনি বেঁচে আছেন বিশ্বমানবের মনের মধ্যে। ফ্লোরিডার মিসৌরিতে মার্ক টোয়েনের জন্ম ৩০ নভেম্বর, ১৮৩৫ সালে। মিসিসিপি নদী ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন মার্ক টোয়েনের আসল স্কুল, সত্যিকারের শ্রেণীকক্ষ। মিসিসিপির জলের মুখচ্ছবিতে মার্ক টোয়েন লিখেছেন, ‘ছিল একটা বই। অন্ধ-অশিক্ষিত মানুষের কাছে যার ভাষা মৃত ও অর্থহীন। কিন্তু মিসিসিপি আমার কাছে একটা খোলা বই।’ মূলত মিসিসিপি নদীই তাঁকে গড়ে তুলেছিল চিরসফল, চিরস্মরণীয়, বরেণ্য এক সুরসিক লেখক আর সত্যিকারের এক মানুষ হিসেবে।

মার্ক টোয়েন বিয়ে করেন ১৮৭০ সালে। স্ত্রী ওলিভিয়া। তিন মেয়ে আর এক ছেলে ছিল তাঁদের। বড় মেয়ে সুসি ১৩ বছর বয়সে বাবাকে নিয়ে লিখেছিল, ‘অসাধারণ সুন্দর! শুধু দাঁতগুলো অত সুন্দর নয়। তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল। অবশ্য মুখে কোনো দাঁড়ি নেই। খুব

মজার মানুষ তিনি।' বাবার অভ্যাস সম্পর্কে সেই বায়োগ্রাফিতে সুসি লিখেছে, 'তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হতো তাঁর, তখন তিনি পুরো রাত দাঁড়িয়ে থাকতেন আর লিখতেন।' সারা রাত ধরে কী লিখতেন তিনি? মার্ক টোয়েন বলেন, 'বই লেখাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। লেখালেখি আমার কাছে কখনোই কাজ বলে মনে হয়নি।'

মার্ক টোয়েনের কিছু মজার কথা

⇨১. অঘোরে ঘুম অথচ মুখে জ্বলন্ত সিগারেট: মার্ক টোয়েন সিগারেট খেতেন বিরতিহীনভাবে। স্ত্রী অলিভিয়া ও অন্যান্য অনেক বন্ধুর তিক্ততার উৎস হয়েছিল তাঁর সিগারেট খাওয়া। ঔপন্যাসিক দিন হাওয়েল্স একবার বলেছিলেন, 'যে কদিন তিনি (টোয়েন) আমাদের সঙ্গে থাকতেন, বাড়িজুড়ে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কারণ তিনি সকালের নাশতা থেকে রাতে বিছানায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত সিগারেট খেতেন। এমনকি বিছানায়ও যেতেন মুখে সিগারেট নিয়ে। মাঝে মাঝে দেখা যেত, তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন কিন্তু তাঁর মুখে তখনো জ্বলন্ত সিগারেট!' এই অভিযোগের বিপরীতে মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, 'এখন থেকে সিগারেট খেতে সংযমী হব।' কী রকম সংযম? 'মাত্র একটা সিগারেট, একটা মুহূর্তে!'

⇨ ২. মার্ক টোয়েনের বক্তৃতা: একবার মার্ক টোয়েন একটা শহরে গেছেন বক্তৃতা করতে। বক্তৃতার আগে শেভ করতে গেলেন একটা সেলুনে। 'এই প্রথম এখানে এসেছি'—মার্ক টোয়েনের এ কথা শুনে নাপিত বলল, 'ভালো সময়ে এসেছেন। আজ রাতে এখানে মার্ক টোয়েন বক্তৃতা করবেন। মনে হয় আপনিও যাবেন?' 'সে রকমই ভাবছি'—বললেন টোয়েন। 'কিন্তু টিকিট কেটেছেন কি?' টোয়েন বললেন, 'না।' 'এখন তো সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে। আপনাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে।' নাপিতের এই কথা শুনে মার্ক টোয়েন একটু হেসে বললেন, 'এটা আমার ভাগ্য। মার্ক টোয়েন বক্তৃতা করলে আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।'

⇨ ৩. ভদ্রতার খাতিরে দুবার; কিন্তু মিথ্যা কথা

তিনবার না: একবার তাঁর বন্ধু হেনরি আরভিং মার্ক টোয়েনকে একটা হাসির গল্প শোনাচ্ছিলেন। গল্পের একপর্যায়ে হেনরি থেমে গিয়ে টোয়েনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ধারণা, এই গল্পটা তুমি শোনোনি। শুনেছ কি?' টোয়েন তাঁকে নিশ্চিত করলেন, 'না।' কিছুক্ষণ পর আবার থেমে হেনরি একই প্রশ্ন করলেন। টোয়েন পুনরায় বললেন, 'না।' কিন্তু গল্পটা শেষ হওয়ার আগে আরেকবার থামলেন হেনরি। এবং সেই একই প্রশ্ন, 'তুমি শতভাগ নিশ্চিত যে এই গল্পটা জানতে না?' 'দেখ, আমি একবার মিথ্যা বলতে পারি,' মার্ক টোয়েন বলছেন, 'ভদ্রতার খাতিরে দুবার মিথ্যা বলতে পারি, কিন্তু আমি কখনোই তিনবার মিথ্যা বলতে পারি না।' তার মানে? 'মানে গল্পটা আমি শুধু শুনেছি তা নয়,' মার্ক টোয়েন মৃদুস্বরে বললেন, 'গল্পটা বানিয়েছি আমি নিজেই!'

⇨ ৪. আরও আগে বিয়ে না করে বোকামি করেছি: মার্ক টোয়েন বিয়ে করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। বিয়ের দুই সপ্তাহ পর এক বন্ধুকে মার্ক টোয়েন লিখলেন, 'বিয়ের পরবর্তী জীবনটা যদি এমন সুখে-শান্তিতে কাটে, যেভাবে আমার কাটছে। তাহলে বলতে হয়, আমি জীবন থেকে ত্রিশটা বছর বোকামি করে নষ্ট করেছি আগে বিয়ে না করে! যদি আবার কোনো জীবন থাকে, তবে সেই জীবনে আমি বিয়ে করব একেবারে বাল্যকালে!'

⇨ ৫. মার্ক টোয়েনের বিছানা: মার্ক টোয়েন বিছানায় শুয়ে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ রকম একদিন তিনি বিছানায় শুয়ে লেখালেখি করছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে বললেন, 'তোমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য বাইরে একজন সাংবাদিক অপেক্ষা করছেন।' কিন্তু মার্ক টোয়েন বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। তাঁর স্ত্রী বললেন, 'কী ব্যাপার, ওঠো! তোমাকে বিছানায় দেখলে লোকটা তো বিরক্ত বোধ করবে।' 'সমস্যা কী?' মার্ক টোয়েন বললেন, 'আমাদের আরেকটা বিছানা আছে না? সেটাই না হয় তার জন্য ছেড়ে দেব!' হ্যাঁ, বিছানায় বসে নির্ঘুম সারা রাত লেখালেখি করেই এত বিশ্বখ্যাতি।

মার্ক টোয়েনের জন্ম হয়েছিল যে বছর, সেবার পৃথিবীর আকাশে আবির্ভাব হয়েছিল হ্যালির ধূমকেতুর। ১৯০৯ সালে কোনো এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে এসেছি ১৮৩৫ সালে। সে আসে ৭৫ বছর পর পর। আগামী বছর (১৯১০) সে আবার আসবে এই পৃথিবীর আকাশে। আমি তার সঙ্গেই চলে যেতে চাই। যদি যেতে না পারি, তবে সেটা হবে খুবই কষ্টকর। অবশ্য পরমেশ্বর বলেছে, মার্ক টোয়েন আর হ্যালির ধূমকেতু হলো ব্যাখ্যাতীত বিস্ময়। ওরা একসঙ্গে এসেছে, ওদের যেতেও হবে একই সঙ্গে!' ২১ এপ্রিল ১৯১০। যখন পৃথিবীর আকাশে আরেকবার দেখা গেল হ্যালির ধূমকেতু।

সেই সঙ্গে, অবশেষে হার্ট অ্যাটাকে চিরনিদ্রায় সেদিনই শুয়ে পড়লেন মার্ক টোয়েন! সত্যিই মার্ক টোয়েন আর হ্যালির ধূমকেতু যেন ব্যাখ্যাতীত বিস্ময়।

জে কে রাউলিং(হ্যারি পটার সিরিজের লেখক)

ফল হওয়ার ইচ্ছাটা থাকা চাই



ব্রিটিশ লেখক জে কে রাউলিংয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হ্যারি পটার সিরিজের জন্য। ছোটবেলা থেকেই মজার মজার গল্প লিখতেন তিনি, আর সেই গল্পগুলো লেখা শুরু করেছিলেন তাঁর বোনকে পড়ে শোনানোর জন্য। জে কে রাউলিং এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ধনী নারীদের মধ্যে ১২তম। ২০০৮ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি এই বক্তব্যটি দেন। সমাবর্তন উপলক্ষে বক্তব্য দেওয়া বিশাল একটি

দায়িত্ব। আমি আমার সমাবর্তনকে মনে করছি। তখন সমাবর্তন স্পিকার ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ব্যারোনেস মেরি ভারনক। তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন আমাকে সাহায্য করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমার লেখায়।

আসলে আমি আমার মন ও হৃদয়কে একটি ছকে বেঁধেছিলাম এবং কী শপথ করেছিলাম, তা-ই আজ বলব। আমি আমাকেই জিজ্ঞেস করতাম, কী চাই? ২১ বছরে স্নাতক পাস করেছি, ডিগ্রি অর্জন করেছি, কিন্তু আমি কী শিখেছি আমার শিক্ষাজীবন থেকে? এখান থেকে আমি দুটো উত্তর পেয়েছি। আমাদের একাডেমিক সাফল্য উপলক্ষে যেদিন সবাই একত্র হয়েছিলাম, সেদিন আমি আলোচনা করেছিলাম, আমার সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার মধ্যে আমার লাভ কী? আমার জীবন আর তোমাদের জীবনের মাঝের যে সময়টুকু সেটাই 'বাস্তব জীবন'। আমি চাই, আমার মতো তোমাদেরও কল্পনার শিখা যেন অনেক উজ্জ্বল হয়।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার ২১ বছর বয়সী জীবনে, যখন সবে গ্র্যাজুয়েশন করেছি। তখন আমি নিজেই আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। আমি চাইতাম লিখতে, উপন্যাস লিখতে। আমার মা-বাবা দুজনের কেউই কলেজে যাননি। তাঁরা খেয়াল করতেন, আমার উচ্চকল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু তাঁরা আশা করতেন, আমি যেন একটি কারিগরি ডিগ্রি অর্জন করি। আর আমি চেয়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে। আমি তখন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলাম যে কেউই তার অবস্থানে খুশি নয়। তারপর আমি আধুনিক ভাষা নিয়ে পড়া শুরু করলাম।

আমি মনে করতে পারি না যে আমার মা-বাবা কখনো বলেছেন, আমি ভালো পড়াশোনা করি। আমি যেদিন গ্র্যাজুয়েশন পূর্ণ করি, সেদিনই হয়তো তাঁরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, আমি পড়াশোনা করি। আমি আমার মা-বাবার দৃষ্টিকোণকে দোষ দিই না। যদি তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকে এবং তুমি ভুল পথে যাও, তখন তোমার মা-বাবাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই।

কারণ স্টিয়ারিং তো তোমার হাতেই ছিল। আমার মা-বাবা গরিব ছিলেন, ফলে আমিও। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত, দারিদ্র্য খারাপ কোনো অভিজ্ঞতা নয়। দরিদ্রতার মধ্যে আছে ভয়-ভীতি, কষ্ট আর হতাশা। এই দরিদ্রতাকে জয় করতে হয় নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। এটা যখন প্রয়োজন ঠিক তখনই হতে হবে। মনে রাখা উচিত, বোকাদের কাছে দরিদ্রতা রোমাঞ্চকর হতে পারে, তোমার কাছে নয়। আমি তোমাদের বয়সে ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক দূরে একটা কফিশপে বসতাম আমার গল্প লেখার জন্য। ক্লাসেও মনোযোগ দিতাম লেকচারের প্রতি। পরীক্ষায় পাস করার পর প্রতিবছরই আমি আমার সাফল্যের কথা হিসাব করতাম।

আমি জানি, তোমরা এখন প্রাপ্তবয়স্ক, এখন উচ্চশিক্ষিত। তো সেই তোমরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারবে না, তা আমি মানি না। বুদ্ধিমত্তা কখনোই ভাগ্যের কারণে ব্যর্থ হতে পারে না এবং আমি এক মুহূর্তের জন্যও তা মনে করিনি। তোমরা হার্ভার্ড থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছ, তোমরা ব্যর্থতার সঙ্গে ততটা পরিচিত নও। সফল হওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে ব্যর্থতা সম্পর্কেও তোমাদের একটু হলেও ধারণা থাকা ভালো। প্রকৃত পক্ষে, ব্যর্থতা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আর একজন মানুষের সফলতা সম্পর্কে ধারণা খুব বেশি দূরের নয়।

একসময় আমার জীবনটা অন্ধকারে ছিল। আমার কোনো ধারণা ছিল না, কী হচ্ছে বা কী হতে যাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল না, এই অন্ধকারের খালটি কত বিস্তৃত হবে। তবে কেন জানি মনে হতো, একটি দিক থেকে হয়তো আলো আসবে।

আমি নিজের ওপর বিশ্বাসের জোরটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি আমাকে বোঝাতে চাইতাম, আমি কী। তার পর থেকে আমি সরাসরি আমার শক্তি বা সামর্থ্যকে ব্যবহার করেছি কোনো কাজের ভালো একটা ইতি টানতে। আমি বিশ্বাস করতাম, আমি যেকোনোভাবেই সফল হব। আমার সাফল্য কখনোই কোনো নির্দিষ্ট একটা পথ বেয়ে আসেনি। আমি বিশ্বাস

করতাম, আমি সত্যিকার অর্থেই আমার সঙ্গে আছি। আমি নিজেকে মুক্ত করেছিলাম। কারণ আমার ছিল নিজেকে চেনার বিশাল এক ক্ষমতা। আমি বিশ্বাস করতাম আমাকে। আমি আমার নিম্নবিত্ত মা-বাবার মেয়ে ছিলাম। আমার একটি পুরোনো টাইপ রাইটার ছিল এবং এর সঙ্গে ছিল বড় একটা স্বপ্ন। এ বাস্তবতাই আমাকে নতুন করে, সক্ষম করে গড়ে তুলেছে। আর আমার ছিল কল্পনা করার ক্ষমতা। এটার একটা অংশই আমাকে পুনরায় গড়তে সহায়তা করেছে, কিন্তু পুরোটা নয়। আমি শিখেছি, বিশাল এক অনুভূতির মধ্যে কল্পনার বা কল্পনাশক্তির কী মূল্য। কল্পনাশক্তিই আবিষ্কার আর অনাবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। কল্পনাশক্তি যদি প্রবল হয়, তবে সফল হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, করতে হবে এর যথাযথ ব্যবহার। সবাই পারে না। যারা পারে তারাই সফল। সুতরাং তুমি নিজেই ঠিক করো, তুমি কোন দলে থাকবে।

আমার সফলতম অভিজ্ঞতা হলো হ্যারি পটার। আমি একনাগাড়ে, পর্যায়ক্রমে লিখে গেছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞটি শুরু হয়েছিল আমার চাকরির শুরুর দিকে। আমি তখন চাকরি করতাম লন্ডনের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তরে আফ্রিকান গবেষণা বিভাগে। অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি আসত, যেখানে থাকত কী ঘটছে সেখানে, আর ঘটনাগুলো যেন সারা বিশ্ব জানতে পারে। আমি তাদের ভয়ানক ছবি দেখেছিলাম। আমি সেসব মানুষের অত্যাচারের ছবি দেখেছি।

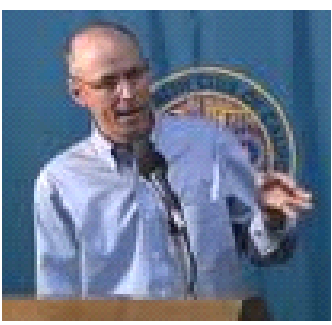
প্রায় প্রতিদিনই আমি মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ হয়ে তারই স্বজাতি মানুষের ওপর আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এবং এখন পর্যন্ত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনেক কিছু শিখছি, যা এর আগে কখনো শুনিনি, শিখিনি।

যা-ই হোক, আমার সর্বশেষ আশার কথাটি বলছি। আমি যখন ২১ বছরে ছিলাম, তখনকারই কথা। যাদের সঙ্গে আমি গ্র্যাজুয়েশনের দিন একসঙ্গে বসেছিলাম, তাদের

অনেকেই আজ তাদের নিজ গুণে মানবসেবা এবং মানুষের জন্য কাজ করছে। অনেকেই শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। তারা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের জন্য মৃত্যুভয়কেও হটিয়ে দিয়েছে। আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে আমরা প্রচুর আশার মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম, যা আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে হয়েছিল। এ রকম কখনোই আর আসবে না।

সুতরাং আজকের দিনে তোমাদের মধ্যে সে রকম বন্ধুত্ব ছাড়া বেশি কিছু থাকার কথা নয় এবং আগামীকাল আমি আশা করি, যদি তুমি আমার একটি শব্দও মনে রাখো, তবে একটু হলেও সাহস পাবে সামনে চলার। যদি এটা গল্পের মতো হয়, তবে এটাই জীবন। সেটা কত দীর্ঘ, তা নয়, কত ভালো এটাই হচ্ছে বিষয়। (ইন্টারনেট থেকে নেওয়া, সংক্ষেপিত ভাষান্তর: মোহাম্মাদ আলী)

ডেভিড শেংক('দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস')



আমরা সবাই 'জিনিয়াস'

'সবকিছু জিনেই আছে'—জিনবিজ্ঞানের এই বেদবাক্যকে একরকম উড়িয়ে দিয়ে ডেভিড শেংক বলছেন, 'জিন, প্রতিভা আর জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা ভুল!' সমপ্রতি এ নিয়ে তাঁর আলোচিত-সমালোচিত বই 'দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস'। এই বইতে তিনি বলছেন, 'আকাশ-সমান স্বপ্ন আর স্বপ্নজয়ের অদম্য সাহস থাকলে নিরলস শ্রমসাধনার মাধ্যমে যে কেউ হতে পারে মহাজ্ঞানী আইনস্টাইন-নিউটন বা খ্যাতনামা খেলোয়াড় টেড উইলিয়ামস-মাইকেল জর্ডান অথবা সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞ বেটোফেন-মোজার্ট।' জিনের কথিত জাদুখেলায়

যুক্তির জল ঢেলে ডেভিড শেংক দেখাতে চেয়েছেন যে সবার জিনেই সুপ্ত আছে প্রতিভা। সেই প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে চাই তীব্র ইচ্ছা, মনঃসংযোগ আর অবিরত অনুশীলন। এসবই বলেছেন ৪৩ বছর বয়সী ডেভিড শেংক তাঁর 'দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস' বইতে।

'সোনালি জিন' বলে কিছু নেই , কে বলেছে আপনি একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট হতে পারবেন না? বা একজন সুরসম্রাট কিংবা একজন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী? হয়তো হাসাহাসি শুরু হবে, যদি বলি, যে কেউ যা কিছু করতে চাই বা যা কিছু হতে চাই, তা সম্ভব। কিন্তু এও কি হাসির ব্যাপার নয় যে, আপনি নিজের ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ না করেই আর সর্বোচ্চ সময় না দিয়েই নিজের ক্ষমতা-দক্ষতা বা প্রতিভার কাল্পনিক একটা সীমারেখা তৈরি করেন? আইনস্টাইন বা বেটোফেনের দিকে তাকিয়ে অনেকেই বলেন, তাঁদের প্রতিভা হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত। আসলে জন্মের সময় স্রষ্টার দেওয়া 'সোনালি জিন' বলে কিছু নেই। প্রকৃতিগত নয়, বরং প্রতিভা হলো অদম্য ইচ্ছা আর প্রশিক্ষণের ফল।

প্রতিভার কোনো পরিধি নেই: জিন যেমন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, একইভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জিনকে প্রভাবিত করে। তাই জিনে মানুষের দক্ষতার কোনো স্থায়ী সীমারেখা থাকতে পারে না। আসলে আমাদের ক্ষমতার খবর আমরা নিজেরাই জানি না। 'জিন' নামের প্রবাদ-পাথরে প্রতিভার কোনো পরিধিই আঁকা নেই। প্রতিভা হলো কোমল কাদামাটির মতো, যা দিয়ে বানানো যায় মনের মতো মূর্তি। বিনয়, স্বপ্ন, অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি আর লক্ষ্য ছোঁয়ার অটুট সংকল্প থাকলে যেকোনো বয়সে আপনিও হতে পারেন বিশ্বখ্যাত প্রতিভার অধিকারী।

জিনিয়াস হওয়ার জিন : মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বা প্রতিভা জীবাশ্ম জ্বালানি নয় যে তা একটা সময়ে এসে ফুরিয়ে যায়। কার্যত এটা হলো বায়ুশক্তির মতো। ইচ্ছেমতো কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত হওয়া যায়। জিনিয়াস হওয়ার জিন সবার মধ্যেই আছে। আমরা দরকারি পরিবেশ-

প্রতিবেশ আর মানসিকতার অভাবে ভেতরের আলোটা ভালোভাবে বের করে আনতে পারছি না। ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী অ্যান্ডারসন এরিকসন ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর একটা পরীক্ষার কথা বলা যায়। তাঁরা জানার চেষ্টা করেছেন, কী এমন জিনিস বা প্রক্রিয়া যা কিছু মানুষকে বিশেষ বা বিখ্যাত বানিয়ে দেয়? তাঁরা এই প্রতিভা-পরীক্ষার গিনিপিগ হিসেবে এস এফ নামের এক যুবককে বেছে নেন। যুবকটি মাত্র সাত অঙ্কের সংখ্যা স্মরণে রাখতে পারত। গবেষণার শেষে এসে দেখা গেল, আশির চেয়েও বেশি অঙ্কের সংখ্যা সে দিব্যি মনে রাখতে পারে। তার মানে, স্মৃতির কোনো ধরাবাঁধা সীমারেখা নেই!

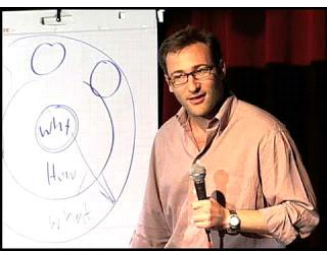
টেড উইলিয়ামস, মাইকেল জর্ডান, মোজার্ট বা বেটোফেনের প্রতিভার কথা সবাই জানি। মনে করার কোনো কারণই নেই যে তাঁদের জিন ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত। ওই ভাবনার আজ সময় ফুরিয়েছে। আসলে তাঁদের সবার মধ্যে একটা মিল আছে—প্রত্যেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন নিজের দক্ষতাকে শানানোর জন্য। খালি চোখে দেখলে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলনই শুধু চোখে পড়ে; কিন্তু আরও গভীরে গেলে ধরা পড়ে, তাঁরা আরও অনেক বেশি এবং জীবন দিয়ে সাধনা করেন।

অদম্য আগ্রহ, অবিরত অনুশীলন : যুক্তরাষ্ট্রের বেসবল কিংবদন্তি টেড উইলিয়ামস। বলা হয়, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরপ্রদত্ত খেলোয়াড়। কিন্তু তিনি নিজে বলেছেন, 'নিজেকে যতটুকু উজাড় করে খেলি, আমার অর্জনটাও সে রকম। একমাত্র অনুশীলনই সেই খ্যাতি এনে দিয়েছে আমাকে। শৃঙ্খলা মেনেছি সব সময়। অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কিছু নয়, আমার সফলতার কারণ আমার অদম্য আগ্রহ আর অনুশীলন।' হ্যাঁ, তিনি এমনই অনুশীলন করতেন যে কখনো কখনো আঙুল ফেটে রক্ত ঝরছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই যেন নেই। এ রকম অনুশীলন করেছেন কখনো? হতাশার কিছু নেই। স্বপ্নটা আঁকড়ে ধরুন। সংকল্পে অটল থাকুন। নিয়মিত অনুশীলন করুন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায়ই আপনার প্রতিভার প্রমাণ

দেবে। নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: জাহাঙ্গীর আলম

সাইমন সিনেক(পেশাদার লেখক ও বক্তা)

সফলতার জন্য তিন প্রশ্ন



সাইমন সিনেক একজন পেশাদার লেখক ও বক্তা, বর্তমানে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ কৌশল বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন। জন্ম ১৯৭৩ সালের ৯ অক্টোবর ইংল্যান্ডে। এই বক্তৃতা তিনি দেন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, ওয়াশিংটনে।

কেমন লাগে যখন কোনো কাজই মনের মতো হয় না? অথবা, যখন আপনার মতোই কেউ এমন কোনো অসাধ্য সাধন করে ফেলে. যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না? সব হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়ে এমন কিছু ব্যাপার সব সময়ই ঘটে, যা আমরা সাধারণ নিয়মে মেলাতে পারি না। স্টিভ জবসের অ্যাপলের কথাই ধরা যাক, বছরের পর বছর অ্যাপল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর চেয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অনেক ধাপ এগিয়ে আছে। কী এমন আছে অ্যাপলের, যা তাদের আর সবার চেয়ে আলাদা করে রেখেছে? অথবা রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের অ্যারোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনি। তখনকার দিনে অসংখ্য আবিষ্কারক ছিল, তাদের নিজেদের অতুলনীয় যোগ্যতা আর পৃষ্ঠপোষকের টাকার জোর থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ই মানুষের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরেও কিছু একটা এখানে কাজ করছে। দুনিয়া কাঁপানো সব নেতৃত্ব কিংবা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, এদের সবার মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে। তারা সবাই একইভাবে চিন্তা করে, কাজ করে আর নিজেদের উপস্থাপন করে, যা কি না বাকি সব মানুষের থেকে শুধু ভিন্নই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত!

কেন? কীভাবে? কী? এই ছোট্ট তিনটি প্রশ্নই বলে দেয় কেন কেউ সফল হয় আর কেউ হয় না। শুরু করা যাক 'কী' থেকে। আমরা সবাই জানি, আমাদের কাজটা কী, আমরা আসলে কী করছি। কেউ কেউ জানি যা করছি, তা কীভাবে করছি, ঠিক কীভাবে এই কাজটা করতে হয়। কিন্তু কজন জানি যে আমরা যা করছি, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী? কাজটা কেন করছি আমরা? 'কেন', এই প্রশ্নটি যত সরল মনে হয়, আসলে মোটেও তেমন নয়। 'কেন'—এই প্রশ্নের উত্তরই বলে দেয় আমাদের লক্ষ্য কোনটি, আমাদের বিশ্বাস কী, আমাদের অস্তিত্বের কারণ কী। আর লক্ষ্য সম্পর্কে এমন পরিষ্কার ধারণা খুব কম মানুষেরই থাকে। আমরা আগে ভাবি কী করতে হবে, তারপর ভাবি কীভাবে করতে হবে, কিন্তু কেন করতে হবে আর করলে তা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাটিই আমাদের মাথায় আসে না। শুধু ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ও আমরা উল্টোভাবে চলি। যার ফলাফল দাঁড়ায়, আমরা শুধু আমাদের কথাই বলে যাই, আমরা ভেবে দেখি না, আমরা অন্যকে যা করতে বলছি, সে তা কেন করবে।

আমাদের সচরাচর কথাবার্তার সঙ্গে অ্যাপলের বিজ্ঞাপনগুলোর একটু তুলনা করে দেখুন। অ্যাপল যদি আমাদের মতো 'কী' প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করত, তাহলে তাদের বলতে হতো, 'আমরা দারুণ সব কম্পিউটার বানাই। এগুলোর ডিজাইন সুন্দর আর ব্যবহারও সহজ।' এমন গৎবাঁধা কথা বললে আদৌ কি কেউ অ্যাপলের কম্পিউটার কিনত? একেবারেই না! অথচ আমরা সবাই এভাবেই কথা বলছি সারা দিন! আমরা বলতে থাকি আমরা কী করি, আমরা অন্যদের চেয়ে কীভাবে আলাদা আর এসব বলেই আমরা আশা করি সবাই আমাদের কথায় ইতিবাচক সাড়া দেবে, আমাদের কথামতো কাজ করবে, বা আমাদের কাছ থেকে কিছু কিনবে। কিন্তু আসলে এভাবে মানুষকে কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করা যায় না।

আমরা কী করি, তার চেয়ে মানুষের মনে

অনেক বেশি নাড়া দেয়, আমরা কাজটি কেন করি। অ্যাপল নিজেদের তুলে ধরে উদ্ভাবন আর ভিন্নতার এক অনন্য সমন্বয় হিসেবে। তারা প্রচলিত ধারণার বাইরে ভিন্নতায় বিশ্বাস করে আর এই বিশ্বাসই তাদের আর ১০টি কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানির চেয়ে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কম্পিউটার প্রয়োজন এমন যে কারও কাছেই নিজেদের পণ্য গছিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাপল কোনো চেষ্টাই করে না। তারা ঠিক তাদের সঙ্গেই ব্যবসা করে, যারা অ্যাপলের ভিন্নতা আর বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠনটাই এ রকম যে ভাষা বুঝতে পারা আর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে মস্তিষ্কের বাইরের অংশে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মস্তিষ্কের ভেতরের অংশে, যা কি না সব অনুভূতির উৎপত্তিস্থল। মজার ব্যাপার হলো যে অংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সম্পাদন করা হয়, তার সঙ্গে ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ গালভরা বুলি কিংবা জটিল সব তথ্য-উপাত্ত দিয়ে কাউকে কোনো কিছু প্রমাণ করে দেখালেও সে বলতে পারে, 'ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না।' এই 'মনে হওয়া'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দীপক। তাই কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে প্রথমে আপনার নিজের ভেতর যে বিশ্বাস কাজ করে, তাকেও সেই বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হবে। তারপর আসবে যুক্তি আর তথ্য উপস্থাপন করে বোঝানোর পালা। যদি আপনি কোনো কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দেন যে কাজটি করার যোগ্যতা রাখে, তবে সে বেতন পাওয়ার জন্যই কাজ করবে। কিন্তু যদি এমন কেউ থাকে যে কাজটি পারে এবং আপনি যে কারণে কাজটি করতে উৎসাহী, সেই উৎসাহ তার ভেতরে আছে, একই বিশ্বাসে সেও বিশ্বাস করে; তাহলে সেই ব্যক্তি তার জীবন দিয়ে আপনার জন্য কাজ করে যাবে, শুধুই বেতনের জন্য নয়। আর কেউ যখন নিজের ভেতরের তাড়নায় কাজ করে, সে কাজে সাফল্য অবধারিত।

১৯৬৩ সালে লুথার কিং যখন ওয়াশিংটনের

তাঁর বর্ণবাদবিরোধী অমর বক্তব্য দেন, সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হয়েছিল তাঁর কথা শোনার জন্য। তখনকার দিনে এত মানুষ কীভাবে একত্র হতে পেরেছিল? কেউ তাদের কোনো আমন্ত্রণ পাঠায়নি, লুফার কিং কোনো নামকরা বক্তাও ছিলেন না। তিনি শুধু সবার কাছে একটি কথাই প্রচার করেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি...'। তাঁর বিশ্বাস আর চিন্তা যাঁদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, যাঁরা সেই বিশ্বাসকে নিজেদের বিশ্বাসে পরিণত করেছিলেন, তাঁরাই সেই ধারণাকে তাঁদের চারপাশের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। শেষপর্যন্ত প্রায় অখ্যাত, অপরিচিত এক বক্তার কথা শোনার জন্য সমবেত হয় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। তাঁদের কেউই লুথার কিংয়ের আকর্ষণে সেখানে হাজির হননি। তাঁরা এসেছিলেন তাঁদের নিজেদের জন্য, বর্ণবাদের অসারতায় তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসই তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই জনসভায়। আর এখনকার দিনের রাজনীতিবিদদের বক্তৃতার অবস্থা দেখুন! তাঁদের প্রতিশ্রুতির পাহাড় আর বড় বড় পরিকল্পনার কাহিনি জনগণকে আর এতটুকুও উজ্জীবিত করতে পারে না।

প্রকৃত নেতাকে জনতা অনুসরণ করে কোনো বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে নয়। তারা স্বেচ্ছায়, ভালোবেসে, বিশ্বাস করেই নেতাকে সমর্থন জানায়। আর যে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর জেনে পথ চলা শুরু করে, কেবল সেই পারে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে, অথবা এমন কাউকে খুঁজে নিতে যে তাকে অনুপ্রাণিত করে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

সূত্র: ইন্টারনেট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

অপরাহ উইনফে('দি অপরাহ উইনফ্রে শো')

মানুষকে ভালোবাসো



'দি অপরাহ উইনফ্রে শো'র জন্য আলোচিত অপরাহ উইনফ্রে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ধনাঢ্য ও আলোচিত নারী। একনাগাড়ে দীর্ঘ ২৫ বছর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সম্প্রচারের পর ২৫ মে, ২০১১ অপরাহ উইনফ্রে অনুষ্ঠানটির ইতি টানেন একটি স্মরণীয় ও সংবেদনশীল বক্তৃতার মধ্য দিয়ে।

অনেক ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে কাজ আমরা সবচেয়ে ভালো করি, আমাদের সেটাই করা উচিত। এ অনুষ্ঠানের পুরোটাই মানুষের জন্য। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সবাইকে জানাতে চাই তাদের ক্ষমতার কথা, যা দিয়ে তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে এবং তারা কেউই একা নয়। 'দি অপরাহ্ উইনফ্রে শো'র জন্য অতিবাহিত ৪৫৬১ দিনের মঞ্চে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই যেন আমার কাছে একেকটি মুহূর্ত। আমি যখন আরম্ভ করি, তখন বয়স ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। আমার কোনো স্বপ্ন ছিল না, ছিল না কোনো প্রত্যাশা। প্রথম দিনটাই যেন একটা বজ্রাঘাত। সেদিন কোনো দর্শক ছিল না। দুই বছর পর জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারের পর রজার কিং আমাকে জানালেন, এক স্টেশন ম্যানেজার তাকে জানিয়েছে, অনুষ্ঠানের মঞ্চে হাস্যকর একজন কৃষ্ণাঙ্গকে বসানোর চেয়ে একটা আলু রাখাও ভালো। কিন্তু আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ যে মেমফিস থেকে ম্যাকন; পিটস্বার্গ থেকে পেনসাকোলা; নিউইয়র্ক থেকে নিউ অরলিনস—

আপনারা সবাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি যখন আমার পুরোনো ৪৫৬১টি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের দিকে ফিরে তাকাই, আমাদের পরিশ্রম চোখে পড়ে না, আমি দেখতে পাই কত বিচিত্র ও জটিল পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে আমাদের। আজ যেখানে আমরা ছিলাম ক্রিস রকের সঙ্গে, পরদিনই আমরা কাটিয়েছি সংঘর্ষে অঙ্গ হারানো সৈনিকদের সঙ্গে। এর পরদিন হয়তো আমরা চলে গিয়েছিলাম হেরোইনে আসক্ত একটি পুরো পরিবারের সঙ্গে।

জ্যাকি সাবিউরিডো (দুর্ঘটনায় যার পুরো মুখ পুড়ে গিয়েছিল) থেকে মা মনিকা জর্জ, তার মেয়ে ও সেই শিশুটি (যে তার দুই হাত, দুই পা হারিয়েছে) পর্যন্ত, যা আমি অর্জন করেছি তা আমার হৃদয়কে থমকে দেয়। কারণ আমরা নিজেদের সহজাতভাবেই নিজেদের যোগ্য করে তুলতে পারিনি। এই শো আমাকে শিখিয়েছে যে তুমি প্রশংসার যোগ্যতা রাখ, কারণ এত প্রতিবন্ধকতা নিয়েও তুমি পৃথিবীতে আছ। তোমার উপস্থিতিই তোমার জন্মাধিকারকে পূর্ণ করে তোলে এবং তুমি নিজেই যথেষ্ট।

আমি এই পুরো যাত্রায় প্রায় ৩০ হাজার ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি, যেখানে সবার মধ্যেই একটি বিষয়ের মিল: সবাই নিজেদের স্বীকৃতি চায়। তুমি যার সঙ্গেই কথা বল না কেন, সবার সাধারণ একটি আকাঙ্ক্ষা যে তারা জানতে চায়, 'তুমি কি আমাকে দেখ? শুনতে চায় কিংবা আমি যা বলি তা কি তোমার কাছে মূল্যবান?' এই মূল সূত্রই আপনাদের সামনে মাইক্রোফোন হাতে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

মানুষ প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার এই অনুষ্ঠানের সফলতার গোপন রহস্য কী? কীভাবে আমরা ২৫ বছর ধরে অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি উত্তর দিই, 'সফলতার গোপন কথাটি হলো, আমার এই টিম এবং যিশু।' আমি কখনোই একা ছিলাম না এবং তোমরাও কখনো একা নও।

২৫ বছরের যাত্রায় আমরা অনেক বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলেছি। অনেক স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা পরবর্তী

সময়ে লাখ লাখ দর্শকের মনে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে।
২৫ বছর ধরে আপনারা ছিলেন আমার নিরাপদ আশ্রয়। আমি আশাবাদী যে আপনারা অবশ্যই অন্যদের জন্যে এমন নিরাপদ আশ্রয় হবেন। এই শো আপনাদের জন্য যা করেছে বলে আপনারা আমাকে বলেন, সেগুলো অন্যদের জন্য বাস্তবায়ন করুন। তাদের পাশে একাত্ম হয়ে দাঁড়ান, তাদের গ্রহণ করুন। কাউকে ভালোবাসুন। অন্তত একজনকে। এবং তা ছড়িয়ে যাক আরেকজনের মাঝে, এবং এভাবে যত বেশি পারা যায়। আপনি নিজেই দেখবেন এটি কী পরিবর্তন এনে দেয়।
আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাই, ১৯৫৪ সালে মিসিসিপির একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার জন্ম, যেখানে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের স্বপ্ন এতটায় সীমিত ছিল যে, সে হয়তো কাজের লোক কিংবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর একজন শিক্ষক হবে; হয়তো এভাবেই স্বপ্নের শেষ। কিন্তু এটি কোনো আকস্মিকতা নয় যে একাকী ছোট একজন মেয়ে, যে অনেক অনেক ভালোবাসা পায়নি, যদিও আমার পরিবার তাদের সাধ্যমতো করেছে; কোনো আকস্মিকতা নয় যে সেই মেয়ে আমি বড় হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের অকৃত্রিম সহানুভূতি, স্নেহ, বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে অনুভব করতে পারছি। আপনাদের যাদের নামও আমি জানি না, তাদের কাছে আমি শিখেছি ভালোবাসা কী। আপনারা এবং এই অনুষ্ঠান আমার জীবনের অসাধারণ ভালোবাসার উৎস।
আমি কখনোই 'বিদায়' বলব না। আমি শুধু বলব, আমাদের আবার দেখা হয়।
ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত, ইংরেজি থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখতী সানী

মাইক বেকার(বিবিসির শিক্ষা বিষয়ের সাংবাদিক)

জানার জন্যই জানতে চাই



২০১১ সালে অক্সফোর্ড ব্রুকস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তব্য দেন মাইক বেকার। দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা করেছেন বিবিসিতে, শিক্ষা বিষয়ে।

আজ আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। সবাইকে অভিনন্দন।

আমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছি ৩২ বছর আগে, ১৯৭৯ সালে। মার্গারেট থ্যাচার তখন সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সনি ওয়াকম্যানকেই ধরা হতো শীর্ষ প্রযুক্তিপণ্য, গড়পড়তা বাড়ির দাম ছিল ১৩ হাজার পাউন্ড, মুদ্রাস্ফীতি ১৭ শতাংশ...আর আপনাদের বিশ্বাস হবে না, ফুটবল লিগে আমার প্রিয় দল ইপসউইচ টাউন ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়েও দুই ধাপ আগে! সেটা একেবারেই একটা অন্যরকম দুনিয়া ছিল।

তখন ইংল্যান্ডের স্কুলগুলো জাতীয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে এ পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে থ্যাচারের আমল থেকেই।

এর কিছু সময় পর থেকেই আমি শিক্ষা নিয়ে সাংবাদিকতা করতে শুরু করি।

আশির দশকের শেষে থ্যাচারই শুরু করেন জাতীয় পাঠ্যক্রম ও জাতীয় পরীক্ষার। এরই ধারাবাহিকতা চলছে এখনো।

তবে এখন আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষাক্ষেত্রকে স্বাধীনতা থেকে জবাবদিহির পর্যায়ে আনাটা অনেকটাই লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে।

পরীক্ষাগুলো সঠিক হচ্ছে না, তা বলছি না। কিন্তু এত ঘন ঘন পরীক্ষা নেওয়া আর এগুলোকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারও ঘটছে।

ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় একসময় সবচেয়ে কম পরীক্ষা নেওয়া হতো। মাত্র কয়েক দশকেই

এখন তা হয়ে গেছে অনেক বেশি। বেশির ভাগ স্কুলই শেখানোর বিষয়টাকে সঙ্কুচিত করে এনেছে। তারা জোর দিচ্ছে শুধু পরীক্ষার সিলেবাসের ওপর।

আমি ভাগ্যবান যে সিলেবাসের বাইরে অনেক কিছুই আমাদের শেখানো হতো। আর সে বিষয়গুলোই আমার জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে।

যেমন, আমাদের ইংরেজি শিক্ষকের মনে হয়েছিল ও লেভেলে ইংরেজি সিলেবাসটা খুবই ছোট। তাই তিনি আমাদের নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তখনই আমি আবিষ্কার করি জর্জ অরওয়েলের সাহিত্য, যা পরে আমার সাংবাদিক জীবনের বীজ বুনে দিয়েছিল।

বলা যায়, সেই প্রাইমারি স্কুলশিক্ষকের কথা, যিনি স্কুলে দুপুরের খাবারের সময়ে টেলিভিশনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে দিয়েছিলেন; যা আমাকে সারাজীবনের জন্য ক্রিকেটে আগ্রহী করে তুলেছে।

এসব কথা বললাম, বড় পরিসরে শিক্ষার বিষয়টি বলার জন্য। পরীক্ষার তারিখে চোখ না রেখে, ক্যারিয়ার বা শিক্ষায় পরের ধাপ পার হওয়ার বাধ্যবাধকতায় না থেকে শুধু শেখার বিষয়টি ভাবার জন্য।

তবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ, শিশুরা যাতে সেসব শেখে, যাকে আমাদের রাজনীতিকেরা মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য সব শিক্ষাকেও যেন আমরা সঙ্কুচিত না করি। শুধু শেখার আনন্দ পাওয়ার জন্য, নতুন কিছু জানার জন্যও যেন শিখি।

আর আমার এ ধারণা আরও শক্ত হয়েছে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর।

ছয় মাস আগে আমার চতুর্থ পর্যায়ের ফুসফুস ক্যানসার ধরা পড়ে। আমি হতবাক হয়ে যাই। কারণ, আমি কখনোই ধূমপান করতাম না। আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, একদম আগের মতোই জীবন যাপন করা। ক্যানসার আমাকে হারাতে পারবে না।

কিন্তু যখন কেমোথেরাপির প্রভাব পড়তে শুরু হলো, জীবন কতটা ছোট, তা আমি ভাবতে শুরু

www.facebook.com/tanbir.ebooks
করলাম। আর তখন থেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যেতে লাগল।

আমি আমার কাজটা খুব উপভোগ করতাম। কিন্তু এই সময়ে আমি উপলব্ধি করলাম, কাজকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমি যেন অন্যান্য বিষয়ে খুব সাদামাটা থেকে গেছি।

সব সময় আমি ডেডলাইন ধরার জন্য ছুটতাম। ১০টার খবরে কীভাবে আমার রিপোর্ট ধরাব, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম।

কিন্তু এখন আমি কাজ আর জীবনের ভারসাম্য চাই। আর শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্যই ছোটখাটো কিছু বিষয় শিখতে চাই।

যেমন, আমার আশপাশের গাছগুলো নিয়ে আমি জানতে চাই। এখন তাই আমি হাঁটতে যাই গাছ চেনে এমন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। আর কাঠের কাজ শেখার ক্লাসেও ভর্তি হয়ে গেছি।

এই তালিকাটা বেশ লম্বা, সেটা শুনিয়ে আপনাদের আর বিরক্ত করতে চাই না।

কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিস আছে—সেটা হলো, শেখার আগ্রহ। পেশাজীবনে ভালো করা বা উপার্জনের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা থেকে নয়, শুধু জানার জন্যই জানতে চাই।

আর এখন এটাই আমার উপলব্ধি, ডেডলাইন ধরার তাড়ায় যা কিছু আমি আগে এড়িয়ে গেছি, তা এখন শিখতে চাই।

আপনারা শিক্ষক হতে যাচ্ছেন, শুধু গ্রেড আর পাস নম্বরেই মনোযোগ দেওয়ার জন্য চাপ আসবে আপনাদের ওপর। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান।

মনে রাখবেন, এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর বাইরে অনেক বিছু শেখানোর আছে। যার প্রভাবে হয়তো আপনাদের জীবনটাই বদলে যাবে।

শেখার আনন্দ শেখা, এটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: রুহিনা তাসকিন

Web: http://tanbircox.blogspot.com

র‍্যান্ডি পশ (বিখ্যাত বই 'দ্য লাস্ট লেকচার')

ভালো দিকটি খুঁজে নাও



র‍্যান্ডি পশ (১৯৬০-২০০৮) যুক্তরাষ্ট্রের পেনিসিলভানিয়ায় অবস্থিত কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির 'কম্পিউটার সায়েন্স' বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অগ্ন্যাশয় ক্যানসারে আক্রান্ত অবস্থায় ২০০৭ সালে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য লাস্ট লেকচার' শীর্ষক বড় একটি বক্তৃতা দেন, যা পরবর্তী সময়ে বই আকারে প্রকাশিত হয় এবং নিউইয়র্ক টাইমস-এ বইটি বেস্ট সেলার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। → এই মঞ্চে এভাবে আসতে পারাটা আসলেই অসাধারণ। উপস্থাপক অবশ্য যা বলে যায়নি তা হলো এই বক্তৃতা সিরিজে আজকের বক্তৃতাই আমার শেষ বক্তৃতা। মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো কিছু বলতে পারার সুযোগকে তুমি কী বলবে আর? তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকো, যে পুরোনো ইতিহাস জানো না কিংবা ভাবছ, কী হচ্ছে এখানে, তাদের জন্য বলে দিই, আমার সিটি স্ক্যান দেখলে আমার যকৃতে ১০টা টিউমার ধরা পড়েছে এবং চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন আমার সুস্থতার আয়ু আর মাত্র তিন থেকে ছয় মাস। সুতরাং এই হচ্ছে কথা। আমি আসলে খুবই দুঃখিত তোমাদের হতাশ করার জন্য। কারণ, বিষণ্ন কিংবা মনমরা একটা চেহারা নিয়ে আমি এখানে আসিনি, যা হয়তো স্বাভাবিক ছিল। এমনটা কিন্তু নয় যে আমি বুঝতে পারছি না আমার সঙ্গে কী ঘটতে যাচ্ছে। তো আমরা আজকে কী নিয়ে কথা বলব? আমি অবশ্য আর ক্যানসার-সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বাড়াব না, অনেক হয়েছে। আমি নিজেও আগ্রহী নই। আমরা এমন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলব না, যা আমার শৈশবে দেখা

স্বপ্নগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কী ছিল আমাদের সেই ছোটবেলার স্বপ্নগুলো? আমার তালিকার সঙ্গে তোমরা একমত নাও হতে পারো। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির শূন্যের কোঠায় আটকে থাকা অসম্ভব কিছু মনে হতে পারে তোমাদের। আমার স্বপ্ন ছিল জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলা, এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রবন্ধ লেখা, ক্যাপ্টেন ক্রিকের মতো হয়ে যাওয়া। আমি খুব চেয়েছিলাম, বিনোদন পার্কের সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা হাতে পেতে। চেয়েছিলাম ডিজনির সঙ্গে কল্পনার কারিগর হতে। কোনোটিরই তেমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নকে লালন করা। আমি কখনোই তেমন কোনো মহাকাশচারী হতে চাই না। আমার অবশ্য চশমা ছিল অনেক পাওয়ারের! মহাকাশচারীরা কিন্তু চশমা পরে না। আমি তাই কোনো মহাকাশযানকেও পেতে চাই না। চেয়েছিলাম বিশাল এ মহাশূন্যে ভাসতে।

সবগুলো স্বপ্ন কীভাবে যেন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল নাসার একজন মহাকাশচারী থেকে কল্পনার কারিগর হতে চাওয়ার স্বপ্ন পর্যন্ত। আমি আমার সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করতে করতেই শিখেছি যে স্বপ্ন পূরণের এই ইটের দেয়ালগুলো থাকারও একটি কারণ আছে। বাধা দেওয়ার জন্যই কেবল দেয়ালগুলো গড়ে ওঠে না। আমরা কতটা দৃঢ় ও আন্তরিকভাবে স্বপ্নপূরণের জন্য এগিয়ে যাই, সেটা পরখ করতেই দেয়ালগুলো বাধা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তাদের জন্য, যারা স্বপ্নপূরণের জন্য সেভাবে আগ্রহী নয়। জাতীয় দলে ফুটবল খেলতে চাওয়ার স্বপ্ন আমার পূরণ হয়নি। কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখে আমি আরও বড় কিছু শিখেছি। এবং সেই স্বপ্নপূরণে ব্যর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে আরও কিছু অর্জনের স্বপ্ন আমার তৈরি হয়েছে। কখনো এমন হয় যে তুমি কোথাও খারাপ কিছু করছ এবং তোমাকে বলার মতো কেউ সেখানে গ্রাহ্য করছে না। বুঝতে হবে তুমি খুব খারাপ একটি জায়গায় কাজ করছ। কারণ, তোমার সমালোচকেরা তোমার ত্রুটি প্রকাশের পাশাপাশি জানিয়ে দেয়, তারা তোমাকে কতটা ভালোবাসে এবং খেয়াল

রাখে। আমি একটা জিনিস খুব মনে করি, 'হেড ফেক' কিংবা ঘোরালো বা পরোক্ষভাবে শেখা বা আমাদের জীবনে খুব জরুরি। ফুটবল খেলার মাঠে আমরা কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের শুধু খেলা শিখতে পাঠাই না। আমরা চাই, তারা দলের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা শিখুক, খেলায় দক্ষতা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে অধ্যবসায় শিখুক।

'এলিস' নামে আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল, যা নিয়ে আমরা অনেক দিন হলো কাজ করেছি। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখার একটি অসাধারণ কৌশল এটি। 'হেড ফেক'-এর কথা এখানে আবারও বলতে চাই। কারণ, কাউকে কিছু শেখানোর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পথ হলো তাকে এমনভাবে সেটি শেখানো, যাতে তার মনে হয়, আসলে সে অন্য কিছু শিখেছে। 'এলিস'-এর মধ্য দিয়ে শিশুরা আসলে ছবি বা 'গেমস' বানানো শিখছিল না, শিখছিল প্রোগ্রামিং। 'এলিসে'র নতুন ভার্সনটা আরও অভিনব, আমি সেখানে যা দেখছি তা হলো লাখ লাখ শিশু খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন কিছু শিখছে। বিশ্বস্ততার সামনে থাকে দুটি পথ। বেছে নিতে হবে তোমাকে। কখনোই হতাশ হোয়ো না। হাল ছেড়ো না। মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাও তোমার আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা দিয়ে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অযথা নালিশ কোরো না জীবনের কাছে, সমাজের ব্যবস্থা নিয়ে। নিজেকে নিয়ে। প্রাণপণ পরিশ্রম করে যাও স্বপ্নপূরণের পথে। অন্যের সবচেয়ে ভালো গুণটি খুঁজে বের করো। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যার সবটাই অমঙ্গলজনক। প্রত্যেকেরই ভালো ও খারাপ দিক আছে। তাই তার ভালো দিকটি বের হয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করো।প্রস্তুত হও আজই। সেখানেই ভাগ্য ফিরে যায়, যেখানে তোমার প্রস্তুতি আর জীবনে পাওয়া সুযোগ এক হয়ে গেছে।

জেমস ক্যামেরন (বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা)

পরিশ্রম করলেই কেবল ভাগ্য সহায় হয়

জেমস ক্যামেরন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা।



তাঁর প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রই নির্মাণশৈলী ও ব্যবসা-সফলতার ক্ষেত্রে ইতিহাস গড়েছে। টারমিনেটর-২ (১৯৯১), টাইটানিক (১৯৯৭) কিংবা অ্যাভাটার (২০০৯)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ক্যামেরন ১৯৫৪ সালের ১৬ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

আমার ছোটবেলা কেটেছে কানাডার ছোট্ট একটা শহরে। শহরের তীরঘেঁষে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী, যেখানে আমরা রোজ খেলতাম। নায়াগ্রা জলপ্রপাত ছিল মাত্র চার বা পাঁচ মাইল দূরে। পানির সঙ্গে তাই একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, যা আমার কাজেও বারবার উঠে এসেছে। মা ছিলেন গৃহিণী, খুব ভালো ছবি আঁকতেন। আর বাবা ছিলেন প্রকৌশলী। মায়ের সঙ্গে জাদুঘর দেখতে যেতাম; তাই যখন থেকে আঁকতে শিখেছি, তখন থেকেই জাদুঘরের বিভিন্ন স্মারকের অবয়ব আঁকতে চাইতাম, সেটা হোক না পুরোনো কোনো যোদ্ধার হেলমেট কিংবা মিসরীয় কোনো মমি। এসব কিছু আমাকে আবিষ্ট করে রাখত। আবার প্রকৌশল চর্চাতেও আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড। হতে পারে বাবার সম্মান ও পছন্দকে ধরে রাখার জন্য এটা একটা চেষ্টা ছিল। কিংবা হতে পারে তা প্রযুক্তির প্রতি একটা ভালোবাসা, যা আমি রক্তের টান থেকে অনুভব করেছি।

শিশু বয়সেই আমি সব সময় কিছু একটা নির্মাণ করতে চাইতাম। 'চলো বানিয়ে ফেলি একখানা ঠেলাগাড়ি, চাকাগুলো নিয়ে আসো, তুমি সেটা ঠিক করো...।' যখন পেছনের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি আজকের এই আমিকেই সেখানে খুঁজে পাই। মনে পড়ে সেই ছোট্টকালে

একটা উড়োজাহাজ বানাতে উঠেপড়ে লেগেছিলাম, আজও তো তেমনটিই করছি, পার্থক্য এই যে এটি বানাতে এখন ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ পড়ে যায়।
শিক্ষাজীবনে খারাপ নই, ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলাম। কারণ পুরোটাই ছিল জানার প্রতি আমার সহজাত তীব্র আকর্ষণ। আমি কাউকেই খুশি করার জন্য পড়িনি। কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পড়াশোনাও হয়নি যে কাউকে টপকে ভালো করতে হবে। আমি জানতে চাইতাম, শিখতে চাইতাম—বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত সবকিছু। অবসর সময়ে শহরের পাঠাগারগুলোয় সময় কেটে যেত আমার। অনেক সায়েন্স ফিকশন পড়েছি, যা বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝের রেখাকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট করে তুলেছে। বই আর লেখকদের অভিনব জগৎ আমাকে অদ্ভুতভাবে টানত। আর্থার ক্লার্ক, জন ভগ্ট, হার্লান এলিসন, ল্যারি নিভেন সবাই আমাকে প্রভাবিত করেছেন।
একাদশ গ্রেডের সময় আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক ম্যাকেঞ্জি ঠিক করলেন আমাদের স্কুলে একটা থিয়েটার বানাবেন। স্কুলে রেসলিং, ফুটবল, বাস্কেটবলের আয়োজন থাকলেও থিয়েটার ছিল না। আমরা নেই থেকেই কাজ শুরু করেছি। দৃশ্য, পেছনের পর্দা, পোশাক সব উপকরণের জোগাড় করতে হয়েছে। তারপর নাটক প্রযোজনা করেছি। পুরোটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এবং আমরা সফল হয়েছি। নিয়ম মেনে ঠিকঠাকভাবেই এগিয়েছিলাম। আমাদের পুরো প্রকল্পটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। সেটা সম্ভব করেছিলেন ম্যাকেঞ্জি। এটাই তাঁর অভিনব একটি বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই আমি মনে করি, জীবনের সঠিক সময় এমন কিছু ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য, যাঁরা তোমাকে বদলে দেবে, তোমার ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
আমি কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের উপহার মনে করি না। নিজেকে অন্য শিশুদের চেয়ে আলাদা করে দেখারও কিছু নেই। নিজেকে সবার থেকে আলাদা বানিয়ে দেয় চারপাশের পরিবেশ এবং তোমার অভিনব ক্ষমতা। আমি জীবনের ১০টি

বছর এমনভাবে কাটিয়েছি, যেখানে আমাকে শুনতে হয়েছে আমি ইডিয়ট কিংবা একটা জোক ছাড়া কিচ্ছু নই। তার পরের ২৫ বছর আমার চেষ্টাটা ছিল শুধু নিজেকে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে তৈরি করা। সফলতা সেখানে সামান্যই এসেছে। সফল হওয়ার জন্যই কি আমার নিয়তিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল? ঠিক বলতে পারব না। তবে আমি মনে করি, যত পরিশ্রম করবে ততই ভাগ্য তোমার সহায় হবে। দীর্ঘ পথের অর্জনে 'সুযোগ' বড় কোনো কিছু নয়। কিন্তু একটি মাত্র সুযোগ সবকিছু বদলে দিতে পারে। তবে সেখানেও ওই সুযোগকে চেনার একটা ব্যাপার আছে, সুযোগ কাজে লাগাতে পারার একটি ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই সফল হতে পারেননি, কারণ তাঁরা অনেক বেশিই ভেবেছেন এবং খুব সতর্ক ছিলেন, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হয়ে পা ফেলার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। যদি তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে সুযোগও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

জীবনের অনেকটা সময় ধরেই বুঝতে পারিনি যে ছবি বানাব, ছবির নির্মাতা হব, বিজ্ঞানকে নিয়েই গভীরভাবে মগ্ন ছিলাম। ছোটবেলার অনেকটা সময় পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপের পর্দায় খুঁজতাম প্রোটোজোয়া। কখনো টেলিস্কোপে চোখ মেলে নক্ষত্ররাজিতে হারিয়ে যেতাম। আমার চিন্তাভাবনার পরিসরটা ছিল বিজ্ঞানের বিচিত্র দিককে ঘিরেই। আঁকার প্রতি টান সব সময়ই ছিল। পদার্থবিজ্ঞান আর গণিত নিয়ে পড়াশোনার পাঠ শেষ হলো। তারপর এক অসহনশীল শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে ক্যালকুলাসের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। আমি ইংরেজি বিষয়ে মনোনিবেশ করি, কারণ আমি লিখতেও চাইতাম খুব। এ দুই দিকে উদ্ভ্রান্ত পথ চলতে চলতে ২৫-২৬ বছরে আমি ঠিক করি, ছবি বানানো নিয়ে অগ্রসর হব। নিজেকে ভেবেছিলাম ছবি বানানোর কারিগর হিসেবে, পরিচালক হিসেবে নয়। তবুও...

যে ছবিগুলোর তেমন কোনো বাঁধাধরা প্যাটার্ন নেই, সেগুলোই এসে আমার পছন্দের তালিকায় হাজির হয়। আমি দেখেছি, নিয়মকানুন আমার

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জন্য ঠিক কাজ করে না। ভালো লাগে যেখানে অনেক হাঙ্গামা থাকবে, শব্দ থাকবে, অস্থিতিশীলতা থাকবে—পরিপূর্ণ কিছু নয়। সেখানেই তো নিজেকে উপস্থাপনের সুযোগ মেলে। যদি সবকিছু তোমার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত কিংবা টিপটপ হয়ে থাকে, তবে জাদুকরি কোনো কিছু উপহার দেওয়ার জন্য দরজাটা তো খোলা যায় না। পরিচালকের মন থেকে তো আর মোহনীয় জাদুর স্পর্শটা প্রতিফলিত হয় না, এটা আসে অভিনয় কুশলীর আত্মার মধ্য থেকে। আন্দোলিত হয়েছি উডস্টক, দ্য গ্র্যাজুয়েট, বান এন্ড ক্লাইড, দ্য গডফাদার, স্টার ওয়ারস প্রভৃতি ছবি থেকে।

ছবি বানানোর কথা শুনে পরিবার কখনোই তেমন সন্তুষ্ট হয়নি। বাবা নারাজ ছিলেন, তিনি আসলে আমার ব্যর্থ হওয়ায় অপেক্ষায় ছিলেন, যেই মুহূর্তে তিনি জানাবেন যে আমার আসলে একজন প্রকৌশলী হওয়াই উচিত ছিল। তাঁর পক্ষ থেকে সহয়তা ছিল একেবারে শূন্য। মা অবশ্য অনেক আগে থেকে এ ধরনের সৃষ্টিশীল শিল্পের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই আশ্চার্য এক গতি ছিল সেখানে, যা আমাকে দীর্ঘ সময়েও এ পথ চলতে সাহায্য করেছিল, যদিও তা দেখতে পাওয়া ছিল দুষ্কর।

যখন ছবি বানানো শুরু করলাম তখন মনে মনে কী অর্জন করতে চেয়েছি সেটা নিয়ে বলা কঠিন। আমার মনের মধ্যে তখন অসংখ্য ছবি, ফ্রেম, দৃশ্যের আনাগোনা করছিল। অনেক বেশি বিজ্ঞান কল্পকাহিনির রাজত্ব ছিল সেখানে। ভিন্ন পৃথিবী আর ভিন্ন পরিবেশের জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার জন্য এটা ছিল কল্পনা কিন্তু পুরোদস্তুর কল্পনাই কি ছিল তা? পুরোটা জীবন আমাকে অনেক অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে। অনেক শিখেছি সেখান থেকে। আজও শিখছি। তবে শেখাগুলোকে নিয়েই আরও মহৎ কিছু তৈরি করার বড় শিক্ষাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। টাইটানিক ছবিটি আমার সব শেখাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অসংখ্য শিল্পীর কাজ ছিল সেখানে। সবার কাছে এত প্রভাবিত হয়েছি যে মনে হয়, তাঁদের ছাড়া এতটা সম্ভব হতো না।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

যখন তুমি কোনো বৃহৎ ক্ষেত্রে কাজ করবে ও অনেককে নিয়ে তোমার কাজ করতে হবে তখন আত্ম সন্দেহের প্রয়োজন নেই। যদি তোমার কাজ খারাপ হয় তবে তুমি তাঁদের কাছ থেকে সেখানকার ভুলগুলো সম্পর্কে সমালোচনা শুনবে, যদি ভালো হয় তবে তুমি ভালোই শুনবে। অনেকেই তোমার সঙ্গে থাকবেন, যাঁরা তোমাকে পথ এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাই সন্দেহের কোনো স্থান এখানে নেই। এমন আবহাওয়াতেই আমরা কাজ করি।

ছবি বানানোর যে বিশাল ক্ষেত্র সেখানে কিছু পদ্ধতি কখনোই পরিবর্তিত হয় না। প্রযুক্তি আর নির্মাণকৌশলের সব ধারাটাই বদলাতে থাকে। এগুলোর বদল দিয়েই ছবির ধারা ভিন্নরূপ ধারণ করে। দৃশ্যপট বদলে যায়। সেখানে সংযোজন ও বিয়োজন ছবির চাওয়াকে সবার সামনে তুলে ধরে। জীবনের ছকটা তো সে রকমই।

অ্যাকাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট থেকে পাওয়া।

১৯৯৯ সালের ১৮ জুন দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: শিখিত সানী

শোয়ার্জনেগার (অভিনেতা, বডিবিল্ডার, মডেল ও রাজনীতিবিদ)

সফল হওয়ার ছয় রহস্য



হলিউড অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের জন্ম ১৯৪৭ সালের ৩০ জুলাই। শোয়ার্জনেগার পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন 'দ্য টার্মিনেটর' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এছাড়া 'কোনান দ্য বার্বারিয়ান', 'প্রিডেটর' তাঁর বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র। একাধারে তিনি একজন অভিনেতা, বডিবিল্ডার, মডেল ও রাজনীতিবিদ। তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া

প্রদেশের গভর্নর। ২০০৯ সালের ১৫মে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য প্রদান করেন।

আজকের দিনটি খুবই চমৎকার একটা দিন, বিশেষ একটা দিন। আজ এখানে তোমরা সাড়ে চার হাজার স্নাতক মিলিত হয়েছ, যার মধ্যে দুই হাজার ২০০ জন ছেলে আর দুই হাজার ৩০০ জন মেয়ে। তোমাদের কাছে আজকের এ দিনটি আর সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তোমরা অনেকেই হয়তো জানো, আমার মেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বর্ষ সম্পন্ন করল। আমার মেয়ের কেবল পথ চলা শুরু আর তোমাদের শেষ। আমি জানি, তোমরা কিছুটা চাপ অনুভব করছ, কারণ তোমরা তোমাদের জীবনের নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। অনেকেই বলে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন অনেক সুখের, অনেক আরামপ্রিয় কিন্তু বের হওয়ার পরের জীবন অনেক কঠিন। আমার মনে হয়, এগুলো একদল মূর্খের কথা।

আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত ধারণা বিনিময় করব। কীভাবে আমি সফল হয়েছি, কীভাবে আমি আজকের শোয়ার্জনেগারে পরিণত হয়েছি। আমি সব সময়ই চাইতাম, আমি এক নম্বর হব। আমি যখন বডি বিল্ডিং (শরীর গঠন) করা শুরু করেছিলাম, তখন আমি একবারও ভাবিনি, আমাকে শুধু চ্যাম্পিয়ন হলেই চলবে, ভেবেছি, আমি হব সর্বকালের সেরা বডিবিল্ডার। ঠিক একইভাবে চলচ্চিত্র জগতেও আমি শুধু তারকা হতে চাইনি, হতে চেয়েছি উদাহরণ। আমার একাগ্রতা, আমার আত্মবিশ্বাস আমাকে সফল করেছে।

আমি আজ সফল হওয়ার ছয়টি সূত্রের কথা বলব। অবশ্য এগুলো আমার নিজস্ব ধারণা। প্রথম সূত্র হলো, নিজেকে বিশ্বাস করো। আমি এই কথাটি দিয়ে যা বলতে চেয়েছি, তা হলো আজকালকার তরুণেরা তাদের মা-বাবা, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অনেক উপদেশ পায়। কিন্তু কোন উপদেশটি তার জন্য ভালো, এটা তাকেই বুঝতে হবে। আমি অনেক ভাগ্যবান।

আমি যখন ছোট থেকে বড় হয়েছি তখন এত টিভি বা টেলিফোন ছিল না, ছিল না কম্পিউটার বা আইপডও। আমি আমাকে অনেক সময় দিতে পেরেছি। আমি অনুভব করতে পারতাম, আমার মন কী বলে, আর বুদ্ধি কী বলে। আমি আমার স্বপ্নকে বুঝতে পারতাম। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আমি একটি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আমার আইডল রেগ পার্ককে দেখলাম, তিনি হারকিউলিস চলচ্চিত্রের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি ছিলেন মিস্টার ইউনিভার্স। তাঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হলাম এবং বাসায় ফিরে মা-বাবাকে বললাম, 'আমি বডি বিল্ডিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।' তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেননি। বরং এর চেয়ে তাঁরা খুশি হতেন যদি বাবার মতো আমিও পুলিশ কর্মকর্তা হতে চাইতাম। কিন্তু আমি চেয়েছি, সবার থেকে ভিন্ন হতে। আমি অনেক বড় স্বপ্ন দেখতাম। আমাকে অনেকেই বলত, তুমি যদি খেলাধুলোতেই চ্যাম্পিয়ন হতে চাও, তবে বাইসাইকেল, রেসিং কিংবা ফুটবল খেলে চ্যাম্পিয়ন হও। কিন্তু আমি বডিবিল্ডার হতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল এটা দিয়ে আমি চলচ্চিত্রে নামব এবং অনেক টাকা উপার্জন করব।

দ্বিতীয় সূত্র হলো, নিয়মনীতি ভেঙে ফেল। সবকিছু সম্পর্কে আমাদের অনেক নিয়মকানুন আছে। আমি বলি, নিয়ম ভেঙে ফেল। আইন ভাঙার দরকার নেই (ব্রেক দ্য রুলস, নট দ্য ল)।

আমি যখন চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে গেছি, তখন আমাকে অনেক নিয়মকানুন শেখানো হয়েছিল—এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, আমি সেগুলোর কিছুই শুনিনি। কারণ, সেগুলো তাদের নিয়মনীতি ছিল, আমার ছিল না। আমি আমাকে বুঝিয়েছি, আমি পারব। তখন থেকে আমি আরও কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলাম। অভিনয়ের ক্লাস করতাম, ইংরেজির ক্লাস করতাম, বক্তৃতার ক্লাস করতাম ইত্যাদি। পরবর্তী সময় আমি সফল হলাম 'পাম্পিং আইরন' দিয়ে। তারপর তো সব জানাই আছে। মূল কথা হলো, যেগুলো তুমি করতে পারবে না,

তা তোমার শোনার দরকারই নেই।
তৃতীয় সূত্র হলো, পরাজয়কে ভয় করা যাবে না। আমি পরাজয়কে সঙ্গে রেখেই কাজ করেছি। টার্মিনেটর, প্রিডেটর অ্যান্ড টুইনস দিয়ে আমি যখন সফল হয়েছি, তখন অনেক চলচ্চিত্রই সাফল্যের মুখ দেখেনি। কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি। তুমি সব সময় জিততে পারবে না এটা ঠিক, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পেয়ো না যেন।
পরাজয়কে ভয় করে নিজেকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমার নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস ঠিক রেখো, আর ভেবো, তুমি যা-ই করছ, এটা তোমার সঠিক পথ, তাহলে সাফল্য আসবেই। সুতরাং পরাজয়কে ভয় পেয়ো না।
চতুর্থত, যারা নিন্দুক, তাদের কথা শুনো না, আমলে নিয়ো না। যেকোনো কাজের বিপক্ষেই শুনবে, অনেকেই বলছে—তুমি এটা করতে পারবে না, এটা এর আগে কেউ করতে পারেনি। কল্পনা করো, বিল গেটস মাইক্রোসফট যখন শুরু করেন, তখন অনেকেই বলেছিলেন, এটা তিনি করতে পারবেন না। কিন্তু বিল গেটস কী করতে পেরেছেন আর কী করতে পারেননি, তা তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো।
আবার বারাক ওবামাকে দেখো। তিনি যদি নিন্দুকের কথা শুনতেন, তবে তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারতেন না। লোকজন বলত, তিনি হিলারি ক্লিনটনকেই টপকাতে পারবেন না আর প্রেসিডেন্ট হবেন কীভাবে? কিন্তু বারাক ওবামা ইতিহাসকে বদলে দিয়েই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।
নিন্দুকের কথা যদি আমি নিজে শুনতাম, তবে আমি টার্মিনেটর করতে পারতাম না, একজন গভর্নর হয়ে আজকে তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। আমি কখনোই শুনিনি, আমি পারব না। আমি সব সময় আমাকে শুনিয়েছি, 'হ্যাঁ, আমি পারি।'
পঞ্চমত, সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া, পরিশ্রম করা। যেটা তোমার আয়ত্তের বাইরে সেটার পেছনে কঠিন পরিশ্রম করে লাভ নেই। যতটুকু তোমার পক্ষে সম্ভব, তা-ই করবে,

www.facebook.com/tanbir.ebooks
তবেই তুমি সফল হবে। আমি তা-ই করেছি। আমার প্রিয় চরিত্রের একজন, বিখ্যাত বক্সার মোহাম্মদ আলীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তুমি কতবার উঠবস করতে পারো?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার উঠবস গুনি না। আমি তখনই গুনি, যখন কষ্ট অনুভব করতে শুরু করি, যখন পায়ে ব্যথা অনুভব করি। কারণ, তখনই সত্যিকারের গোনা শুরু হয়।' সুতরাং সফল হতে গেলে পরিশ্রম করতেই হবে। সঠিক পথে পরিশ্রম করতে হবে। কষ্ট না করলে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না। যদি তুমি জিততে চাও, তবে কঠিন পরিশ্রম তোমাকে করতেই হবে। এ ছাড়া কোনো পথ নেই।

ষষ্ঠত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তুমি যে পথে যেভাবেই জীবনযাপন করো না কেন মানুষের জন্য কিছু সময় দিয়ো, সমাজের জন্য কিছু কোরো, দেশের ভালোর জন্য পারলে কাজ করে যেয়ো।

আমার শ্বশুর সার্জেন্ট শ্রিভের, তিনি আমেরিকার বিশাল এক মহৎ মানুষ ছিলেন, যিনি 'পিস কোর', 'জবস কোর' গরিবদের আইনি সহায়তা শুরু করেছিলেন। তিনি ইয়েল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'তুমি আয়নার দিকে তাকিয়ে তোমাকে দেখো, তোমাকেই দেখতে পাও। কিন্তু আয়নার ওপাশে হাজারো মানুষ তোমাকে দেখছে। তোমার একটু সাহায্য-সহযোগিতার জন্য লাখ লাখ মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

আজকে তোমরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাচ্ছ, একজন গ্র্যাজুয়েট হয়ে কখনোই হারতে শিখ না। তুমি মনে রেখো, তোমার জীবনে তুমিই সব, তুমিই সেনাপতি। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

টম হ্যাঙ্কস(মার্কিন অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক)

৪ সংখ্যার শক্তি



টম হ্যাঙ্কস বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক। জন্ম ১৯৫৬ সালে। তিনি দুবার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, যা অস্কার নামে বহুল পরিচিত। ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাসার কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

বেশি দিন হয়নি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মহাসড়কগুলোতে গাড়ির ভয়ংকর জট বেঁধে সমস্যা তৈরি হচ্ছে খুব—আমি এ সমস্যার কথাই পড়ছিলাম, যা পুরো শহরকে স্থবির করে দিচ্ছে। লাখ লাখ গাড়ি আর মানুষের গতি থেমে অচল হয়ে যাচ্ছে জীবনযাত্রা। সময়ের অপচয়, শক্তির ক্ষয় এবং পরিবেশের জন্য যা ভয়াবহ হুমকি। কিছু উদ্যমী মানুষ গাড়ির এই জটকে কম্পিউটারে নমুনাচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছিল, ঠিক কতগুলো গাড়িকে সরিয়ে নিলে জট দূর হয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল সম্ভব হবে।

কতগুলো গাড়িকে সরিয়ে নিলে একটি কুড়ি মাইলের দূরত্ব দুই ঘণ্টার পরিবর্তে মাত্র ২৫ মিনিটে পৌঁছানো যাবে? চমৎকার ছিল সেই ফলাফল।

প্রতি শতকে মাত্র চারটি গাড়িকে সরিয়ে নিলেই গাড়ির এই জটকে সহজে সরানো যাবে। প্রতি শত থেকে চারটি, প্রতি হাজার থেকে ৪০টি। প্রতি ১০০ থেকে চারটি গাড়ি কিন্তু সংখ্যায় অনেক নয়—প্রতি ৫০ থেকে দুটি; প্রতি ২৫টি গাড়ির চালক থেকে একজন।

আমরা একে বলতে পারি চারের শক্তি। ভেবে দেখো, প্রতি ১০০তে আমরা মাত্র চারজন কি আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি।

চারের এই শক্তিতে তুমি কাজে লাগাতে পারো তোমার আগ্রহের যেকোনো ক্ষেত্রে। রাজনীতিতে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
প্রতি ১০০ থেকে চারটি ভোট হার-জিতের পার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সংস্কৃতি— সেখানেও প্রতি ৫০ জনের মধ্যে দুজনের কেনা টিকিট একটি স্বল্প বাজেটের ছবিকে লাভজনক বানাতে পারে। অর্থনীতিতে প্রত্যেক ২৫ জন ক্রেতা থেকে একজন ক্রেতার নির্দিষ্ট একটি পণ্য বয়কটের মধ্য দিয়ে পণ্যটির বাজার-চাহিদাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রতি ১০০ থেকে চারটি কিন্তু একেবারেই সামান্য, তুচ্ছ অথচ সেটাই এক বিশালত্বের জন্ম দিয়ে দেয়। চারের এই শক্তিই সহায় আর অসহায়ের মধ্যকার পার্থক্য এনে দিতে পারে।

এ বছর ২০০৫ সালে যারা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে, তারা নিশ্চিতভাবেই দাবি করতে পারে, অন্য সব ব্যাচ থেকে তারা কীভাবে পৃথিবীকে উন্মত্ত হয়ে যেতে দেখেছে। ২০০১ সালের নাইন-ইলেভেনের পর আমাদের ধরিত্রী-মাতা এবং যুক্তরাষ্ট্র যেন দুটি ভিন্ন জগতে পরিণত হয়েছিল— আমাদের কথায়, সহিষ্ণুতায়, শান্তি ও যুদ্ধের অন্বেষণে, মতবাদ ও আদর্শের মধ্য দিয়ে। ২০০৫-এর এই বসন্তের দিনটি অন্য রকম। স্নাতকধারী আজকের শিক্ষার্থী হিসেবে তোমরা বাস করছ নতুন এক পৃথিবীতে, নতুন ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে, বৈশ্বিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, ধর্মীয় বিভেদের মধ্যে। আজ আমাদের মূল উদ্দেশ্য, এই সমাজে তোমাদের প্রবেশের ক্ষণটিকে উদ্যাপন করা। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, তোমরা ইতিমধ্যে সমাজের অনেকখানি ভেতরে প্রবেশ করে ফেলেছ। কেউই তোমরা নাইন-ইলেভেনের ঘটনার প্রভাব থেকে অপরিচিত নও, মুক্ত নও।

মাথায় স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার টুপি পরে, হাতে ডিগ্রির কাগজখানা নিয়ে সাধারণভাবেই গৎবাঁধা একটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে, 'কী করব এখন আমি।' হয়তো এমনটাই গত চার বছরে তোমাদের বারবার মনে এসেছে। আজকের এই দিনে সাধারণত বক্তাদের কাছ থেকে আশা করা হয়, তাদের কাছে যদি কোনো উপদেশ পাওয়া যায়, যা তোমাদের জীবনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এ 'উপদেশ' জিনিসটি অনেক বিভ্রান্তিকর, উচ্চ স্বরের এবং

Web: http://tanbircox.blogspot.com

বিপজ্জনকও বটে। আমি কোনো উপদেশ দিতে চাই না, এটি শুধুই একটি অনুরোধ। পরামর্শ ঠিক নয়, একটি ছুতো আর কি। ইংরেজিতে চারটি বর্ণের একটি শব্দ 'হেল্প' (এইচ-ই-এল-পি)। সহায়তা। সাহায্য।

আমাদের প্রয়োজন সহায়তা, তোমাদের সাহায্য। তোমাদের এগিয়ে আসতেই হবে। প্লিজ, সাহায্য করো, তোমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। সাহায্য প্রদানের জন্য আগ্রহী হও। এতে তোমার জীবনে, পথে-প্রান্তরে, শহরে-বন্দরে, দেশে এবং পুরো পৃথিবীতে পরিবর্তন আসবে। যদি কেবল চারজন থেকে মাত্র একজন, ১০০ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই কেবল চারজন কোনো একটি দিনে, কোনো একটি বিশেষ কারণে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসো, তবে তোমাদের এ পৃথিবীর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন চলে আসবে।

সাহায্য করো প্রকাশ্যে কিংবা অগোচরে। কোনো কিছুর পরিবর্তনে, রক্ষায় এবং সংরক্ষণে। সাহায্য করো তোমার মনকে, সেখানে আসুক যুক্তি, আসুক বিতর্ক ও আলোচনার প্রতি শ্রদ্ধা। তোমাকে সব সময়ই সাহায্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

এগিয়ে যাও। শান্তি এনে দাও সেখানে, যেখানে শান্তি অনেক মূল্যবান। প্রকৃতিকে সাহায্য করো। বৈচিত্র্যকে আপন করে নাও, বিভেদকে করো জয়।

চারের শক্তি দিয়ে প্রতি ১০০ সমস্যার চারটি সমাধানে এগিয়ে যাও। তবেই আমরা বাঁচাতে পারব এ বিশ্বকে। আমরা সাহায্য না করলে যা কখনোই সম্ভব হবে না।

অভিনন্দন রইল সবার জন্য। ধন্যবাদ।

ভয়কে করো জয়



টম হ্যাঙ্কস বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক। জন্ম ১৯৫৬ সালে। তিনি দুবার

পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, যা অস্কার নামে বহুল পরিচিত। ২০১১ সালের ২২ মে ইয়েল কলেজের এক অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

আজকের দিনটি শুধুই তোমাদের। প্লিজ, তোমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো বন্ধ করে ফেলো না যেন। তোমার আইফোন, আইপ্যাড, ব্ল্যাকবেরি, রেকর্ড করার যন্ত্র যেগুলো তথ্য, ছবি, কথা ছড়িয়ে দিতে পারে, সেগুলো বন্ধ করে দিয়ো না। এখান থেকে বেরিয়ে তোমরা টুইটার বা ফেসবুকে তর্কবিতর্ক করে তুলনা করতে পারবে যে আজ স্মরণীয় কিছু ঘটেছে না ঘটেনি। এমনকি এই উপদেশটাও 'টুইট' করতে পারো!

আমার বক্তব্যের মধ্যে একটু গানটান দিয়ে, গ্রাফিকস 'এডিট' করে ওয়েবে ছেড়ে দাও। এটা 'সেনসেশনাল' হয়ে উঠতে পারে। সেটা নিয়ে নেটে অনেক আড্ডা হতে পারে। আমাদের সব সম্ভবের এই বিশ্বে এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়। সামনের এই বিশ্বে তোমাদের স্বাগতম। এক চাচা তাঁর ভাস্তেকে বলেছিলেন, 'যত দিন পারো কলেজে থেকে যাও। কারণ ঠিক যেদিন তুমি এখান থেকে বের হবে, এর পরদিন থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি তোমাকে কাজ করে যেতে হবে।'

আমি যতবারই কোনো হিসাব-নিকাশে যাই, ততবারই আমাদের আশাভরসার সঙ্গে এসে যায় আমাদের ভয়। আমি এই 'ভয়' শব্দটাকে নিয়ে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। ভয় আমাদের ২০১১ সালের সবচেয়ে মানসিক বাধা। আমরা তোমাদের কলেজে প্রতিবছরই এই প্রত্যাশা করি, এটাই গড়ে দিতে চাই যে ভয় থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো। কারণ আমরা আসলেই বহু কিছু ভয় পাই। ভয় যেন এ শতকের সবচেয়ে সস্তা একটা পণ্যতে পরিণত হয়ে গেছে। সহজে ছড়িয়ে যায় এবং সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে ভয় সবকিছুকে বদলে দেয়। অনেক আগে মার্কিন নৌকর্মকর্তা জন পল জোনস বলেছিলেন, ভয়কে যদি বাড়তে দেওয়া যায় তাহলে সেটা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমি ভয়কে দেখি ভীতিপ্রদ ও স্থবির হিসেবে।

আর বিশ্বাসকে সেভাবেই দেখি যা আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে রেখেছি। ভয় প্রতিদিন আমাদের মুখের ওপর চিৎকার করে। বিশ্বাসকে তাই গতিশীল হতে হবে আমাদের চেষ্টায় যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন আয়নায় আমরা নিজেদের দেখব আত্মবিশ্বাসীরূপে। তাই কে হবে আমার গুরু, ভয় না বিশ্বাস?

তিনজনকে খুঁজে পাওয়া গেল যারা ভয়ের চোটে রাতে ঘুমাতে পারে না। এটা অবশ্যই একটা গল্প। মনের ভয় দূর করতে এই তিনজন তীর্থপথে রওনা হলো কোনো এক জ্ঞানীর খোঁজে। অনেক দূরে, পাহাড়ের গুহায় জ্ঞানীর খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানে কোনো গাছ হয় না, কোনো প্রাণী বাস করে না, এমনকি পোকামাকড়ও না। তিনজন পৌঁছে কাতরভাবে শরণাপন্ন হলো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে। প্রথমজন বলল, 'আমাকে রক্ষা করো, ভয় আমাকে পঙ্গু করে ফেলল!' জ্ঞানী ব্যক্তি জানতে চাইলেন, 'কী তোমার ভয়ের কারণ?' সে উত্তর দিল, 'মৃত্যু। কখন যে সে আমার জন্য আসবে!' জ্ঞানী ব্যক্তি উপদেশ দিলেন, 'তোমার ভয়কে দূর করতে দাও আমাকে। মৃত্যু ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে আলিঙ্গন না করছ। তুমি যখনই এই সত্য ধারণ করবে, মৃত্যু আর তোমাকে ভয় দেখাবে না।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ভয়ের কারণ জানাল, 'অপরিচিত ব্যক্তি, আমার নতুন প্রতিবেশী, তারা আমার থেকে আলাদা।' জ্ঞানী উত্তর দিলেন, 'ভেবো না আমি তোমার এই ভয় কাটিয়ে দেব। বাড়ি গিয়ে একটি কেক বানিয়ে তোমার প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে যাও। তাদের শিশুদের নতুন খেলনা উপহার দাও। তাদের গানবাজনায় যোগ দাও, তাদের জীবনধারাকে জানতে শেখো। তুমি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবে, বন্ধু হবে। আর তোমার ভয় দূর হবে।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'প্রতিরাতে ঘুমাতে গেলে মনে হয় মাকড়সা সিলিং বেয়ে আমার মাংসের জন্য নেমে আসছে।' জ্ঞানী ব্যক্তি খেঁকিয়ে বললেন, 'তোমার কী ধারণা, আমি এত ওপরে এই পাহাড়ের গুহায় কী করছি যেখানে কোনো প্রাণী বাস করে না? এমনকি মাকড়সাও না?'

ভয় আমাদের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর সবচেয়ে খারাপ দিকটা নিয়ে নেয় আর আমরা সেটা সম্ভব হতেও দিই।

আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করি যেখানে সবাই এমন বহু জিনিসে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে যেগুলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। জাতিগত বৈচিত্র্য আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি না, যা হয়তো আমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করতে পারত। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি ভয়কে শক্তিশালী হতে উসকে দেবে, নাকি আত্মবিশ্বাসকে একটা সুযোগ দেবে? তোমাকে ঠিক করতে হবে কোনটিকে হতে দেবে। ইয়েল কলেজে আজকের দিনে তোমার সব অর্জন, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতা দিয়ে তোমরা জানো তোমাদের কী করতে হবে।

সামনের দিনগুলোয় সারা পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধারা দেশে ফিরতে থাকবে। ভয়ংকর যুদ্ধের ময়দানে তাদের আত্মবিশ্বাস ভয়ে পরিণত হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হবে সেই ভয় দূর করা তাদের চোখ থেকে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে। কাজ দিতে হবে যাতে তারা যোদ্ধা থেকে একজন সচেতন নাগরিক হতে পারে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বুনে দিয়ো। বাকিটা তারা নিজেরাই করে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তো, সমাবর্তন তো এল বলে। তোমাদের দায়িত্ব শুরু হলো। কিন্তু সব সময় কাজের ক্ষেত্রটি আমাদের জন্য সুখকর হবে না। পরিশ্রম সব সময় সাফল্য না-ও এনে দিতে পারে। দিনগুলো একটির চেয়ে আরেকটিকে অসহ্য মনে হতে পারে। সমাবর্তন থেকে বাকি জীবন পর্যন্ত প্রতিদিন কাজ করে যেতে হবে। ভয় আর আত্মবিশ্বাসের মধ্যে সমঝোতা করতে হবে। ভয় তোমাকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস তোমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোন পথে তুমি যাবে? সব সময় সামনে এগিয়ে যাও। তারপর তোমার ফল টুইটারে জানাও সারা পৃথিবীকে। ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন সবাইকে।

সূত্র: ওয়েবসাইট

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ:

শিখতী সানী

ডেনজেল ওয়াশিংটন (যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক)

ব্যর্থতার জয় হোক



ডেনজেল ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক। দুবার জিতেছেন অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড, দুই গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড। ডেনজেলের জন্ম ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪। ২০১১ সালের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই বক্তৃতা দেন তিনি।

এখানে আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আসলেই অনেক গর্বিত ও কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। আজ আমি একটু নার্ভাস। কারণ সমাবর্তনের মতো এমন একটি বৃহত্তর পর্যায়ে বক্তব্য দেওয়াটা অনেক কঠিন একটি ব্যাপার। আমার আয়েশি ধারার জীবনযাপনের একেবারে বাইরে। এর চেয়ে সৈনিকের পোশাক পরে কয়েকটি কঠিন শট দেওয়াটাও বোধ হয় সহজ ছিল। কিংবা কোনো ছবির শটে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে দেওয়া হোক আমাকে; অথবা আমাকে ম্যালকম এক্স, রুবিন হ্যারিকেন কার্টারের মতো চরিত্রগুলোয় অভিনয় করতে বলা হোক— আমি রাজি হয়ে যাব। কিন্তু দিতে হবে একটি সমাবর্তনের বক্তব্য? এটি সত্যিই একটি গুরুতর ব্যাপার।

কীভাবে নতুন এই স্নাতকদের সামনে বক্তব্য দেব, সেটা নিয়ে বেশ ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সবচেয়ে মনোযোগ ধরে রাখার ভালো উপায় হলো হলিউডের রসাল কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলে চলা। শুরু করা যেতে পারে আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবির সেটে আমার আর রাসেল ক্রোর মধ্যকার বাগিবতণ্ডা নিয়ে। কিংবা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সঙ্গে আমার কাটানো কিছু আন্তরিক মুহূর্ত নিয়ে। কেউ কি তোমরা সেসব গসিপ শুনতে চাও? আমার তা মনে হয় না। তাই এভাবেই আমি বিপদে পড়ে গেলাম।

তোমরা কি এখন ভাবছ যে এতটাই যখন কঠিন মনে হয়েছে বক্তব্য দেওয়া, তাহলে কেন আমি এ আমন্ত্রণে রাজি হলাম?
ভালো একটা কারণ হতে পারে যে তোমাদের মধ্যে আমার ছেলে বসে আছে। আমি এভাবে এসে দেখে গেলাম আমার অর্থ কীভাবে খরচ হলো তার পেছনে। অন্যান্য কারণ হতে পারে, নিজের প্রচারণার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু আমি এখানে এসেছি এই অসাধারণ ক্যাম্পাসের জন্য। আমি জানি, হয়তো আমি তোমাদের মধ্যে হাস্যকর কোনো বস্তুতে পরিণত হব। কিন্তু তার পরও আমাকে এই ঝুঁকিটা নিতে হবে। ঝুঁকি না নিলে আমি বুঝতে পারব না যে আমি সফল না বিফল হতে যাচ্ছি।
আর আমি যদি ব্যর্থ না হই, পড়ে না যাই, তাহলে কীভাবে বুঝব যে আমি কিসের সঙ্গে আঘাত খাব? আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে চেষ্টা করো।
রেগি জ্যাকসন বেসবল খেলার ইতিহাসে বহুবার ব্যর্থ হওয়ার রেকর্ড গড়েছিলেন। টমাস আলভা এডিসন ১০০০ বার ব্যর্থ হওয়ার পর ১০০১তম বার বানিয়েছিলেন অভাবনীয় আবিষ্কার বৈদ্যুতিক বাতি। ব্যর্থতার প্রতিটি ধাপ তোমাকে সফলতার একেকটি ধাপ কাছে এগিয়ে নিয়ে আসে। আর তাই তোমাকে ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যর্থ হতে হবে সফলতার জন্য।
তোমরা হয়তো অনেকের কাছেই এমনটা শুনেছ।
আমি তিনটি কারণ দেখাতে চাই, সে জন্য একে আমি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রথমত, জীবনের কিছু বিষয়ে তুমি ব্যর্থ হবে। এই ব্যর্থতাকে মেনে নাও। হয়তো তুমি হেরে যাবে, নিজের কাজে লজ্জিত হবে। দুর্বিষহ হয়ে উঠবে সবকিছু। এমনটাই হয়তো সবাই বক্তব্যে বলে। আমি বলব, এই ব্যর্থতাকেই আলিঙ্গন করো। কারণ ব্যর্থতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য। আমার অভিনয়জীবনের শুরুটা ছিল একটি ছবির অডিশন দেওয়ার মধ্য দিয়ে। সেখানে গান গাইতে হবে। কিন্তু আমি তো গান গাইতে জানি না, অভিনয় জানি। সুতরাং আমার পক্ষে আর সেই ছবির চরিত্রটি পাওয়া সম্ভব হয় না।

পুরোদস্তুর ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে চলে এসেছি। তারপর পরবর্তী অডিশন, পরেরটি, আবার পরেরটি, চলতেই থাকল। আমি খুব প্রার্থনা করছিলাম। কিন্তু আমার ব্যর্থতা যেন বহাল থেকেই চলল। কিন্তু আমার কিছুই মনে হয়নি তাতে। কারণটা কী জানো? সেলুনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তুমি শেষমেশ সত্যিই চুল কাটার সুযোগ পেয়ে যাবে। আগের বছর আমি একটা নাটক করলাম, ফেনসেস। এবং তার জন্য আমি জিতেছিলাম টনি অ্যাওয়ার্ড। আমার সেখানে গাইতে হয়নি। কিন্তু পরিহাসটা ছিল যে এই সেই কোর্ট থিয়েটার, যেখানে আমি ৩০ বছর আগে অডিশন দিতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছি। তোমরা এখানে স্নাতক যারা বসে আছো, তোমাদের সেই প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা আছে সফল হয়ে ওঠার। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সাহস কি আছে কারও?

আমার কাছে দ্বিতীয় কারণটা হলো, যদি তুমি ব্যর্থ না হও, তুমি চেষ্টা করবে না, নিজেকে শুধরোবে না। আমার স্ত্রী এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বলে, যা তোমার নেই সেটি অর্জনের জন্য তোমাকে এমন কিছু করতে হবে যা তুমি কখনোই করোনি। লেজ ব্রাউন একটি কথা বলেছিলেন, ভেবে নাও তুমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে; তোমার আশপাশে তোমার অব্যবহৃত সব গুণ অশরীরী আত্মার আকার ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে তোমাকে বলছে, তুমি আমাদের ব্যবহার করলে জীবনটা আরও সার্থক করতে পারতে, আমাদের কবরে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতে। আমি আজকে উপস্থিত স্নাতকদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা কতগুলো এমন সৎ গুণবিশিষ্ট আত্মাকে কবরে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না, বলো? এ পৃথিবীর বড্ড প্রয়োজন তোমাদের মেধা ও প্রতিভার।

ব্যর্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলতে চাওয়ার শেষ কারণটি হলো, আমাদের জীবন কিন্তু সোজা কোনো পথ নয়। আমি আমার শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলাম ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রি মেডিকেল পড়াশোনা দিয়ে, শেষ করেছিলাম যে কোর্সটি দিয়ে, কার্ডিয়াক

মর্ফোজেনেসিস, যা উচ্চারণ করতেও আমার কষ্ট হয়। কারণ আমি ওই কোর্সে ফেল করেছিলাম। তারপর মনে হলো, আইন নিয়ে পড়ব। তারপর সাংবাদিকতা।

যেহেতু লক্ষ্যের ঠিক ছিল না, গ্রেডগুলোও তাদের ইচ্ছামতো নিচের দিকে নামতে শুরু করল। যখন জিপিএ হলো ১.৮ তখন কর্তৃপক্ষ বলল কিছুদিন সময় নিয়ে আবার শুরু করতে। আমি তখন আমার মায়ের পার্লারের কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করলাম। আমার বেশ দিনটি মনে আছে, ১৯৭৫ সালের ২৭ মার্চ। মায়ের এক পরিচিতা একটি বই দিয়ে বললেন, তোমাকে একটা আধ্যাত্মিক দৈববাণী বলে যাই, হাল ছেড়ো না। তুমি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে যাচ্ছ এবং কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ। আমি একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। পরের বছর কানেকটিকাটে আমি একটি ক্যাম্পে উপদেষ্টা হয়ে কাজ করছিলাম। একজন আমাকে এসে বলল, 'তুমি কি কখনো অভিনয় করার কথা ভেবেছিলে? তোমার উচিত ভেবে দেখা।' আমি ফোর্ডহামে ফিরে শেষবারের মতো আমার 'মেজর' বদলে নিলাম। অভিনয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে আজ আমি বেরিয়ে পড়েছি, কথা বলছি বহু মানুষের সঙ্গে।

তাই ব্যর্থতা নিয়ে ভয় পেয়ো না। ব্যর্থতা তোমাদের জীবনের বন্দী হয়ে থাকা জিনিসগুলো খুলে দেবে। কখনো থামিয়ে দিলেও ব্যর্থতা জীবনের অনেক সুযোগ খুলে দেয়। তাই কখনো আশাহত হোয়ো না, পিছিয়ে পোড়ো না। তোমার সবকিছু দিয়ে এগিয়ে যাও। জয় করো। এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যর্থ হও। অভিনন্দন সবাইকে।

সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: শিখতী সানী

রোয়ান সেবাস্টাইন অ্যাটকিনসন(মি. বিন চরিত্রের অভিনেতা)

কথা কম কাজ বেশি



মি. বিন চরিত্রে অভিনয় করে রোয়ান সেবাস্টাইন অ্যাটকিনসন খ্যাতি পেয়েছেন বিশ্বব্যাপী। রোয়ানের জন্ম ১৯৫৫ সালের ৬ জানুয়ারি। লেখাপড়া করেছেন তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়ে।

আমাকে দেখলে অনেকেই মনে করেন, আমি বোধ হয় সিনেমার রুপালি পর্দার মতো বাস্তবেও সবাইকে হাসাব। কিন্তু আসলে ঘটনা সে রকম নয় মোটেও। ব্যক্তিগত জীবনে আমি কিছুটা চুপচাপ স্বভাবের। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে আমার মোটেও ভালো লাগে না। অবশ্য প্র্যাকটিক্যাল জোক ব্যাপারটা আমার খুব বেশি ভালো লাগে। আর আমি কথা কম বলতে পছন্দ করি বলেই হয়তো আমার মি. বিন চরিত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। আমাকে অনেকের কাছ থেকেই একই প্রশ্ন শুনতে হয়। প্রশ্নটা হলো, কী করে মি. বিন দুনিয়াজুড়ে এত জনপ্রিয়। তখন আমি তাদের বলি, আসলে মি. বিন হলো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের খোলসে আটকে পড়া এক শিশু। সব দেশেই শিশুদের একইভাবে দেখা হয়। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাওয়া যাক না কেন, শিশুদের ভাব প্রকাশের ভঙ্গি একেবারে এক। মি. বিনের চরিত্রে অভিনয় করার সময়ও আমার মাথায় সেটা থাকে। আমি একেবারে যেটুকু কথা না বললেই নয়, শুধু সেটুকু কথাই বলি আর বাকি সবটা আমার অঙ্গভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করি। এ কারণে সারা পৃথিবীর সব জাতির, সব ভাষাভাষী মানুষই আমার ভাষা বুঝতে পারে। আমাকে মানে মি. বিনকে পছন্দ করে তারা।

আমি ছোটবেলা থেকেই হাস্যরসিকতা পছন্দ করি। কিন্তু কখনো সেটাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা চিন্তা করিনি। আমার বাবার একটা ছোটখাটো খামার ছিল। ছোটবেলায়ই বুঝতে শিখেছিলাম যে আমরা খুব বেশি ধনী নই। তাই আমাদের

ছোটবেলাটা বেশ সাদামাটাভাবেই কেটেছে। ভালোভাবে বুদ্ধি হওয়ার আগেই দেখলাম, আমার দুই ভাই পড়াশোনা করতে বাড়ি ছাড়লেন। আমি যখন ১০ বছর বয়সে পা রেখেছি, তখন আমার দুই ভাই ব্যবসায় তাঁদের ক্যারিয়ার গড়া শুরু করেছেন। যা-ই হোক, আমাকেও আমার বড় দুজনের পথ অনুসরণ করে পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছেড়ে ডারহাম যেতে হলো। ডারহাম গিয়ে আমি ওখানকার ডারহাম ক্যাথেড্রাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি আর টনি ব্লেয়ার (যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী) একই সঙ্গে পড়তাম। টনি বেশ গম্ভীর ধরনের ছিল। আর আমি ছিলাম বেশ আমুদে আর রসিক। তবে আমাদের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ভাবতে ভালোই লাগে যে একজন প্রধানমন্ত্রী আমার ছোটবেলার খেলার সাথি ছিলেন। একটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আমি কিন্তু বরাবরই প্রথম সারির মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলাম। অবশ্য আমি সব সময় যে শুধু পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম, তা-ও কিন্তু নয়। আমি ওই স্কুলে একটা ফিল্ম সোসাইটিও চালাতাম, যার কাজ ছিল শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিশুতোষ বা হাসির সিনেমা দেখানো।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমি নিজে কিন্তু আমার ১২ বছর বয়সের আগে কখনো টেলিভিশন দেখিনি। সেই আমিই কিনা ফিল্ম সোসাইটিতে চার্লি চ্যাপলিন, লরেল অ্যান্ড হার্ডি—এঁদের সিনেমা দেখে নিজের অজান্তেই এঁদের নকল করা শুরু করলাম। আমি স্কুলের মঞ্চনাটকে ব্যাকস্টেজে কাজ করতাম। কিন্তু যখন মঞ্চে অভিনয় করতাম, তা হতো আরও ভালো। এ রকম দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে প্রথমবারের মতো বলেন অভিনয়টাকে সিরিয়াসলি নিতে। আমি নিয়েওছিলাম। সহপাঠীদের, শিক্ষকদের সব সময় হাসিয়েছি আমার অভিনয় দিয়ে। কিন্তু তখন আমার আসল যে দায়িত্বটা মানে পড়াশোনা সেটা কিন্তু পালন করেছি ঠিকভাবে। আমি পরীক্ষায় সব সময় ভালো নম্বর পেতাম। এ জন্যই একসময় স্কুল-কলেজের পাট চুকিয়ে নিউ ক্যাসেল ইউনিভার্সিটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এবং এভাবেই একদিন তড়িৎ প্রকৌশলী হয়ে গেলাম।

তবে একটা বিষয় আমি জানতাম প্রকৌশলের ওপর আমার থিসিস জমা দেওয়ার আগেই। সেটা

হলো, আমি আমার ক্যারিয়ার আর প্রকৌশল দিয়ে গড়ব না। বরং আমি আমার ক্যারিয়ার গড়ব কমেডিতেই, অভিনয়েই। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি আর আমার দুই বন্ধু এক অনুষ্ঠানে মঞ্চাভিনয় করে সাড়া ফেলে দিলাম। ওখানে আমার অভিনয় দেখেছিলেন এক সুপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম এজেন্ট। আমার অভিনয় তাঁর ভালো লাগল। তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। তার পর থেকে তিনি আমারও এজেন্ট হয়ে গেলেন। আমার ভাগ্যের মোড় ঘুরে গেল। বিয়ন্ড দ্য জোক-এ অভিনয় করলাম। তারপর বিবিসিতে অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পেলাম। আমি তখন যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যা-ই হোক, বিবিসিতে 'নট দ্য নাইন ওক্লক নিউজ' অনুষ্ঠানটি আমাকে খ্যাতি এনে দিল। এরপর 'দ্য ব্ল্যাক এডর সিরিজ' আমাকে মানুষের কাছে আরও বেশি পরিচিত করে দিল। অনুষ্ঠানটি এত জনপ্রিয়তা পেল যে এটার পাঁচটি সিরিজ তৈরি হলো।

এবার বলি আমার আরেক সত্তার কথা। মি. বিন। হ্যাঁ, মি. বিন হলো আমার আরেক সত্তা। মি. বিনের মূল চরিত্রে অভিনয় আমাকে পুরো বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করে তুলল। আমি যেখানেই যাই না কেন, লোকজন আমার পিছু আর ছাড়ে না। তারা আমাকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে মি. বিন চরিত্রের কারণে। নব্বইয়ের শুরুতে মি. বিন সিরিজ টিভিতে আসার পর থেকে ২০ বছর ধরে আমি এই চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছি। শুরুতে শুধু টিভি সিরিয়াল ছিল, কিন্তু যখন মি. বিন নিয়ে সিনেমা এল, তখনো আমি দর্শকদের মন খুলে হাসার সুযোগ করে দিয়েছি। সবাই জানতে চায়, আমি কী করে এমন একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলি। উত্তর খুব সহজ। আমি খুব সিরিয়াসভাবে কমেডি করার চেষ্টা করি। পুরো সময় মানুষ আমার অঙ্গভঙ্গি দেখেই হাসে, কথা বলি নিতান্তই সামান্য। অন্যকে হাসিয়ে নিজেও হাসি। আমি অনেক বাকপটু চরিত্রেও অভিনয় করেছি, যেখানে আমাকে অনেক বেশি কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু আমি মি. বিন চরিত্রে অভিনয় করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কারণ আমি কথা কম, কাজ বেশি নীতিতে বিশ্বাসী।

চার্লস স্পেন্সর চ্যাপলিন (চার্লি চ্যাপলিন)

সো সুখী পৃথিবীর জন্য লড়ি



ছোটখাটো দুই পায়ে বিশাল আকারের জুতা। হাতে বেতের ছড়ি, বিশেষ ভঙ্গিতে ছাঁটা গোঁফে গুঁজে রাখা চুরুট, গোল হ্যাট আর আঁকা কালো দুই চোখ—এই আমাদের পরিচিত, প্রিয় চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর পুরো নাম চার্লস স্পেন্সর চ্যাপলিন। চ্যাপলিনের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র: দ্য সার্কাস, মডার্ন টাইমস, দ্য কিড, সিটি লাইটস, মঁসিয়ে ভেরদু, দ্য গ্রেট ডিক্টেটর প্রভৃতি। মনে করা হয়, দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০) হিটলারকে ব্যঙ্গ করে নির্মিত। এ সিনেমায় চ্যাপলিন একটি বক্তৃতা দেন। বহু বছর পার হলেও আজও ভাষণটি তাঁর প্রেক্ষিত হারায়নি।

আমি খুবই দুঃখিত, তবে এটা সত্যি যে আমি কখনোই সম্রাট হতে চাইনি। এটা আমার কাজ নয়। আমি কাউকে শাসন কিংবা অধস্তন করতে চাই না। বরং আমি সবাইকে সাহায্য করতে চাই, তা সে ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাদা, কালো যে-ই হোক না কেন।

মানুষ মাত্রই একে অন্যকে সাহায্য করতে চায়। পরস্পরকে সুখী করার মধ্য দিয়ে বাঁচতে চায়। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আমরা কখনোই সুখী হতে পারি না। কাউকে ঘৃণা করেও সুখী হওয়া যায় না। সেই সঙ্গে এটাও সত্যি, পৃথিবীটা সব মানুষের। প্রভু এটাকে যথেষ্ট সম্পদশালী করে তৈরি করেছেন। প্রতিটি প্রাণীর ভরণপোষণের সামর্থ্য এ পৃথিবীমাতার আছে। পাশাপাশি প্রভু আমাদের প্রত্যেককে স্বাধীন ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকারও দিয়েছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা জীবনযাপনের সেই স্বর্গীয় পথটি হারিয়ে ফেলেছি। লোভ মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে ফেলেছে, বিশ্বকে ঘৃণায় ছেয়ে

ফেলেছে, আমাদের দুর্ভাগ্য আর যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে। আমরা জীবনে গতি এনেছি ঠিকই, কিন্তু নিজেদের আত্মাকে বন্দী করে ফেলেছি। যন্ত্রের আবিষ্কার আমাদের মধ্যে অপরিসীম চাওয়ার জন্ম দিয়েছে। জ্ঞান আমাদের হতাশাবাদী করে তুলেছে। আমাদের নির্মম ও কঠোর করে তুলেছে। আমরা অনেক কিছু ভাবি, কিন্তু অনুভব করি খুব কম। তাই এখন আমাদের আধুনিকতার অনুষঙ্গ নানা রকমের যন্ত্রপাতির চেয়েও বেশি প্রয়োজন মানবিকতা। বুদ্ধির চেয়ে বেশি প্রয়োজন অন্যের প্রতি মমতা ও বিনয়। এসব মানবিক গুণ ছাড়া জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে, হারিয়ে যাবে সব অর্জন। অ্যারোপ্লেন কিংবা রেডিও—বিশ্ববাসীকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে, পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে। এসব আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবকল্যাণ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, সবার মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। এসব আবিষ্কারের ফলেই এ মুহূর্তে আমার কণ্ঠও পৌঁছে যাচ্ছে সারা বিশ্বের লাখ লাখ নারী-পুরুষ, নিপীড়িত মানুষের কাছে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক, আমার কণ্ঠ যে শুনতে পাচ্ছে, তাকেই বলছি: হাল ছেড়ো না। আজ আমরা যে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, মানবকল্যাণবিমুখ কিছু মানুষের ঘৃণা ও লালসার কারণে চারদিকে যে আঁধার নেমে এসেছে, তা চিরকাল থাকবে না। জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ক্ষমতা আবার তাদের কাছেই ফিরে আসবে। আর মানুষের অস্তিত্ব যত দিন থাকবে, আত্মার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তত দিন বেঁচে থাকবে মানুষের মাঝে।

আর সৈনিক ভাইদের বলছি: তোমাদের অধিনায়কেরা তোমাদের দাস বলে মনে করে। তারা তোমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তোমরা কী করবে, কী করবে না, কী ভাববে, কী অনুভব করবে—এ রকম সবকিছু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তোমাদের সঙ্গে গবাদিপশুর মতো ব্যবহার করে। তাদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ো না। এসব কৃত্রিম মানুষের হৃদয় বলে কিছু নেই, যান্ত্রিকভাবেই তারা ভাবে, বোঝে। কিন্তু তোমরা তো যন্ত্র নও। তোমরা গবাদিপশু নও। তোমরা মানুষ। তোমাদের হৃদয়ে মানুষের জন্য

ভালোবাসা সঞ্চিত রয়েছে। মানুষকে তোমরা ঘৃণা করতে পারো না। তোমরা বরং ঘৃণা করো মিথ্যা ও যান্ত্রিকতাকে। তাই বলছি, সৈনিক ভাইয়েরা, দাসত্বের জন্য যুদ্ধ কোরো না, বরং লড়াই করো স্বাধীনতার জন্য।

আর যারা সাধারণ মানুষ, তাদের বলছি: তোমাদের যেমন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তোমরাই পারো সুখের সন্ধান দিতে। তোমাদের আছে জীবনকে স্বাধীন ও সুন্দর করে তোলার ক্ষমতা। জীবনকে এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা করে তোলার ক্ষমতা। তাই এসো, আমরা একত্র হই, সংগঠিত হই। একটা নতুন, স্বর্গীয় পৃথিবী গড়তে লড়াই করি। এ লড়াই তারুণ্যকে দেবে একটা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বার্ধক্যকে দেবে নিরাপত্তা। এসো, এ লড়াইয়ে নামার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

চলো, লড়াই করি স্বাধীন একটি পৃথিবীর জন্য। অতিক্রম করে যাই দেশ-কালের বাধা। ভেঙে ফেলি লোভ, ঘৃণা, অসহিষ্ণুতার বেড়াজাল। লড়াই করি এমন একটি পৃথিবীর জন্য, যেখানে যুক্তি ও বিজ্ঞান মানুষকে এগিয়ে চলার পথ দেখাবে। মানুষের এই অগ্রগতিই তাকে সুখী করে তুলবে। আর এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সুখী করে তুলবে। এমন একটি সুখী জীবনের জন্য এসো আমরা একত্র হই।

মনে রেখো, মেঘ একসময় কেটে যায়, সূর্য আলো ছড়ায়। আমরাও তেমনই অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে আলোর মুখোমুখি হব। আমরা এক নতুন পৃথিবী গড়ব। আমরা এমন এক স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পৃথিবী গড়ব, যেখানে মানুষ তার লোভ, নিষ্ঠুরতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, ছাড়িয়ে যাবে নিজেকে। মানুষের আত্মাকে ওড়ার ক্ষমতা দিয়েছেন প্রভু। তাই শেষ পর্যন্ত সে তার ডানা মেলে দেবেই। সে উড়ে যাবে রঙিন রংধনুর দিকে, আশার আলোর দিকে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। এমন অসীম ক্ষমতাধর আত্মা বিরাজ করে তোমার, আমার, আমাদের সবার মধ্যে। তাই হতাশ হোয়ো না, বরং সাহসী হও বন্ধু।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া
সংক্ষেপিত ভাষান্তর: ইসরাত জাহান

মেরিল স্ট্রিপ(হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী)

বদলে দিতে হবে পৃথিবী



হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপ। জন্ম ১৯৪৯ সালের ২২ জুন। অসাধারণ অভিনয়শৈলীর জন্য অস্কার পুরস্কারে মনোনীত হয়েছেন ১৭ বার। তিনবার জয় করেছেন অস্কার, আটবার গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার। ২০১০ সালের ১৬ মে বার্নার্ড কলেজে তিনি এই বক্তব্য দেন।

হ্যালো! আমি মেরিল স্ট্রিপ। আজ ২০১০ সালের স্নাতকদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অনেক সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে বলা হয়েছে তোমাদের সামনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু টিপস দিতে, কিছু অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে যেতে। আমি অভিনয় শিখেছি জীবনের নানা সুখকর, কষ্টকর কিংবা অস্বস্তিকর স্মৃতি থেকে। নিজের ভুল থেকেও শিখেছি। অন্য কোনো ব্যক্তির মতো নিজেকে সাজাতে চেয়েছি। অপছন্দের হলেও মানিয়ে নিতে শিখেছি। জীবনে নানা মানুষের সঙ্গে মিশে, নানা স্থান বেড়িয়ে, কখনো নেচে, কখনো গান গেয়ে, রান্না করে, বেহালা বাজিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে—সবকিছু মিলিয়ে অভিনয় করতে শিখেছি। অনেক নারীকেই বাস্তব জীবনে সেটা করতে হয়। আমি নিশ্চিত, এখানেও এমন অনেক নারী আছে। তাই নারীরা আসলেই অভিনয়জগতে পুরুষের চেয়ে দক্ষতার সঙ্গে ভালো চরিত্রায়ণ করে। কেন? কারণ, নারীদের অভিনয় করতে হয় তাদের প্রতিদিনের জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

অভিনয় করে চলা আমাদের জীবনের একটি মূল্যবান গুণ এবং আমাদের সবাইকে তেমনি করে চলতে হয়, জেনে কিংবা না জেনে। তা ছাড়া আমরা কেউ ধরা পড়তেও চাই না। সময়ের সঙ্গে, ভালো কিছুর জন্য আমরা বদলে যাই। ছোটবেলায় আমি অভিনয় করে, ভয়

দেখিয়ে, অন্য কিছু সেজে পছন্দের জিনিস পেতে চাইতাম। মনে আছে, নয় বছর বয়সে মায়ের কাজল কালো পেনসিল দিয়ে মুখে বয়সকালের বলিরেখাগুলো আঁকিয়ে আমি আমার নানির মতো হতে চাইতাম। অভিনয়ের শুরু এভাবেই। আমরা আসলে সবাই অভিনয় করছি। তাই নয় কি? অভিনয়ে দর্শকের সহানুভূতি আদায় করে নেওয়াটা শিল্পীর অসাধারণ একটি গুণ। হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি খুব শিখতে চাইতাম, কীভাবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের হৃদয়ে নাড়া দেওয়া যায়। প্রিয় চরিত্রগুলো নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা করতাম। আমি চরিত্রগুলোর মতো চুলের স্টাইল, লিপস্টিক, চোখের সাজ, পোশাক—সবকিছু হুবহু নকল করতে চাইতাম। মনে আছে, তার মতো ত্বক পেতে রোজ একটা আপেল খেতাম। চুলগুলো আয়রন করে সোজা বানাতাম। আমার হাসিটাও তার মতো বানাতে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। এভাবে কোনো একটি চরিত্রে ঢুকে যাওয়ার এত বেশি চেষ্টা বোধ হয় কখনোই করিনি। মায়ের কাছে নিত্যদিন নতুন ব্র্যান্ডের পোশাক চেয়ে জেদ ধরতাম। আমার কলেজে ছেলেদের কাছে আমি হয়ে উঠতাম আকর্ষণীয়। এটা আমি বেশ উপভোগ করতাম। পরবর্তী সময়ে ছবিতে চরিত্রায়ণের প্রয়োজনে আমি আমার স্বাভাবিক গুণগুলোকে কমবেশি বদলে চরিত্রের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইতাম। চরিত্রের প্রয়োজনে কখনো অহংকারী, কখনো প্রভাব বিস্তারকারী, কখনো শান্ত, নম্র এমন হয়ে থাকতে থাকতে আমি দেখেছি, কেউ কেউ খুব খুশি হতো।

একটা পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখো, যে মেয়েটি ছেলেদের প্রতিটি কথায় অহেতুক হেসে উত্তর দেয়, তাদের আলোচনা শুনেই যায়, তর্কে অংশ নেয় না, তাকে প্রতিটি ছেলেই সাদরে গ্রহণ করে। তার সঙ্গ পছন্দ করে। কিন্তু বাস্তবিক মেয়েটি আসলে প্রতিনিয়ত অভিনয় করে চলছে।

আমার অধিকাংশ পুরুষ দর্শকের পছন্দের চরিত্র ডেভিল ওয়ারস্ প্রাডা ছবির মিরান্ডা প্রিস্টলি। তার রূঢ় ও প্রভাবশালী একনায়ক

মনমানসিকতা পুরুষদের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়, তাই তারা দ্য ডিয়ার হান্টার ছবির লিন্ডার সঙ্গে মিশতে চায়, লিন্ডার প্রতি সহানুভূতি দেখায় কিন্তু নিজেরা মিরান্ডা হতে চায়। মিরান্ডা যে নেতৃত্বের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ তাকে বোঝে না। আসলে সে একা।

শেক্সপিয়ার থেকে সেলিঙ্গার সাহিত্যে পর্যন্ত আমরা পুরুষদের আধিপত্য দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এই ধারণাগুলো অনেক বদলে গেছে। আজকে দাঁড়িয়ে আমরা সেই ত্রুটিগুলো আলাদা করছি। তোমরা যারা বার্নার্ড কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছ, তারা অনেকটা অগ্রসর পথে চলেছ। তোমাদের কাছে আছে উন্নত শিক্ষা এবং মুক্তির কৌশল। তাই তোমাদের দায়িত্বও অনেক। আজ তোমরা যে অবস্থানে রয়েছ, সেটি ভবিষ্যতে তোমাকে কতটুকু সফলতা এনে দেবে, তার হিসাব করা কঠিন। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা সুবিধাপ্রাপ্তদের দলে। এই পৃথিবীতে নারীর অধিকার, লিঙ্গ সমতায়ন, দারিদ্র্য, এইডসের ভয়াবহতা, মৌলবাদীদের উত্থান, মানব পাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে। হয়তো এই সমস্যাগুলো স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো সময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক নয়। এগুলোর ইতি টানতে হবে। আর এ দায়িত্ব তোমাদেরই। তোমাদের সব সুযোগ, সব গুণ দিয়ে এই পৃথিবীকে বদলে দিতে হবে। বর্তমান আজ তোমাদের হাতে। সময় এখন তোমাদেরই। নারীরা আজকের পৃথিবীতে যতটা অগ্রসর, যতটা অর্জন করতে পেরেছে, তা অতীতের কোনো কালেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আজ নারীদের সর্বক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে পদচারণ ভাবাই যায় না। একে আরও এগিয়ে নিতে হবে। ইদানীং পৃথিবীতে দরিদ্র নারীরা সামান্য হলেও সম্পত্তি লাভ করছে, যারা একসময় নিজেরাই সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো।

২৭ বছর আগে ভাসার কলেজের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমার বক্তব্য আর আজকের আমির মাঝে রয়েছে অনেক অভিজ্ঞতার পার্থক্য। এখন মনে হয় আমি তরুণদের

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ভাগ মাত্র বুঝতে পারি। এর বেশি নয়।
সাফল্য, খ্যাতি ও যশ নিয়ে বলতে গেলে আমার কথা শেষ হবে না। কিন্তু এসব বাস্তবতা থেকে নিজেদের এবং প্রিয়জন থেকে আমাদের আলাদা করে রাখে। নিজেদের মাঝে অসাধারণ আত্মিক যে রত্নভান্ডার লুকিয়ে আছে, তার খোঁজ পাওয়া যায় তখনই, যখন এটি শেষ হয়ে যায়। খ্যাতি আসলেই আমাদের পরিবার ও কাছের মানুষগুলোর জন্য কঠিন হয়ে যায়, যদিও এই খ্যাতিই আমাকে তোমাদের সামনে এই বক্তৃতাটি দিতে সুযোগ করে দিয়েছে। খ্যাতিতে তাই যতটা না সফলতা আছে, সফলতা তার চেয়ে বেশি আছে পৃথিবীতে মন থেকে বোঝার মধ্য দিয়ে, মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে, অন্যকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে। একজন তারকা হিসেবে আমি শিখেছি কীভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। আর একজন অভিনেত্রী হিসেবে আমি শিখেছি, কীভাবে নিজের আত্মাকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।
আমি আসলেই তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ নিজেকে আরও ভালো করে জানার এই সুযোগটি পেয়ে। তোমাদের বিখ্যাত হতে হবে না। তোমাদের শুধু এমন কিছু করে যেতে হবে, যাতে মা-বাবা তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারেন। আমি নিশ্চিত, আজ তাঁরা তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। শুভকামনা সবাইকে। অভিনন্দন!
সূত্র: ওয়েবসাইট
ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: শিখতী সানী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

অমিতাভ বচ্চন (প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পী)

নিজের হাতেই গড়ো নিজের গল্প



প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পী অমিতাভ বচ্চনের জন্ম ১৯৪২ সালের ১১ অক্টোবর। যুক্তরাজ্যের মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণের সময় তিনি এই বক্তব্য দেন।

শুভ সন্ধ্যা জানাই মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট সবাইকে। সেই সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন যাঁরা তাঁদেরও। ডি মন্টফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে আসতে পেরে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। আমাকে এখানে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে। তাঁরা যখন আমাকে এই সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার কথা জানালেন, তখন তা শুনেই আমার মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তা হলো, 'আমি কি ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্য?' প্রথমে আমার মনে হলো, 'হ্যাঁ, এটা আমার প্রাপ্য।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, 'আমি তো দিনের পর দিন কোনো গবেষণাকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তাহলে?' এমন 'হ্যাঁ' আর 'না'-এর মধ্যেই আটকে গিয়েছিলাম আমি।

যা-ই হোক, এখন আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতি ভাগাভাগি করে নেব সবার সঙ্গে। ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এই ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়াটা আমার জন্য আসলে অনেক বড় কিছু। কারণ, এই বিশ্ববিদ্যালয় তার অনবদ্য শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের জন্য সুপরিচিত। এটা এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ঐতিহ্য আর নতুনের মেলবন্ধন ঘটেছে। পুরোনোর সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল ঘটেছে এখানে। এটি যুক্তরাজ্যের গর্ব। এখান থেকে সৃষ্টিশীল শিক্ষার্থী

তৈরি হয়।
যত ধরনের সৃষ্টিশীল মাধ্যম আছে, তার মধ্যে সিনেমার মাধ্যমেই কোনো দেশের বা মানুষের সংস্কৃতি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পায় বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে সিনেমার স্থানটা অনেক উঁচুতে। সিনেমার মাধ্যমে সারা বিশ্ব আমাদের দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। আমাদের দেশে একসময় সিনেমা মানে সবাই বুঝত যে এটা শুধু বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু আজ সিনেমা আর শুধু বিনোদনের মাধ্যমই নয়, ভারতীয় সিনেমা ভারতের ঐতিহ্যের কথা বলে, মানুষের কথা বলে।
যা হোক, আজ আমার সামনে যারা বসে আছে, তারা সবাই তাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটা দিন পার করবে আজকে। সবাই তাদের পরিশ্রমলব্ধ ডিগ্রি অর্জন করবে আজকে। পাঁচ-ছয় বছরের পরিশ্রমের ফল আজ তোমরা পাবে।
অনেক বছর আগের কথা, আমি তখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছিলাম। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না, সামনের দিনগুলোতে আমি কী করব।
সিনেমাতে আসার অনেক ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সে সময় এটা আসলে চিন্তা করাও আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু আমার প্রতি আমার পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন, আর মহান স্রষ্টার ইচ্ছায় সবকিছু অন্য রকমভাবে হয়েছিল। আমি আমার জীবনের বড় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময় আমার বাবার সমর্থন পেয়েছি সব সময়। তিনি অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন। পরিবারের সমর্থনের চেয়ে বড় কিছু আর হতে পারে না। আর আমি অনেক ভাগ্যবান যে আজও আমার পরিবার সব সময় আমার পাশে থাকে।
আমার মনে হয়, আমরা বাস করি অদ্ভুত এক জগতে, যেখানে সব সময় প্রতিযোগিতা লেগেই রয়েছে। আর এমন একটা পৃথিবীতেই তোমাদের বাস করতে হবে। এই পৃথিবীকেই নেতৃত্ব দেবে তোমরা। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেক বাধাবিপত্তি আসবে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু কোনোভাবেই স্বার্থপরতার পথ বেছে নেওয়া যাবে না। কখনোই অপেক্ষা করে থেকো না যে

www.facebook.com/tanbir.ebooks
নেতারা কখন পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কারণ, এখন থেকে তোমরাই নেতা। পরিবর্তন আনার দায়িত্ব তোমাদেরই। তোমরা তরুণসমাজই নিয়ে আসবে পরিবর্তন। যেখানেই যাও না কেন, যেভাবেই থাকো না কেন—সব সময় সৃষ্টিশীল চিন্তাচেতনার মধ্যে থাকতে হবে। আমি তোমাদের উপদেশ দেব সব সময় চিন্তা করার জন্য। ভালো কিছু করার চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকার জন্য। কারণ, এই ভালো চিন্তাই নিয়ে আসবে পরিবর্তন। কখনো সাহস হারাবে না। কখনো নিজের সংকল্প থেকে সরে আসবে না। নিজের কাছে যেটা ভালো মনে হয়, সেটার জন্য চেষ্টা করতে হবে সব সময়। নিজের যা নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে, সেটাকেই বেছে নিতে হবে। যখন নিজে সফলতার দেখা পাবে, তখন ভেবে দেখবে, যে ছোট ছোট কাজ সময়ের অভাবে করতে পারনি একসময়, সেগুলো তখন করা যায় কি না। আজ এখানে বসে অনেক কিছুকেই অবাস্তব বা অসম্ভব মনে হতে পারে; কিন্তু মনে রেখো, পৃথিবীতে তোমার নিজের জায়গা তোমাকেই করে নিতে হবে। তুমি নিজের জীবনকে এখন থেকে মনে করবে একটা সাদা কাগজ, যে কাগজে লেখার সুযোগ রয়েছে একমাত্র তোমারই এবং কী লিখবে, সেই সিদ্ধান্তটিও কিন্তু তুমিই নিতে পারো। অনেক স্বপ্ন, অনেক লক্ষ্য রয়েছে তোমার এবং এগুলোকে সফল, বাস্তব করতে পারো একমাত্র তুমিই। সাদা কাগজটিতে নিজের জীবনের গল্প নিজেই লেখো, জীবনটাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে লেখার সুযোগ কিন্তু তোমার হাতেই—সবার চেয়ে সেরা হওয়ার সুযোগটাও তোমার কাছেই আছে। ধন্যবাদ সবাইকে।

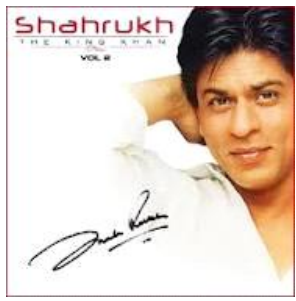
সূত্র: ওয়েবসাইট। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত

অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

শাহরুখ খান (জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা)

ব্যর্থতা জিন্দাবাদ



শাহরুখ খান জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা। ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি এই বক্তৃতা দেন।

শুভ সন্ধ্যা! আজকে এখানে আসার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আজকে আমি তোমাদের আমার জীবনের সবচেয়ে সরল কথাগুলো বলে যাব। জানি না আমার কথায় তোমরা অনুপ্রাণিত হবে কি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, এই সহজ সত্যগুলো তোমাদের টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

জীবনকে অনেকভাবেই মাপা যায়; বয়স, সময় কিংবা লক্ষ্য দিয়ে বোঝানো যায় জীবনের পথচলা। সময়ের পরিমাপ আমাকে প্রায়ই বিভ্রান্ত করে। যেদিন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, সেই একটি দিন আমার কাছে সারা শৈশবের চেয়েও দীর্ঘ মনে হয়। আমার জীবনের গন্তব্য কোথায়, মনে হয় না এই প্রশ্নের উত্তর আমি কখনো জানতাম। আমি হেঁটেছি, প্রাণপণে দৌড়েছি আমার স্বপ্নের পথে, যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু এসেছে, সবই এসেছে নিজেদের নিয়মে। আমি বদলেছি, আমার চারপাশের মানুষেরা বদলেছে, পুরো পৃথিবীটা বদলেছে, এমনকি আমার স্বপ্নও বদলে গেছে। কোথায় পৌঁছাতে হবে, তা আমি সত্যি জানতাম না। আমি শুধু সেটাই করে গেছি, যা আমি জানতাম, আমি সবচেয়ে ভালো পারি।

তাহলে আজকে আমি নিজের মতো করে আমার গল্প বলব। আমার মতে, জীবনের মাপকাঠি হলো হৃদয়ের আর অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা। এর বাইরে আর কিছুতেই তেমন কিছু যায়-আসে না। খ্যাতি, সাফল্য, সৌন্দর্য—এ সবকিছুর চেয়েও একটি পরিপূর্ণ হৃদয়ের মূল্য অনেক বেশি।

আমি একজন অভিনেতা। জর্জ বার্নস

বলেছিলেন, 'অভিনয়ের মূলে রয়েছে সততা'। শুদ্ধ সততার সঙ্গে যখন আমি কোনো চরিত্র রূপ দিতে পারি, তখন সেটাই হয় প্রকৃত অভিনয়। শুদ্ধতম অভিব্যক্তিগুলো আসে অভিনেতার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

এটা সত্যি যে সৃষ্টি যখন সবার সামনে উন্মোচিত হয়, তখনই তা স্রষ্টার থেকে আলাদা হয়ে জনগণের সম্পদ হয়ে যায়। এমন অনেক রাত গেছে, আমি হয়তো কোনো পুরস্কার পেয়ে প্রচণ্ড খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে বাড়ি ফিরেছি। আর তারপর আবিষ্কার করেছি কোনো সমালোচক লিখেছে যে আমাকে পুরস্কারের বদলে কাঁচা কলা দেওয়া উচিত ছিল! রাগে, ক্ষোভে তখন মনে হয়, কাঁচা কলা আর সমালোচক—এই দুটিরই চামড়া ছাড়িয়ে বাঁদরদের উপহার দেওয়া উচিত! এমন মুহূর্তগুলোতে আমি ক্ষণিকের জন্য হাল ছেড়ে দিই, কিন্তু তা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যখন তুমি ভেঙে পড়বে, যখন সারা পৃথিবী তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, তখন টিকে থাকার একটাই উপায়। আর তা হলো, তোমার প্রকৃত সত্তাকে আঁকড়ে ধরা। পৃথিবী তোমাকে না বুঝতে পারে, ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু অন্তত তোমার নিজেকে চিনতে হবে।

আমার বেলায় ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত সমঝোতার মতো। আমি নিজের মতো অভিনয় করি, করতে চাই, আবার দর্শক আমার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। আমাকে একই সঙ্গে আমার সেরা কাজটা দিতে হয়, আবার আমি যাদের জন্য কাজ করছি, তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে যাতে আমি বিচলিত না হয়ে পড়ি, এটাও খেয়াল রাখতে হয়। আমি চেষ্টা করি লাইনচ্যুত না হতে। ভেতরে যা-ই চলতে থাকুক না কেন, বাইরে আমি ঠিকই হাসছি, অটোগ্রাফ দিচ্ছি। কখনো কখনো মনে হয়, আমি একটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে চলছি। আমার দর্শক হচ্ছে পথচারীরা, যারা আমাকে হাততালি দিচ্ছে খানিকটা কৌতুকের বশে, খানিকটা দয়া করে আর খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে। কিন্তু দর্শক যারাই হোক না কেন, আমি জানি আমার অন্তর্নিহিত সত্তা ঠিকই আমার অভিনয় দেখছে, ভালো

কাজের জন্য বাহবা দিচ্ছে, আমার বোকামিগুলো দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তাই আমি বলব, নিজেকে চিনতে শেখো, নিজের ওপর থেকে কখনো বিশ্বাস হারিয়ো না। নিজের জীবন নিয়ে কখনো হতাশ হয়ো না। জীবনের ওপর হতাশা আর বিতৃষ্ণা তোমার যত ক্ষতি করবে, তেমনটা আর কোনো কিছুই করতে পারবে না। নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখো।

সমালোচনা, নিন্দার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। প্রচলিত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করতে ভয় পেয়ো না। একলা চলতে দ্বিধা কোরো না। তোমাদের বয়সে আমি যা চাইতাম, আজ আমার সেই সব কিছু আছে। আমি সাফল্য পেয়েছি, খ্যাতি পেয়েছি, আমার যথেষ্ট সম্পদ আছে। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই আমাকে এতটা সুখ দেয়নি, যা দিয়েছে আমার সন্তানেরা। তোমরা এখনো বাবা-মা হওনি, কিন্তু তোমাদের বাবা-মা আছেন, যাঁরা তোমাদের অপরিসীম ভালোবাসেন। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁদের ভালোবাসার কোনো তুলনা চলে না। খেয়াল করে দেখবে, সত্যিকারের সুখ এমন সব জিনিসে থাকে, যা কখনো গোনা যায় না। আর দেখ, এই ভালোবাসার বিনিময়ে তাঁরা তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না। তোমরা তাঁদের অনুভূতিগুলোকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, এটাই তাঁদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। আমি দুটো অসম্ভব দুষ্টু শিশুর বাবা হয়ে বলছি। সন্তান হিসেবে তোমরা যা-ই করো না কেন, যত বড় ভুলই করো না কেন, বাবা-মায়ের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই। তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে, তাঁরা বিরক্তিকর, একঘেয়ে, একগুঁয়ে। আমার সন্তানরাও আমায় তা-ই মনে করে। কিন্তু যদি কখনো কোনো ঝামেলায় পড়ো, তোমার মা-বাবাকেই তুমি সবচেয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারো। আমি অনেক কম বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়েছি, আমি জানি, তাঁদের আমি কতটা মিস করি।

একটা কথা মনে রেখো, সাফল্য অনেক আকাঙ্ক্ষিত হলেও, বেশির ভাগ সময়ই তা আমাদের বড় কিছু শেখাতে পারে না। আর সেজন্যই সফল হওয়ার চাবিকাঠি-জাতীয় কোনো

উপদেশ আমি দেব না। সত্য কথা হলো, আমি যতটা সফল হয়েছি, তা পেরেছি কারণ আমি ব্যর্থতা মানতে পারতাম না। সফল হওয়ার জন্য আমি কখনো এতটা প্রাণপণ চেষ্টা করিনি, যতটা না করেছি ব্যর্থতাকে এড়ানোর জন্য। আমি খুব সাধারণ এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দারিদ্র্য কী জিনিস তা আমি খুব স্পষ্টভাবে চোখের সামনে দেখেছি। আমি জানি, তার আসল রূপ কতখানি নিষ্ঠুর। যখন আমার বাবা-মা মারা যান, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আর একটি শব্দ যোগ হয়—ব্যর্থতা। আমি কোনোমতেই আর দরিদ্র থাকতে চাইনি। তাই যখন আমি প্রথম অভিনয় শুরু করি, তার সঙ্গে সৃজনশীলতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি যেসব সিনেমা করতাম, তার বেশির ভাগই ছিল অন্যদের ফেলে দেওয়া চরিত্র, অথবা এমন কিছু, যাতে কেউই অভিনয় করতে রাজি হয়নি। আমি সেসব চরিত্রের প্রতিটিতে অভিনয় করেছি, শুধু একটা কারণে, যাতে আমাকে বেকার বসে না থাকতে হয়। এসব করতে করতেই একসময় আমি বড় অভিনেতা হলাম। সাফল্য তার নিজের নিয়মেই আমার জীবনে এসেছে, আমি আমার নিজের কাজটুকু করেছি মাত্র। তাই আমার মনে হয়, ব্যর্থতার যথেষ্ট ভয় না থাকলে, ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে সফল হওয়া কঠিন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছু কথা বলতে পারি।

১. ব্যর্থতা না থাকলে সফল হওয়া কঠিন। ব্যর্থ হওয়ার পর তোমার প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে তুমি এরপর সফল হবে কি না। আমি সব সময় বিশ্বাস করি, যদি একটা উপায় কাজ না করে, তাহলে অন্য কোনো একটা নিশ্চয়ই করবে। তাই আমি চেষ্টা করে যাই।

২. একবার ব্যর্থ হলে আমি আরও বেশি কাজ করা শুরু করি, আরও বেশি চেষ্টা করতে থাকি। বেশির ভাগ সময় এতেই সাফল্য এসে ধরা দেয়।

৩. যখন একের পর এক ব্যর্থতা আসতে থাকে, তখন বুঝতে পারি, আমি হয়তো আমার নিজের সত্তাকে ভুলে আমি যা নই তা হতে চাইছি। তখন আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি, যা

আমার কাছে সত্যিকার অর্থেই গুরুত্ব বহন করে, আমি শুধু তাতেই মনোযোগ দিই।
৪. ব্যর্থতা তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কে তোমার প্রকৃত বন্ধু আর কে নয়। সংকটের মুহূর্তগুলোতেই আমাদের সম্পর্কগুলোর পরীক্ষা হয়ে যায়।
৫. যখন আমি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠি, তখন নিজেকে আরও ভালো করে চিনতে পারি। নিজের সম্ভাবনাগুলোকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করি। এভাবেই আমার আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।
জীবনটা আসলে কতগুলো অর্জন, সাফল্য, যোগ্যতা আর পুরস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনকে জানো, স্বপ্ন দেখো; ব্যর্থ হলে ঘুরে দাঁড়াও। তোমার যা আছে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে শেখো। লোকের কথায় কান দিয়ো না আর ব্যর্থতাকে ভুলে যেয়ো না। নিষ্ঠুর হলেও সে-ই প্রকৃত বন্ধু।

রবিশংকর (জগদ্বিখ্যাত সেতারবাদক)

তরুণদের কাছ থেকে আমি শিখি



জগদ্বিখ্যাত সেতারবাদক রবিশংকরের জন্ম ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল ভারতে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে যাঁরা বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবিশংকর অন্যতম। ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনের যৌথ উদ্যোক্তা তিনি।
১৯৩০ সাল, আমার বয়স তখন মাত্র ১০ বছর। তখন আমার বড় ভাই নৃত্যশিল্পী উদয় শংকরের সঙ্গে প্যারিস সফরে গিয়েছিলাম ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশন করতে। মানে, আমার শুরুটা আসলে হয়েছিল নৃত্যশিল্পী হিসেবেই। পরে আমি আস্তে আস্তে নাচ ছেড়ে সংগীতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠি। এর পাঁচ বছর পর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের সান্নিধ্য পেলাম। তিনি হয়ে উঠলেন আমার গুরু। আমি আবার ভারতে

ফিরে এলাম তাঁর কাছে তালিম নেওয়ার জন্য। পাশ্চাত্যের সংগীতশিল্পের চেয়ে ভারতীয় সংগীত কিছুটা আলাদা। অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্রে প্রথমে সুর কম্পোজ করা হয়, তারপর শিল্পী সেই সুর অটুট রেখে বাজানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক সে রকম নয়। আমি যখনই মঞ্চে পারফর্ম করি, তখন আমার বাজানো সুরের ৯৫ শতাংশই একেবারে বদলে যায় আগের বারের চেয়ে।

'এখন আমার বয়স ৯১ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে যশ-খ্যাতি এসব নিয়েই বাঁচতে শিখতে হয়েছে আমাকে। ১৯৬৬ সালের দিকের কথা, তখন আমি জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে কাজ শুরু করেছি। সে সময় একজন পপস্টার হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম আমি। যেখানেই যেতাম, সবাই আমাকে চিনে ফেলত। কিন্তু আমার সে ব্যাপারটা একদমই ভালো লাগত না। সে সময় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অনেক শ্রোতাই মনে করত যে আমি হয়তো ভারতীয় সংগীত বিসর্জন দিয়ে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে কাজ শুরু করেছি। জর্জ হ্যারিসনের 'বিটলস' ব্যান্ডের 'পঞ্চম সদস্য' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছিলাম আমি। তখন ভারতের সবাই বলাবলি করত, আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার সারা জীবনের কোনো একটা অংশ নিয়ে যদি আমি গর্ব করতে পারি, তবে তা হলো পশ্চিমাদের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলা। যখন আমি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে পশ্চিমের মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিই, প্রথমে তারা এটা খুব একটা আমলে নেয়নি। এ রকম এক সময়ে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের কনসার্টে আমি টিউনিং করার সময় দর্শকেরা হঠাৎ তালি দিতে শুরু করে। তখন আমি তাদের অনুরোধে তাদের উদ্দেশে বাজাতে থাকি। এভাবেই আস্তে আস্তে সংগীতের এই অনন্য ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে পশ্চিমারা। সে ধারা আজও অটুট রয়েছে।

শুধু সংগীত নয়, পিকাসো আর মাতিসের আঁকা চিত্রকর্মের ওপরও আমার ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এই কালজয়ী শিল্পীদের চিত্রকর্ম

www.facebook.com/tanbir.ebooks
সংগ্রহে রাখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার তো মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা নেই, তাই সেটা সম্ভব হয় না। আমি সংগীতের অনেক ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছি; কিন্তু যন্ত্রনির্ভর সংগীতের ব্যাপারে আমি কখনোই আগ্রহী হতে পারিনি। যন্ত্রনির্ভর সংগীত জিনিসটা আমাকে কেমন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

আমাকে একটা ব্যাপার বেশ পীড়া দেয়, আর সেটা হলো, আমি মনের দিক থেকে এখনো তরুণ রয়েছি, আমার মাথায় সংগীতবিষয়ক নিত্যনতুন হাজারো চিন্তা খেলা করে, কিন্তু আমার ৯১ বছরের জীর্ণ শরীর তা বাস্তবে রূপ নিতে দেয় না। আমি মনে করি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো আমার পরিবার। আমি আমার পরিবার নিয়ে গর্বিত। আর কেউ যদি আমাকে মনে রাখতে চায়, তাহলে আমি চাই সে যেন আমাকে একজন সুরসাধক হিসেবেই মনে রাখে। এ সময়ের তরুণ শিল্পীদের আমি কোনো গৎবাঁধা উপদেশ দিতে চাই না; বরং আমি চাই তাদের কাছ থেকে শিখতে। তরুণদের সংগীতপ্রতিভা থেকে শিক্ষা নিতে চাই আমি।'

দ্য গার্ডিয়ানের একটি সাক্ষাৎকার অবলম্বনে

অনুবাদ ফয়সাল হাসান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

মাইকেল জ্যাকসন (কিং অব পপ)

তুমিই জয়ী হবে



আট বছর বয়স থেকেই মঞ্চ মাতানো শুরু। জ্যাকসন ফাইভ ব্যান্ডদলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটি এ সময় পরিচিতি পান নিজের নামেই। শুধু গান নয়, নাচ, ফ্যাশন—সবকিছুতেই মাইকেল জ্যাকসন (১৯৫৮—২০০৯) ছিলেন অনবদ্য। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাঁকে দিয়েছে সর্বকালের সেরা এন্টারটেইনারের খেতাব। পেয়েছেন কিং অব পপ উপাধিও। পাশাপাশি কাজ করে গেছেন সারা বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য। 'হিল দ্য ওয়ার্ল্ড' ফাউন্ডেশন গড়েছেন এ কাজের জন্য। ২০০১ সালের ৬ মার্চ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে 'হিল দ্য কিডস' উদ্যোগটি পরিচিত করার জন্য এ বক্তব্য দেন তিনি।

এখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমার কী কী যোগ্যতা আছে—সে কথা বলেই বোধহয় শুরু করা উচিত। বন্ধুরা, আমার আগে এখানে যাঁরা বলে গেছেন, তাঁদের মতো পড়াশোনা আমার নেই। ঠিক তেমনই আমার মতো 'মুনওয়াক' করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তবে একটা দাবি আমি করতেই পারি, বেশির ভাগ মানুষের তুলনায় দুনিয়াটা আমার অনেক বেশি দেখা হয়েছে। শুধু কাগজ আর কালিতে তো ধরা যায় না মানুষের জ্ঞান। হৃদয়ে যে কথা লেখা হয়ে থাকে, আত্মায় যা গেঁথে যায়, শরীরে যা খোদাই হয়ে যায়, সেসব মিলিয়েই তৈরি হয় মানুষের জ্ঞান। আর এই জীবনে আমি যত কিছুর মুখোমুখি হয়েছি, তাতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমার বয়স মাত্র ৪২! অনেক সময় আমার মনে হয় বয়স বোধ হয় ৮০ ছাড়িয়ে গেছে।

আমার অর্জনগুলো দিয়ে কিন্তু আমার ভেতরের

মানুষটাকে চেনা যাবে না। ভক্তদের সামনে রকিন, রবিন বা বেন গাইতে থাকা পাঁচ বছরের শিশুটি আর তার হাসির আড়ালে থাকা শিশুটি এক নয়। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই গান গাইছি, নাচছি। কাজটা আমার জন্য খুব আনন্দেরও। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম গাছ-বাড়ি বানিয়ে, লুকোচুরি খেলে আমার শৈশবটা কাটাতে। আমার আশপাশের শিশুদের এমন জীবন দেখে হিংসা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার। আমার কোনো শৈশব নেই—এই বোধটাই আমাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল।

আমি এসব তোমাদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বলছি না। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বোঝানোর জন্যই বলছি। আজ শুধু হলিউডের শিশুরাই নয়, সারা বিশ্বেই শিশুরা ভুগছে এই বেদনায়, শৈশব না থাকার কষ্টে। এখন শিশুদের ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার জন্য। যেন শৈশব খুব কষ্টের সময়। এটাকে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে হবে। আর এর ফলে শিশুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মা-বাবা ও পরিবারের কাছ থেকে।

এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই যেন জন্ম নিয়েছে এক নতুন প্রজন্মের। আমি সেই প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি। আমাদের বাইরেটা ঝাঁ চকচকে—টাকা-পয়সা, দামি কাপড়চোপড়, বিলাসবহুল গাড়ি। কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। এটা শুধু আমাদেরই যন্ত্রণা নয়, আমাদের মা-বাবারও। আজ আমি শিশুদের অধিকারের কথা বলতে চাই। প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি শিশুর এই অধিকার থাকবে:

১. ভালোবাসা পাওয়া। ২. সুরক্ষা পাওয়া। ৩. মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হওয়া। হয়তো সে কিছুই করতে পারেনি, তবুও সে মূল্যবান। ৪. শিশুর সব কথা মন দিয়ে শোনা—তা খুব উপভোগ্য না হলেও। ৫. ঘুমোতে যাওয়ার আগে অন্তত একটা গল্প শুনতে পাওয়া—সন্ধ্যার খবর বা টিভি সিরিয়ালের সময়টা যাতে এ জন্য বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ৫. স্নেহ পাওয়া—হয়তো মা ছাড়া আর কারও কাছেই শিশুটি সুন্দর নয়, তবুও।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
বন্ধুরা, আমাদের সব জ্ঞানের, বোধের শুরুটা হোক এভাবে—আমরা জানি আমাদের কেউ না কেউ ভালোবাসে।

প্রায় ১২ বছর আগের কথা। আমার ব্যাড ট্যুরের আগে ছোট্ট একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে আমাকে, আমার গান কত ভালোবাসে, সেসব বলল। ছেলেটি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিল। তার মা-বাবার কাছ থেকে জানলাম, যেকোনো দিন সে মারা যেতে পারে। আমি ছেলেটিকে বললাম, 'তিন মাসের মধ্যে আমি তোমার শহরে গান গাইতে আসব। তোমাকে আমার এই জ্যাকেটটা দিলাম। এটা পরেই কিন্তু তুমি আমার গান শুনতে আসবে।' তাকে আমার পাথর বসানো দস্তানাও দিয়েছিলাম। সাধারণত আমি কাউকে দস্তানা দিই না। পরে শিশুটির শহরে গিয়ে শুনি সে মারা গেছে। তার সমাধিতে দেওয়া হয়েছে আমার সেই জ্যাকেট আর দস্তানা। তার বয়স ছিল মাত্র ১০। কিন্তু একটাই সান্ত্বনা, সে জেনে গিয়েছিল তাকে কেউ ভালোবাসে। তার মা-বাবা শুধু নন, আমার মতো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষও তাকে ভালোবাসে। সে জেনে গিয়েছিল, এই পৃথিবী থেকে সে একা বিদায় নিচ্ছে না।

পৃথিবীতে আসার আগে আর পৃথিবী ছাড়ার সময় তুমি যদি জানতে পার, কেউ তোমাকে ভালোবাসে, তাহলে যেকোনো পরিস্থিতিই খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকেরা তোমাকে তিরস্কার করতে পারেন, তোমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চাপ দিতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে। কীভাবে কেউ তোমাকে আটকাবে! তোমার তো ভালোবাসার শক্তি আছে।

কিন্তু যদি এই শক্তিটা তোমার না থাকে, গোটা জীবন চলে যাবে তার খোঁজে। যত বিখ্যাতই হও, যত ধনীই হও, ভেতরটা তোমার ফাঁকাই রয়ে যাবে।

কোথা থেকে আমাদের মধ্যে এত ক্রোধ, বেদনা আর সহিংসতা আসে! উত্তরটা আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

কাজ শেষে মা-বাবারা বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
অনেকেই মাথাটা রেখে আসেন অফিসে। আর তাঁদের শিশুরা পায় মা-বাবার ছিটেফোঁটা মনোযোগ। তাদের মধ্যে ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছাটাই মরে যায়। নিজের মতো করে বেড়ে ওঠে তারা। পেছনে ফেলে যায় মা-বাবাকে। আমি তোমাদের অনুরোধ করব, এমন ভুল তোমরা কেউ কোরো না। যদি ভাবো, মা-বাবা তোমাদের অবহেলা করেছেন, তাঁদের ক্ষমা করে দাও। তাঁদের শেখাও, কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

আমার বাবা ছিলেন বেশ দক্ষ একজন ব্যবস্থাপক। আমি ও আমার ভাইয়েরা সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঋণী। তিনি কোনোদিন আমার সঙ্গে খেলেননি। আমার চোখে চোখ রেখে বলেননি আমাকে তিনি কত ভালোবাসেন। আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসতাম। কিছুদিন পরপরই সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম রান্নাঘরে আমার জন্য এক ব্যাগ ডোনাট রাখা আছে। আমার বাবা কোনোদিন আমাকে সেটা বলেননি। কত দিন ভেবেছি, রাতে জেগে থাকব আর তাঁকে ডোনাট রাখার সময় ধরে ফেলব। কিন্তু আমি এই মজার খেলাটা নষ্ট করতে পারিনি এই ভয়ে, তিনি হয়তো আর কোনোদিন আমার জন্য ডোনাট আনবেন না।

তিনি আমার জন্য কী করেননি, সেসব নিয়ে আমি আর ভাবি না। তিনি কতটা করেছেন, সেটাই ভাবি।

বাবা খুব দরিদ্র পরিবারে বড় হয়েছেন। আমাদের বড় পরিবার চালাতে হতো তাঁকে। ইস্পাত কারখানায় কাজ করতেন তিনি। এমন কাজ, যা আস্তে আস্তে অনুভূতিগুলো ভোঁতা করে দেয়। তিনি যে আমাদের সফল হওয়ার জন্য এত চাপ দিতেন, এটা কি খুব আশ্চর্যের? তাঁর শাসনটাকে আমি আজ ভালোবাসা হিসেবেই দেখি। সেই ভালোবাসা নিখুঁত নয়, কিন্তু ভালোবাসা তো! তিনি চাইতেন কেউ যেন তাঁর সন্তানদের ছোট করতে না পারে। আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমার শুরুর দিকের রাগের অনুভূতিটা এখন ক্ষমায় পরিণত হয়েছে।

এক দশক আগে গড়ে তুলেছিলাম দাতব্য

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
প্রতিষ্ঠান হিল দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি এর সাফল্যে বিশ্বাস করি? আমি কি বিশ্বাস করি, এই পৃথিবীটার ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারব? নিশ্চয়ই করি। না করলে আজ আমি এখানে আসতাম না। কিন্তু এর শুরুটা হতে হবে ক্ষমা দিয়ে। কারণ পৃথিবীর ক্ষত সারিয়ে তোলার আগে নিজের ক্ষত শুকাতে হবে। আজ আমি বুঝি, আমি কখনোই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারব না, যদি না আমার শৈশবের ক্ষতগুলোর কথা ভুলে যাই। তাই তোমাদের বলছি, মা-বাবাকে সম্মান করো। তাঁদের কাজের বিচার করতে যেয়ো না। তাঁদের সুযোগ দাও।

ক্রোধ, হতাশা আর অবিশ্বস্ত এই পৃথিবীতেই আমাদের বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে ভালোবাসা, স্বপ্ন আর বিশ্বাস নিয়ে। যারা মনে করো তোমাদের মা-বাবা তোমাদের যথেষ্ট ভালোবাসেন না, তোমরা তাঁদের দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দাও। শর্তহীন ভালোবাসা দাও তাঁদের, যাতে তাঁরা নিজের সন্তানের কাছ থেকেই শিখতে পারেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, দুর্বল কখনো ক্ষমা করতে পারে না। আজ তাই তোমরা শক্ত হও। শৈশবের ক্ষতের যা প্রভাব আজকের জীবনে পড়ছে, তা কাটিয়ে ওঠো।

আজ থেকে শোনা যাক এক নতুন সংগীত। সে সংগীত শিশুদের হাসির। চলো সবাই মিলে সারিয়ে তুলি এই পৃথিবীর যত ক্ষত, বেদনা। সবাই সুখী হও।

ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ:

Web: http://tanbircox.blogspot.com

শাকিরা (পপগায়িকা)

আজ যা অসম্ভব, কাল তা নয়



পপগায়িকা শাকিরার খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে তরুণদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। শুধু সংগীতশিল্পী হিসেবেই নন, গানের সঙ্গে নাচের উপস্থাপন তাঁর খ্যাতি বাড়িয়েছে বহুগুণে। বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১০-এ 'ওয়াকা ওয়াকা' গেয়ে তিনি নতুনভাবে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত এই গায়িকা ১৯৭৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়ার বারানকিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গাওয়া 'হিপস্ ডোন্ট লাই' গানটি একবিংশ শতাব্দীর সফলতম গান হিসেবে বিবেচিত।

২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শাকিরা এই বক্তৃতাটি করেন।

আজকের দিনটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানের। কারণ, আজ আমি তোমাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। আজ এখানে আমি গাইতে আসিনি, আসিনি নাচতে। স্বীকার করছি, আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। নিউটন কিংবা চার্চিলের মতো যোগ্য কেউ আমি নই। নই মাদার তেরেসাও। তার পরও কিছু বলার জন্য আজ এখানে আসা।

শিল্পীরা কল্পনার ওপর বেশি নির্ভরশীল। আমি যখন সংগীতজীবনে পদার্পণ করি, তখন আমি চিন্তা করেছিলাম আমার অতীত জীবন নিয়ে। ভেবেছিলাম আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তোমাদের মনের ভেতরকার চিন্তাই একদিন ধীরে ধীরে চারাগাছের মতো বড় হতে থাকবে। পৃথিবীকে দেবে নতুন একটা রূপ। আমি সাহায্য করতে না পারলেও আগামী ৫০ বছরে পৃথিবী কত দ্রুত সামনে এগোবে, তা আঁচ করতে পারি। কী ঘটবে, আমরা কোন পর্যায়ে যাব, কীভাবে আমরা জীবনধারণ করে বসবাস করব, কী কী চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে আসতে পারে, কীভাবে তা মোকাবিলা করতে হবে—এসব নিয়ে

ভেবেছি।
শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন অপরিহার্য। মনে করো কিছুদিন আগেই একটি ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে আফ্রিকায়। পৃথিবীতে পাওয়া চার মিলিয়ন বছর আগের সবচেয়ে পুরোনো মানুষের ফসিল। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ শিখছে ধীরগতিতে। নিশ্চিতভাবে আগেকার মানুষগুলো তা-ই শিখেছে, যা তাদের জীবনধারণের জন্য লাগত। তাদের এ শিক্ষার কারণেই ধীরে ধীরে পৌঁছানো গেছে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায়। আমরা জেনেছি, তারা কীভাবে হাঁটত, কীভাবে দৌড়াত, কীভাবে নাচত। এখনো আমরা অনেকটা তাই-ই করি। আরও জানা গেছে কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে হয়, কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। বিনিময় করার উপায়গুলো বুঝতে পেরেছি। আমরা জেনেছি বাণিজ্য ও গণিতের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে। শিখেছি কীভাবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার করতে হয়। যন্ত্রপাতি দিয়ে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। ভাষা সম্পর্কে জেনেছি। কীভাবে লিখতে হয় তা জেনেছি।
মধ্যযুগে শিক্ষা সংরক্ষিত ছিল কতিপয় মানুষের মধ্যে। বাকি লোকজন তেমন সৌভাগ্যবান ছিল না। তাদের জীবনযাত্রাই ছিল নিম্ন শ্রেণীর। তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিতে পারত না।
ধীরে ধীরে যুগের সঙ্গে সভ্যতারও পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখন মহাশূন্যে যেতে পারি। আকাশে ভাসতে পারি। পারি পৃথিবীর বাইরে যান পাঠাতে। মহাশূন্যের অচেনা জগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে আমরা চাঁদে যেতে পারি। ওড়াতে পারি চাঁদের বুকে পতাকা। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে পৃথিবীর সব মানুষ দেখতে পারি একটি যন্ত্র দিয়ে। এ আজব যন্ত্রের নাম টেলিভিশন।
সন্দেহ নেই আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি। একজন থেকে আরেকজন জনে জনে অর্জনগুলো এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সবখানে। এটাকেই শিক্ষার গণতন্ত্রায়ন বলে। কিছু মানুষের হাতে যদি শিক্ষা বাক্সবন্দী হয়ে

থাকত, তবে বর্তমান সভ্যতার এ ধাপে আমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না কিছুতেই। আমি বলি না পুরোনো দিনগুলোই খুব ভালো ছিল। ভালো দিন এখনো আছে। ভবিষ্যতেও আসবে। কিন্তু শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করতে হবে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। কথা দিলে কথা রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা এখনো শিক্ষার্থী, শিক্ষাজীবন যাদের এখনো শেষ হয়নি, তাদের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য আরও বাড়াতে হবে। সবচেয়ে ভালো চিন্তাগুলো বিনিময় করতে হবে। দিতে হবে অপরকে উৎসাহ। এর পাশাপাশি সাধারণ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। সন্দেহ নেই, আমরা যদি এসব করতে পারি তবেই আমরা সেরা হব। অবশ্যই হব।

তথ্যপ্রযুক্তিগতভাবে আমরা বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছি। বিগত ১০ বছর বা ২০ বছর বা ৫০ বছর যা করতে পেরেছি, তাকে বিপ্লব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! তোমরা হচ্ছো সেই পরিবর্তনের স্থপতি। কতগুলো সমস্যা আছে, যেগুলো বদলে যায় দিনকে দিন। এদিকে সমান নজর রাখতে হবে। খাপ খাইয়ে চলতে হবে এসবের সঙ্গে। আগামী দিনের সমাজের গঠন কী হবে? আমরা কি পরিবারবদ্ধ হয়ে থাকতে পারব? আমরা কি আমাদের সমাজব্যবস্থা ধরে রাখতে পারব? আমরা কি পারব আগামী দিনে পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে? কোনো কোম্পানি কি পারবে উড়তে পারা যায়, এমন এক জোড়া জুতো তৈরি করতে? যে জুতো নিয়ে আকাশে উড়াল দেওয়া যাবে হ্যারি পটারের মতো। এমন অনেক প্রশ্নই ঘিরে ধরে আমাদের।

সবকিছুই সময় বলে দেবে। আজকে যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কালকে তা অসম্ভব না-ও হতে পারে। আজকে যেটাকে অবাস্তব মনে হচ্ছে, কালকে সেটা পরিণত হতে পারে বাস্তবে। অনেক কিছুই নির্ভর করে তোমাদের কাজের এবং দক্ষতার ওপর। নয় বছর আগে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র অংশ হিসেবে বিশ্বনেতারা একটি বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাঁচ বছর পরই সেই প্রতিজ্ঞা তাঁদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এটা খুবই দুঃখজনক। আজকে অনেক দেশেই শিশুরা নানা রোগে আক্রান্ত। শিক্ষা তো দূরে থাক, তারা ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পায় না। আমাদের প্রয়োজন নতুন পথ খুঁজে বের করা। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। একটি শিশুও যেন উপোস থেকে ঘুমাতে না যায়।

আমি জানি, সব সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা। কীভাবে আমি জানি? কারণ, আমি নিজে দেখেছি। যেখানে আমি জন্মেছি, যেখানে বড় হয়েছি, সেখানে শিক্ষা ছিল অনেকটা অভিজাতদের জন্য। সবার জন্য সব সুযোগ-সুবিধা ছিল না। বাবা-মায়েরা শিশুর জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। তবে সুসংবাদ হলো, সে সময়গুলোকে আমরা অনেকটা অতিক্রম করে এসেছি। যখন আমার বয়স ১৮, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি নিজের খরচে একটা ফাউন্ডেশন করব কলম্বিয়ায়। এ ভাবনা থেকে সেই তখন থেকেই উন্নত শিক্ষা, শিশুদের জন্য পুষ্টিগুণসহ খাবার ব্যবস্থা, তাদের বাবা-মায়ের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং স্কুল নির্মাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ কাজে মোটামুটি সফলও হয়েছি। ঝরে পড়া শিশুর হার অনেকটা কমিয়ে এনেছি।

আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে ছাত্ররা সব সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু সরকারই নয়, সরকারের সঙ্গে ছাত্রদের এবং শিক্ষিত মানুষদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। তবে সবার আগে শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো শিশুই অনাহারী অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না।

তাই আমরা সহযোগিতা চাইছি সবার কাছে। শিগগিরই মসৃণ করতে হবে সামনে চলার পথ। আমাদের নিজেদের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। করতে হবে একে অপরকে সহযোগিতা। মনে করতে হবে একজন মানুষকে নয়, বরং সহযোগিতা করছি পুরো মানবজাতিকে। যদি তা করা সম্ভব হয়, তবে

আজ থেকে ৫০ বছর পরে আমাদের শিশুরা পেছনের দিকে তাকিয়ে বলবে, অনেক দিন আগে মানুষ খাদ্য বিতরণ বা বিনিময় করার যথোপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা করতে পারত না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে পারত না। প্রযুক্তিগতভাবে স্বাবলম্বী ছিল না। জানত না সময়ের সঠিক ব্যবহার। পরবর্তী সময়ে জ্ঞানকে বিশ্বজনীন করতে পেরেছে সবাই। নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলোকে আদান-প্রদান করতে পেরেছে বলেই আজকে আমরা এখানে এসেছি।
সব জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারলেই সফল হয়ে উঠব আমরা। যদি আফগানিস্তানে ৩০ হাজার সেনার বদলে ৩০ হাজার শিক্ষাবিদ পাঠানো যেত, তবে তা মানুষের জন্য মঙ্গলকর হতো। আর এটাই শিক্ষার গণতন্ত্রায়ন। সবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাক শিক্ষা। তবেই মিলবে মুক্তি। পৃথিবী হয়ে উঠবে আরও সুন্দর।
ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ: মোহাম্মাদ আলী।

এ আর রহমান (সংগীত পরিচালক ও গায়ক)

হাসতে শেখো, বাঁচতে শেখো



সংগীত পরিচালক ও গায়ক এ আর রহমানের জন্ম ভারতের চেন্নাইয়ে, ১৯৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি। দুবার অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১২ সালের মে মাসে মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এ বক্তব্য দেন এই তারকা সংগীতজ্ঞ।
আজ থেকে ২৪ বছর আগে কখনো ভাবতে পারিনি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করার আমন্ত্রণ পাব। মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এখানকার শিক্ষার্থীদের সামনে আমার কাজ

সম্পর্কে ধারণা দেওয়া তো দূরের কথা, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়াটাই ছিল অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু আজ আমি মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছি। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ১০ বছরের। এখানকার অনেক শিক্ষার্থী, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও আমার সুরকে তাদের জীবনের অংশ করে নিয়েছে। আমি তাদের দেখে সত্যিই অভিভূত। এখানকার অভিজ্ঞতাই আমাকে ভারতে একটি 'ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল অবজারভেটরি' তৈরি করার সাহস দিয়েছে। আজ এখানে এসে আমার টুকরো টুকরো অনেক কথা মনে পড়ছে।

প্রথমত, ভ্রমণ থেকে শিক্ষা লাভ করা। মনকে সব সময় বলি, পথ চলতে চলতে যা-ই পাওয়া যায়, তাকে উদার চোখে দেখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। কোথাও যাওয়ার আগেই তার সবকিছু নিয়ে আমরা কম-বেশি একটা ধারণা তৈরি করে নিই। কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চিন্তাচেতনা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কোনো একটা স্থানের অনেক অন্তর্নিহিত রহস্য থাকে, যা আমরা সশরীরে, স্বচক্ষে, খোলা মনে পর্যবেক্ষণ না করলে কখনো ধরা দেয় না। এই সত্যগুলোকে জানতে হলে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

দ্বিতীয়ত, কখনো তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া। এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা কোনো মানুষের বেলায় চিন্তা করি। সব গল্পের পেছনেই একটি ভিন্ন গল্প থাকে, যেমন একটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতেই পারে। মানুষের বেলায়ও ঠিক তা-ই। আমাদের সব সময় মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে খুঁজে দেখতে হবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি কোনো স্থান, প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পকলার ব্যাপারেও এই নীতি প্রযোজ্য। আমরা যদি বাইরের দৃশ্যমান রূপটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরে না নিয়ে একটু গভীরভাবে মনের

চোখ দিয়ে দেখতে শিখি, একটু ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা হলে আমার বিশ্বাস আমাদের অর্ধেক সমস্যারই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

তৃতীয়ত, যখন জীবনে কোনো সংকটময় মুহূর্ত আসবে, তখন মনকে শান্ত করে ফেলতে হবে, গতি কমিয়ে আনতে হবে। সংকট সমাধানে যে পদক্ষেপই নাও না কেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে। শুধু একটা কথা মনে রাখবে, কখনো রাতারাতি কোনো পরিবর্তন আশা কোরো না। তোমার পুরস্কার ঠিক সময়েই তোমার হাতে পৌঁছাবে। যদি উপযুক্ত সময়ের আগেই তুমি তোমার সব কাজের মূল্যায়ন পেয়ে যাও, তা হলে সেই মূল্যায়ন আর পুরস্কার একটা সময় তোমার পতনের শুরু করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

চতুর্থত, যারা তোমার চেয়ে কম ভাগ্যবান, জীবন যাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসেনি, সেই দরিদ্রদের জন্য, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সব সময় কিছু করার চেষ্টা করো। তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেয়ো না কিংবা তাদের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করো না। চিন্তা করো, কীভাবে তাদের জীবন আরেকটু সুন্দর করা যায়, কীভাবে তাদের টেনে তোলা যায়। অন্যকে সাহায্য করার জন্য তোমার ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাগুলো আসলে অনেক মহৎ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, সত্য ও সততা—এই গুণগুলোকে অর্জন করা যতটা অসাধ্য বলে মনে করা হয়, তেমনটা মোটেও নয়। তুমি যদি সত্যিই চাও, তা হলে এটা পানির মতোই সহজ ও সরল একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা জীবনের নানা চাহিদা প্রায়ই সততার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ দুটোর মধ্যে একটা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়তো তোমার জীবনের অনেকটা সময়ই পার হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, এই ভারসাম্য এতটাই দরকারি আর মূল্যবান যে এর জন্য আজীবন চেষ্টা করার মধ্যেও কোনো গ্লানি নেই। এই ব্যাপারটিকে ভারতে আমরা বলি, 'সত্যমেভ জয়তে' অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই।

আমি কিছু মানুষকে আজ আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জানাতে চাই, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে যাঁদের অবদান অপরিসীম। আমার বাবা, মা ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক, যিনি আমাকে জীবনের প্রথম বড় সুযোগটি দিয়েছিলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা, সমগ্র ভারতবাসী যারা আমাকে ও আমার সুরকে কোনো দ্বিধা বা বৈষম্য ছাড়াই পরম মমতায় বরণ করে নিয়েছেন। আজ আমি একই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছি হলিউডে এসে, আমি সত্যিই সম্মানিত।

সংগীত কোনো ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতির নয়। সুর সবার জন্য। আমি যখন 'বাখ' শুনতাম, আমি কখনো ভাবিনি, তার জাতি কী, ধর্মই বা কী। সংগীতের বিশুদ্ধতাই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ২৪ বছর ধরে আমি সেই বিশুদ্ধ সুরের জগতে ডুবে আছি। সেই দর্শনগুলোকে বোঝার চেষ্টা করছি, যা সুরের ভাষার জন্ম দিয়েছে।

আজকের এই সমাবর্তন তোমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি নয়, বরং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এ দিনটি একটি নতুন গল্পের শুরু, যা হয়তো তোমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি জানি, তোমরা অত্যন্ত মেধাবী। তবে এই যাত্রায় মেধার চেয়েও একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের অনেক বেশি সহায়তা করবে। আর তা হলো, ঠোঁটের কোণে একটি মধুর হাসি। হাসতে শেখো, বাঁচতে শেখো।

সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সূত্র: ওয়েবসাইট, ইংরেজি থেকে অনুবাদ: অঞ্জলি সরকার

Web: http://tanbircox.blogspot.com

বন জোভি (বিখ্যাত সংগীতশিল্পী)

বিশ্বাস করতে হবে যে সবই সম্ভব



সংগীতশিল্পী জন বন জোভির জন্ম ২ মার্চ ১৯৬২ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে। বন জোভি ২০০১ সালে ১৬ মে মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ভাষণ দেন।

সব গ্র্যাজুয়েটকে অভিনন্দন। এখন পর্যন্ত তোমাদের সবচেয়ে বিশেষ দিনটিতে কিছু বলতে পেরে নিজেকে আসলেই অনেক গর্বিত মনে হচ্ছে। এখানে আসার আগে গত কয়েক সপ্তাহ শুধু এটা নিয়েই ভেবেছি যে আজ কী বললে তোমাদের জীবনের সামনের দিনগুলোর জন্য তা সহায়ক হবে।

এখন আমার মনের মধ্যে অনেক ধরনের আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক আনন্দ ও প্রতীক্ষা যেমন ভয় ও উদ্বেগে রূপ নেয়— প্রথম দিন কিন্ডারগার্টেনে যাওয়া অথবা স্কুল থেকে কলেজে যাওয়ার দিন, ঠিক তেমন। এখন তোমরা সবাই হয়তো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে অথবা পেশাগত জীবন শুরু করবে। কিন্তু তোমাদের শিক্ষাগ্রহণ এখানেই শেষ নয়। মনে করো, তোমার কর্মক্ষেত্রে আরেকটি স্কুল। তাই এ স্কুল থেকে যত পারো শিক্ষা গ্রহণ করো। কোনো পেশাই ছোট নয়, যদি তুমি সেখান থেকে কিছু শিখতে পারো।

হয়তো সংগীতশিল্পে আমি অনেক সার্থক, কিন্তু যখন আমি অভিনয় শুরু করি, তখন অন্য সবার মতো আমারও কাজ খুঁজতে হতো। সংগীতশিল্পী হয়েও আমাকে অনেক দিন অভিনয়ের জন্য অডিশন দিতে হয়েছিল। সত্যি বলতে, অনেক সময় মনে হয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু এ ভয় থেকে অতিক্রম করে কিছু করার ইচ্ছাটা ছিল বেশ। তিন বছর অভিনয় শিখেছিলাম। আর এসবের জন্যই তখন পেয়েছিলাম এক নতুন জীবন। তোমরা

অনেকেই হয়তো ঠিক করে ফেলেছ তোমরা কী করবে, কোন কোম্পানিতে কাজ করবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা তা করেনি। লজ্জার কিছু নেই, তাদের জন্যই বলছি, মনে রেখো, জীবনটা হলো একটি ম্যারাথন; জীবনের এই পথ তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, তুমি যেকোনো সময়ই তোমার সে পথ পরিবর্তন করতে পারবে। তাই জীবনের মানচিত্র তৈরি করবে, কিন্তু তা করবে পেনসিল দিয়ে।

আর হ্যাঁ, ব্যর্থতা নিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, ব্যর্থতা হলো একজন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। কিন্তু তাই বলে কারও উচিত নয় এটাকে ভয় পাওয়া। বরং এটাই তোমাকে শিক্ষা দেবে, শেখাবে নিজের ও অন্যের অনেক কিছু। আমরা সবাই জীবনের অনেক কাজে বিকল হই। কিন্তু তা হতে পরিত্রাণ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে প্রতিবছরই অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েশন করে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই ভালো জায়গা থেকে আসে না। এর মধ্যেও তাদের সফল হওয়ার কারণ হলো সাফল্যের প্রতি তীব্র উদ্দীপনা, প্যাশন। আর তা না হলে আমি আজ সফল হতাম না। আমি নিউইয়র্ক বা লস অ্যাঞ্জেলেসের অধিবাসী ছিলাম না, ছিলাম না কোনো 'রক এন রোল' বংশের অধিকারী। তবু হয়েছি সফল। হয়তো ছিলাম অনেক প্যাশনেট। অবশ্য তার সম্ভাবনাই বেশি। কোনো কিছু করার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা কাজের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি সমীকরণ আছে তিনটি 'পি'-এর: 'প্যাশন + পারসিসটেনস = পসিবিলিটিস' অর্থা ৎ কোনো সাফল্যের সম্ভাবনা হলো সে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনার যোগসূত্রের সমন্বয়। মনে হতেই পারে, কীভাবে বিটলসের মতো এত সুন্দর গানের কথা লিখব, অথবা বিল গেটসের মতো এত মেধাবী অথবা আব্রাহাম লিংকনের মতো এত সাহসী হব? কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হলো বিশ্বাস। আর বিশ্বাস করতে হবে যে সবই সম্ভব। বিশ্বাস করতে হবে ভালোবাসায়, ম্যাজিকে, ধর্মে। বিশ্বাস করতে হবে অন্যের ওপর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের

ওপর। কারণ, তোমাদের মধ্যে অনেকের কাছেই এমন কিছু আছে, যা অন্যের কাছে নেই। তাই গড়ে তোলো নিজকে স্বতন্ত্র, অনন্য করে। জেগে ওঠো, আওয়াজ দাও, অন্যদের তা বোঝাও। আর এটাকেই তোমার শক্তি হিসেবে গড়ে তোলো। সময় নষ্ট কোরো না। সময় নাও, সময়কে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করো। মন দিয়ে সব লক্ষ করো, সব নিয়ে চিন্তা করো। আর এরপর যা করতে ইচ্ছা করবে, তা-ই হবে। কারণ, এখন তোমার মন তাতেই সাড়া দেবে, যা তোমার জন্য ভালো। আর কয়েকটা কথা সংক্ষেপে একসঙ্গে বললে যা হয়:

বড় হও, কিন্তু বৃদ্ধ হোয়ো না।

অলৌকিক ঘটনা প্রতিদিন অনেক হয়। এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করো। দেখবে অলৌকিকতা এরপর তোমার আশপাশেই থাকবে।

যতক্ষণ তুমি জীবিত ততক্ষণ জীবনকে উপভোগ করো।

এবং তোমার মা-বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ো। সবার সামনে আমি আজ তাঁদের ধন্যবাদ জানাব। তাঁদের সাহায্য ও আরও অনেক কিছুর জন্য আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে। তোমরা চেষ্টা কোরো এবং পৃথিবীকে জানিয়ে দাও তোমার মূল্য। আজ এটা তোমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা, তোমরা আজ স্বাধীন। বিজয়ের এ দিন শুভ হোক। এটাই তোমাদের প্রাপ্য আর তাই এটাই তোমরা অর্জন করেছ। ভালো থেকো, গুড লাক।

পামেলা মরগ্যান (কানাডার বিখ্যাত পপ গায়িকা)



পরিশ্রম আনে সাফল্য

কানাডার বিখ্যাত পপ গায়িকা পামেলা মরগ্যান। জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৯৫৭। লোকসংগীতে অবদানের জন্য ২০০৭ সালে কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্য দেন।

কয়েক মাস আগে যখন আমি মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি চিঠি পাই, তখন চিৎকার করে উঠেছিলাম। চিঠিটা পড়ে আমি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলাম যে তার রেশ এখনো আমার মধ্যে রয়ে গেছে। এমন একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মান লাভ করে আমি আজ শিহরিত হচ্ছি।

আমি জানি না 'ডক্টর মরগ্যান' বলে আমাকে সম্বোধন করলে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব কি না!

আমি পৃথিবীর উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে খুব কম জানি। তোমা যারা এই মুহূর্তটির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছ, তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

আমার বাবা রে মরগ্যান সব সময় চাইতেন, আমি যেন মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি খুবই সন্তুষ্ট ও সম্মানিত বোধ করছি তাঁর স্মৃতির কথা বলে। আমি আমার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এখানে আসার জন্য।

আমি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ভ্রমণ করে পার করেছি। কিছু অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। ১৯৭৪ সালে আমি গ্র্যান্ডফল একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি। স্নাতকের পর আমি আমার এলাকার

আধুনিকায়ন নিয়ে ভাবি। আমরা প্রাকৃতিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করে সবজি জন্মাতাম। প্রয়াত প্রখ্যাত বেহালবাদক এমিল বেনইটের একটি স্মৃতি মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ি নতুন করে সাজাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাদের পুরোনো আসবাব নিয়ে সেগুলো অন্য কাজের জন্য উপযোগী করেছিলেন।

পরিবেশের দিক থেকে আমরা এখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন দেশগুলোর একটি। আমাদের এখনো আছে বিশুদ্ধ পানি, রসাল ফল, মাছ, পরিষ্কার বাতাস এবং পশুপাখির জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই আমাদের এই স্বর্গকে আবিষ্কার করছেন এবং এখানে সম্পদ কিনছেন।

আমার বাবা এটা বলতে পছন্দ করতেন যে শীতকাল না থাকলে গ্রীষ্মকাল আসবে না। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। আমাদের এলাকার কৌতুকপ্রিয়তা, গান, রসবোধ সর্বজনবিদিত। আমি বিশ্বাস করি, এই রসবোধ আমাদের মধ্যে থাকবে। আমাদের দরকার মুক্তি, যা কেবল আনন্দদায়ক গানই দিতে পারে।

শিল্প ও শিল্পীদের এই সমাজে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা। আমি প্রায়ই শুনে থাকি যে জনগণ দুর্যোগ থেকে পালাতে যায়। কেননা, তারা কোনো কিছুর বিষয়ে ভাবতে বা মনোযোগ দিতে চায় না, এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমাদের এটার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে যে সমস্যা থেকে পালানো মানে নিজের জন্য নিজের খাঁচা তৈরি করা।

আমাদের নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাবরেডরের অধিবাসীদের রয়েছে গল্প বলার সংস্কৃতি ও দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন। আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সংস্কৃতিকে প্রতিপালন ও সম্মান দেখানো প্রয়োজন। আমাদের কবিতা পাঠ, গান শোনা, নাটক ও চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অপরিচিত শিল্পীর চিত্রশিল্প কেনা, একে

অপরের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের জীবন, আশা, স্বপ্ন, পরিবার ও আমাদের সংস্কৃতি যেন মার্কিন টেলিভিশনের প্রভাবে জড়তাগ্রস্ত না হয়ে যায়।

যেসব স্নাতক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে এসেছ, অনুগ্রহ করে আমার এলাকার স্মৃতি বহন করে নিয়ে যেও। তোমাদের সবাইকে আবারও আমার শুভেচ্ছা রইল। তোমরা কাজের জন্য যে ক্ষেত্রই পছন্দ করো না কেন, সেখানেই সফলতা পাও, এই শুভকামনা রইল। আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমই পারে তোমাকে তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

আর আমি যদি কোনো পরামর্শ দিতে পারি, তা হলো যাও, বিশ্বটাকে দেখো। এটা তোমাকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কিন্তু সব সময় মনে রেখো, এই জায়গায় রয়েছে তোমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের গ্রামকে নতুনভাবে তৈরি করতে এখানে তোমাদের মতো সেরা ও বুদ্ধিমানদের আরও বেশি প্রয়োজন। আমাদের সেসব তরুণ স্বপ্নচারীর দরকার, যারা তুলনামূলকভাবে কম পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করবে, চিকিৎসাসেবা দেবে। নিজের উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করবে। সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসতে হবে তাদের। তারাই তো আগামী দিনের যোদ্ধা।

পল ডেভিড হিউসন বোনো (রকস্টার)

কারণ আমরাই পারি



আমার নাম বোনো। আমি একজন রকস্টার। এত তাড়াতাড়ি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ো না। কারণ, আমার কাছে আরও উচ্ছ্বসিত হওয়ার অনেক চার অক্ষরের শব্দ আছে। তাদের মধ্যে আজ আমি একটি চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করব—পিইএনএন (পেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া)। আমরা অবশ্য আগেও এখানে এসেছিলাম। তখন আমার সঙ্গে ছিল ইউ-টু ব্যান্ড এবং আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। তাই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি

এমন একটি রক অ্যান্ড রোল ব্যান্ডের সঙ্গে গাইছি, যেটি আমার জীবনের সব সমস্যার সময় আমার সঙ্গে ছিল, সমস্যাগুলো যতটা কঠিন আর আমাদের বিপক্ষেই হোক না কেন! এমন একটা সময় ছিল যখন আমি কী পোশাক পরব, সেটা নিয়ে কঠিন দিন পার করতে হয়েছে। জীবনের এমন একটি অভাবের দিনে আমি অর্জন করেছিলাম 'ডক্টর অব ল'। আমার জন্য এটি ছিল অনেক বড় প্রাপ্তি। সেই সম্মান হাতে আমি ভাবছিলাম সেই আইনগুলোর অনুশাসন, যেগুলো হয়তো কোনো দিন আমি ভেঙেছি। আমার মনে পড়ছিল, মানুষের চিন্তাচেতনার মধ্যে, তাদের কথাবার্তা ও কর্মের মধ্যে আমার অনেক অপরাধ ছিল। কিন্তু একটি জিনিস আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে—কোনো এক মনীষী বলেছিলেন, 'আইনের জন্য হয়তো কোনো প্রতিভার প্রয়োজন নেই। কিছুটা সাধারণ জ্ঞান আর ভালো কিছু করার ইচ্ছাই আইনকে প্রতিষ্ঠা করে।'

কলেজ কিংবা কলেজের লাইব্রেরিতে কখনোই আমার জায়গা হয়নি। আমি সব সময় পড়তাম রক অ্যান্ড রোল সংগীত নিয়ে। আমি বড় হয়েছিলাম সত্তরের দশকের ডাবলিন শহরে। সেখানেই সংগীত আমার জন্য নতুন একটি পৃথিবীর পরিচয় করিয়ে দেয়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে আমার দেখা প্রথম কনসার্ট ছিল 'দ্য ক্ল্যাশ' ব্যান্ড। দ্য ক্ল্যাশ তাদের গিটারের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল আজীবন মানুষের সেবা করে যাওয়ার। তাদের অসাধারণ সেই কনসার্টের মধ্য দিয়ে আমি শিখেছি কষ্ট করে কিছু অর্জন করতে।

আমি পড়াশোনায় যতই ভালো অথবা খারাপ হই না কেন, আমি সব সময় চিন্তা করতাম, আমি আমার জীবনে ভিন্ন ধরনের সংগীত করব এবং অন্য মানুষের জীবনে আমি তা করতে পেরেছি এবং যার জন্যই আজ আমি এগিয়ে গিয়েছি এত দূর। সব সময় মনে রেখেছি একটি কথা, যদি কখনো পৃথিবী তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে কী করছ', তখন তোমার জবাব কী হবে? কখনো যদি তোমাকে তা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সেটি হবে একটি ন্যায্য প্রশ্ন। তাই এর সঠিক উত্তরটি এখন থেকে খুঁজে নিয়ো। বর্তমানে পরিবর্তনের ধারা একটুও কম নয়। বড় কল্পনাগুলো এখন অনেক মূল্যবান, যা ছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জাসটিস ব্রেনেন এবং আমার

ধারণা অনুযায়ী, তা আছে জুডিথ রডিনের (সপ্তম প্রেসিডেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া) কাছে। কারণ তাঁরা জানতেন, যদি তুমি সঠিকভাবে কথা বলতে পারো, নিজের চিন্তা-শিক্ষার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারো, তবে তা তোমাকে একদিন সুফল দেবেই। এ জন্যই আমার প্রশ্ন হলো, 'কোথায় তোমাদের সেই মূল্যবান চিন্তাগুলো? কিসের জন্য তুমি তোমার টাকা, মূলধন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি দেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিছু করার জন্য?' যদি কোনো কিছুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়, তবে নিজ বয়সের সঙ্গে তা করো।

প্রতিযুগের এমন কিছু ঘটনা আছে, যা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। হয়তো এখন তুমি পাচ্ছ না, কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েরা পাবে। দাসত্ব, দেশবিভক্তি এসব এমনই কিছু উদাহরণ। এগিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই তাই যুগোপযোগী হতে হবে। ১৯৮৫ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি কনসার্ট হয়। এই কনসার্টের পর আমি ও আমার স্ত্রী অ্যালি ইথিওপিয়াতে যাই। ওখানে আমরা এক মাসের মতো থাকি। একদিন ভোরে একটু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। আমরা সেখানে যে খাওয়ার জায়গায় কাজ করতাম, সেখানে এক লোক আসেন। তিনি আমহারিক ভাষায় কথা বলেন। আমি অনুবাদকের কাছে জানতে পারি, তিনি আমাকে তাঁর ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। কারণ লোকটির সঙ্গে তাঁর ছেলে থাকলে সে নিশ্চিত মারা যাবে। আমি তখন খুব অবাক হই এবং সেখান থেকে চলে আসি। কিন্তু ঘটনাটি পরে কখনো আমি ভুলে যেতে পারিনি। বলা যায়, এর পর থেকে আমি মানবহিতৈষী কাজে আগ্রহী হই। তখন আফ্রিকায় এক বড় সমস্যা ছিল এইডস। প্রায় সাত হাজার আফ্রিকান মারা যেত এর কারণে। যাদের আয় ছিল এক ডলারের কম, তাদের কাছে এ অসুখ হয়ে উঠেছিল জরুরি। আর এ জন্যই অবশ্য আমি সেই ১৯৮৫ সালের কনসার্টটা করি, 'লাইভ এইড', যা তাদের অনুদান দেওয়ার জন্য আয়োজিত হয়।

আসলে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, যার সমাধান আমরা দিতে পারি না, যেমন দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ; কিন্তু আমরা যার সমাধান দিতে পারি, তা আমাদের করা উচিত। ঋণসংক্রান্ত

www.facebook.com/tanbir.ebooks
জটিলতা, অন্যায্য বাণিজ্য—সবকিছুতেই, সব সমস্যাতেই আমরা যা পারি, তা করা আমাদের কর্তব্য। আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যারা দারিদ্র্য ও এই অসুস্থতা এত বেশি দেখছি। আমরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে যদি সবাই এই দারিদ্র্য রোধের জন্য এগিয়ে আসি, তবে আমরা তা বন্ধ করতে সফল হবই। এবং এটাই বাস্তবতা।

বর্তমানে আদর্শবাদের কথা কোথাও বলা হয় না। না রেডিও, না টিভিতে। কৌতূহলী হয়ে কাজ করা, হাসিঠাট্টা বা মজা করা—সবই আমি করি। তবু বলি, এই আদর্শবাদই রোধ করতে পারে স্বার্থপরতা অথবা অন্য সব খারাপ কিছু। আমি এটা বলি না, তোমরা আদর্শবাদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পুলিশ হও। কিন্তু তোমরা আমেরিকানিজমের জন্য করো। কারণ এটিই বর্ণনা করবে তোমাদের সম্পর্কে।

সব সময় সাফল্যের গান গাও। মনে রেখো, ভালো কিছু করার জন্য কাউকে কোনো অজুহাত বা কৈফিয়ত দিতে হয় না। যখন তুমি জানো, তোমার ভবিষ্যৎ স্থির ও অটুট, তখন তা-ই করো। কিন্তু সব সময় তোমার ভবিষ্যৎ স্থির থাকে না, তা সব সময়ই ভাসমান এবং তখন তুমি নিজে তা শক্তভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করো। মূলত এ পৃথিবীটিকে যা তুমি মনে করো তার চেয়ে অনেক বেশি নমনীয়। তোমার শুধু একটা হাতুড়ি প্রয়োজন, যা দিয়ে তুমি তার গঠন ঠিক করতে পারো। এই ভোঁতা অস্ত্রই পারবে তোমাকে সাহায্য করতে। তাই এগিয়ে যাও এবং নিজের জন্য কিছু তৈরি করো। মনে রেখো, জন অ্যাডামস বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন, 'সে আমাদের কাছে অনেক বেশি অস্থির মনে হলেও সাহসী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করত না।'

এবং তাই এই সময়টি হলো সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার। এটি সেই দেশ, এটি তোমাদের প্রজন্ম। এগিয়ে যাও। ধন্যবাদ।

সূত্র: ওয়েবসাইট

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: নাজমুস সাকিব

Web: http://tanbircox.blogspot.com

শচীন টেন্ডুলকার(সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার)

যেভাবে বেড়ে উঠি



শচীন টেন্ডুলকার। সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। ১৯৮৯ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। জন্ম ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল। টেস্টে ৫১টি সেঞ্চুরিসহ ১৪ হাজার ৬৯২ রান এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে ৪৬টি সেঞ্চুরিসহ ১৭ হাজার ৬৫৭ রানের মালিক তিনি। বর্তমান বিশ্বকাপ নিয়ে শচীন খেলছেন পঞ্চম বিশ্বকাপ।

আমার স্পষ্টভাবেই মনে পড়ছে। আমার বয়স তখন সবে সাত বছর, জীবনের প্রথম ক্রিকেট ব্যাটটা হাতে পেলাম এবং তখন থেকেই আমার ক্রিকেট-জীবন শুরু। আমার বড় বোন আমাকে ওই ব্যাটটা উপহার দিয়েছিলেন কাশ্মীর ভ্রমণ থেকে ফিরে। ব্যাটটি ছিল কাশ্মীরের উইলো কাঠ দিয়ে তৈরি। সেটা যে খুব আহামরি কিছু ছিল তা নয়, তবে আমার কাছে সেটা ছিল সোনার চেয়ে দামি। আমি স্বপ্ন দেখতাম ভারতীয় দলে খেলব, চার-ছয় হাঁকাব, দর্শকেরা আনন্দে আত্মহারা হবে। টেনিস বল ছেড়ে শক্ত ক্রিকেট বল দিয়ে খেলা শুরুর সময় ওই ব্যাটটা ভেঙে যায়। ব্যাটটা না ভাঙা পর্যন্ত আমি ওটা দিয়েই খেলতাম।

মুম্বাই শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক অ্যাপার্টমেন্টে আমার বেড়ে ওঠা। মধ্যবিত্তদের জন্য চমৎ কার এক জায়গা ছিল সেটা। আমরা তিন ভাই ও এক বোন। চারজনের মধ্যে অবশ্য আমিই ছিলাম সবার ছোট। আমাদের বাসার সামনে এক টুকরো সবুজ মাঠ ছিল, যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে অবসরে আমি খেলাধুলা করে সময় কাটাতাম। সকাল-বিকেল সব সময়ই খেলা নিয়ে মেতে থাকতাম। সব খেলাই খেলতাম—ফুটবল, ভলিবল, হকি এবং অবশ্যই ক্রিকেট। আমি উচ্চতায় খাটো ছিলাম বলে আপনাআপনিই ব্যাটিং করার সুযোগ মিলত। কারণ, যারা দীর্ঘদেহী তাদের পছন্দ ছিল বোলিং। আর আমার মতো যারা খর্বাকৃতির ছিল, তাদের ব্যাটিং ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ক্রিকেটের প্রতিই যে আমার একমাত্র অনুরাগ ছিল তা নয়, আমি অনেক দিন টেনিস খেলেছি এবং আমি মোটামুটি ভালোই খেলতাম। জন ম্যাকেনরো ছিলেন আমার প্রিয় টেনিস খেলোয়াড়। আমি তাঁর মহাভক্ত ছিলাম। আমার পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুরা সবাই বিয়ন বোর্গকে সমর্থন করত। বিপরীতে আমিই ছিলাম জন ম্যাকেনরোর একমাত্র সমর্থক। জন ম্যাকেনরোর স্টাইল অনুসরণ করতাম বলে সবাই আমাকে 'ম্যাক' বলে ডাকত। আমি লম্বা চুল রেখেছিলাম এবং ম্যাকের মতো হেডব্যান্ড কিনে দিতে বাবাকে বাধ্য করেছিলাম। আমার সে সময়ের ছবি দেখলে আমাকে কেউ চিনতেই পারবে না! তা ছাড়া আমি ছিলাম ভয়ানক দুষ্ট-প্রকৃতির। আমাকে দেখভাল করা ছিল ভয়ংকর কঠিন এক কাজ। আমি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের গাছগুলোয় বেয়ে বেয়ে উঠতাম এবং আম-পেয়ারা সাবাড় করে নিয়ে আসতাম। ফলের গাছগুলো সবার বিশেষ নজরদারিতে থাকত। তাই এ জন্য আমি সন্ধ্যাবেলাটিকে বেছে নিতাম। কারণ, এ সময় সবাই ঘরে বসে টিভি দেখায় ব্যস্ত থাকত। আমাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন বুয়া রাখা হয়েছিল। আমি মোটেও ঘরে ফিরতে চাইতাম না, আমার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতেই তার ২৪ ঘণ্টা চলে যেত।

কৈশোরে আমি যখন বেশি করে ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম, বলা চলে তখনই আমি ক্রিকেটে থিতু হলাম। সে সময় আমার শরীরের সবটুকু ক্যালরি পোড়াতাম ক্রিকেট পিচে এবং সেখানেই আমার প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ধন্যবাদ দিতে হয় আমার ভাই অজিতকে। খেলায় আসার পথে সে-ই আমাকে চালিত করেছে। বন্ধুদের সঙ্গে যখন আমি নিচতলায় খেলতাম, তখন সে ওপর থেকে আমার খেলা দেখত, আমাকে বুঝতে দিত না। আমার ব্যাট করার কৌশল, বল পেটানোর ধরন আর আমার ধারাবাহিকতা দেখে তার বদ্ধমূল ধারণা হয় যে আমি ভালো ব্যাট করতে পারি। অজিত আমার থেকে বছর দশেকের বড়। তিনিও অল্পবিস্তর ক্রিকেট খেলেছেন। তিনি আমাকে বলতেন, পেশাদার ক্রিকেটই হতে পারে আমার গন্তব্য। আমার খেলার স্বার্থে স্কুল বদলের জন্য তিনি বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন।

আমার বাবা লোকান্তরিত হন ১৯৯৯ সালে। একটি

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks
স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মারাঠি ভাষা শেখাতেন, যা আমার মাতৃভাষা। তিনি ক্রিকেটপ্রেমী ছিলেন না, তিনি ছিলেন লেখক ও কবি। কিন্তু তিনি ঠিকই জানতেন কীভাবে আমার সেরাটা আদায় করা যাবে। তিনি আমাকে সব সময় উৎ সাহ দিতেন এবং মাকে বলতেন, আমার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি কখনোই তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি।

ভাসা ভাসা কোনো কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সতর্ক করতেন এবং সাফল্য-ব্যর্থতা সব সময়েই মনোযোগ দিয়ে খেলতে বলতেন। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কিংবা ক্রিকেট—এর যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সময় এল, তখন বাবা বললেন, 'তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো। এটিই তোমার প্রথম ভালোবাসা। তাই তুমি সে পথেই যাও।'

সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে যখন জাতীয় দলে আমার যাত্রা শুরু হলো, তখন বাবা-মা দারুণ খুশি হয়েছিলেন। শুরুতে তাঁরা অবশ্য কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্তও ছিলেন। ভারতে ক্রিকেট অনেকটা ধর্ম সমপর্যায়ের। তাই তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এই বয়সে আমি প্রত্যাশা ও চাপ মোকাবিলা করতে পারব কি না? তখন কোনো কোনো খেলোয়াড়ের বয়স ছিল আমার দ্বিগুণ। বছরের বেশির ভাগ সময় আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হতো। পরে অবশ্য সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।

ক্রিকেট আমার কাছে প্রিয়তম এবং বিশেষ কিছু। এটি আমার কাছে গাড়ি-বাড়ি কিংবা ধনসম্পদ উপার্জনের বিষয় নয়। মা-বাবা আমাকে শিখিয়েছেন, সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থলিপ্সা বা জাগতিক লোভ-লালসা মানুষকে সব সময় নিচে নামায়। সে সময় আমার একটাই স্বপ্ন ছিল: ভারতীয় দলের ক্যাপ আর জার্সি পরে জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলব। শৈশবের সেই স্বপ্ন আমার পূর্ণ হয়েছে।

সানডে টাইমস (২০০৬) থেকে পাওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর: ফিরোজ জামান চৌধুরী

Web: http://tanbircox.blogspot.com

সৌরভ গাঙ্গুলী (বিখ্যাত ক্রিকেটার)

লোকের কথায় কান দিয়ো না



আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে, আমি সেই কাজগুলোই করি, যা আমি করতে চাই। যা করতে পারলে আমার সত্যি ভালো লাগবে, আমি তেমন কিছু করার চেষ্টা করি। একটা চ্যাম্পিয়নশিপ বা বড় কোনো সাফল্য হঠাৎ এসে ধরা দেয় না। খেলার আগে তুমি কী করছ, খেলার এক মাস আগে তুমি কীভাবে প্র্যাকটিস করেছ, আগের করা সেই কাজগুলোই ঠিক করে দেয় তুমি সফল হবে, কি হবে না। লোকে তোমাকে নিয়ে কী ভাবল আর কী বলল, সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমার নিজের কাছে তুমি কেমন, সেটিই আসল কথা। লোকের সব কথায় কান দিতে গেলে জীবন বিষিয়ে উঠতে পারে।আমি যখন দল থেকে বাদ পড়েছিলাম, তখন ফিরে আসার একমাত্র উপায় ছিল ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করা। কাজটা মোটেও সহজ ছিল না, অন্তত ১১ বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা আর ছয় বছর ধরে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়া কারও জন্য তো নয়ই! কিন্তু সেই কঠিন সময়টাতে আমি নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, নিজেই নিজেকে সাহস দিতাম।এর আগের ১১ বছর ধরে কখনো এতটা সময়ের জন্য কলকাতায় থাকতে পারিনি, নিজের জন্য সময় বের করতে পারিনি। একটা সিরিজও মিস করিনি ১১ বছরে, এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছি সব সময়। এ যেন এক দীর্ঘ যাত্রা—এক মাঠ থেকে অন্য মাঠ, একের পর এক হোটেল, এয়ারপোর্ট। বাইরে থেকে খেলাকে যত সহজ মনে হয়, আসলে তা নয়। যখন সাত-আট মাসের জন্য দলের বাইরে চলে যেতে হলো, সোজা ঘরে ফিরে এলাম। আমার পরিবারকে সময় দিলাম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটালাম। নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে শুরু করলাম। একটানা ১১ বছর ধরে একই ভাবে খেলে গেলে ক্লান্তি আসাটা বিচিত্র কিছু নয়। তাই আমি নতুন ভাবে, নতুন রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করলাম।সেই কঠিন সময়ে আমি বিশেষ কোনো পরিকল্পনা বা প্রার্থনা কিছুই করিনি। সময় খুবই

www.facebook.com/tanbir.ebooks
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তখন। আমার নিজেকে নিজেই টেনে তুলতে হয়েছিল, সব সময় গভীর বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর। আমি জানতাম আমি পারব, পারতে আমাকে হবেই। সেই দুঃসময়ে নিজেকে যেভাবে সামাল দিয়েছিলাম, তাতে নিজেকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। আমি জানতাম যে আমার সামনে পথ খোলা ছিল ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। সত্যি কথা বলতে কি, হাল ছেড়ে দিয়ে সরে আসাটা সহজ। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকা, চেষ্টা করে যাওয়া, আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা—এসব অসম্ভব কঠিন। আমি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে ভালোবাসি। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ভালোই খেলছি। আমি জানতাম, আমাকে একবার সুযোগ দেওয়া হলে আমি দেখিয়ে দিতে পারব, আমার গভীর বিশ্বাস ছিল সে সুযোগ আমি পাব। শেষপর্যন্ত আমি তা পেয়েছিলাম। আমি খেলার সময় একটা করে বলের ওপর মনঃসংযোগ করতাম। সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরি, দলে সুযোগ পাওয়া না-পাওয়ার দুশ্চিন্তা—এসব কখন মনের ধারে-কাছেও ভিড়তে দিইনি খেলার সময়। এসব মনে আসাটাই স্বাভাবিক, মানুষের মন তো! কিন্তু যখনই এসব চিন্তা মাথায় ভিড় করবে, তখনই তা খেলায় প্রভাব ফেলবে। ব্যাটিং করার সময় যদি দলে ডাক পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে চিন্তা করা শুরু করো, তাহলে কখনো তুমি রান পাবে না। তাই আমার লক্ষ্য ছিল শুধু বর্তমান নিয়ে ভাবা, একটি বলের ওপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়া। কাজের সঙ্গে এভাবে মিশে যাওয়াটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। আমি সফল হতে গিয়ে অন্যকে আঘাত করব না, নিজেকেও যথাসম্ভব রক্ষা করে চলব, এটাই আমার জীবনের নীতি। আমি বিশ্বাস করি যে যা করতে চায়, তাকে তা-ই করতে দেওয়া উচিত। আমি অন্যকে তার কাজ করতে দেব, নিজেও নিজের কাজ করব এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা করব—এমনটিই হওয়া উচিত। আমি যেমন কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই না, কেউ আমার পথে বাধা সৃষ্টি করুক সেটাও আমি পছন্দ করি না। সবার নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং সবার অধিকার বজায় রাখার জন্যই পরস্পরের প্রতি সম্মান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

দেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রায়ান লারা(ক্রিকেটার)

শিক্ষা নিতে হয় ভুল থেকে



ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা জন্মগ্রহণ করেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগোতে, ১৯৬৯ সালের ২ মে। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫০১ রান ও টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪০০ রানের মালিক লারা।

আমার ধারণা, টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের কারণেই খেলায় তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্য। এর মাধ্যমে দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ক্রিকেটের কদর বেড়েছে আগের থেকে অনেকখানি। এখন পৃষ্ঠপোষকরা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেন। এই পৃষ্ঠপোষকরা কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এত আগ্রহী না। এত জৌলুশ, এত আলোকচ্ছটার পরেও টেস্ট ক্রিকেটই এখনো সেই আগের মতোই উঁচু শিখরে অসীন। আমি নিজেকে একজন টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে দেখতেই পছন্দ করি।

আমি ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছি টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছায়। অস্ট্রেলিয়ায় যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে যেত তখন আমাদের ওখানে গভীর রাত হয়ে যেত। আমি রাত জেগে জেগে রেডিওতে খেলার ধারাভাষ্য শুনতাম। বাবা যখন দেখতে আসতেন আমি ও আমার ভাই ঘুমিয়েছি কি না, তখন আমি রেডিও লুকিয়ে নাক ডাকার ভান করতাম।

টি-২০ খেলার বেশ কিছু ভালো দিক আছে। এর মাধ্যমে ক্রিকেটাররা ছয় সপ্তাহে তিন কোটি ডলারা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। ক্রিকেটের মহারথীদের একজন ভিভ রিচার্ডস। তিনি ২০ বছর ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই তিন কোটি ডলার উপার্জন করতে পারেননি। আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেট ও টি-২০ একসঙ্গে চলতে পারে। আমরা খেলার সৌন্দর্য

www.facebook.com/tanbir.ebooks
নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। কিন্তু এখন অনেকে আছে, যারা ক্রিকেট খেলা কী তা জানে না। যারা কখনোই ক্রিকেট খেলা দেখেনি, তাদের জন্য টি-২০ বেশ উপভোগের। যারা আগে টেস্ট ক্রিকেট দেখত, এখনো তারা টেস্ট খেলা উপভোগ করে। টি-২০ নতুন ধরনের দর্শক তৈরি করেছে। আমি যদি আগামীকাল সকালে উঠে দেখি টেস্ট ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে আমি ভীষণ কষ্ট পাব।

আমার ব্যাটিং স্টাইল কখনোই নির্ভুল নয়। আমারও খুঁত আছে। জীবনে অনেকবার আমি টের পেয়েছি আমার ব্যাটিংয়ে খুঁত আছে। কিন্তু আমার বড় একটি সুবিধা আছে। আমি খুব দ্রুতই আমার ভুলগুলো শুধরে নিতে পারি। যে মৌসুমে ক্রিকেট খেলা থাকত না সেই মৌসুমে আমার ভুল শোধরানোর জন্য মাঠে সারাক্ষণ পড়ে থাকতাম। আমি ২২ গজের পিচকে বাড়ি বানিয়ে ফেলতাম। আমি স্পিন বলে বেশ ভালো খেলি। কারণ, ত্রিনিদাদে ছোটবেলা থেকেই আমি স্পিন বল খেলতাম বেশি। আমাদের ওখানে ব্রিটিশ আমলে ভারত থেকে অনেক মানুষ অভিবাসিত হয়, যার কারণে ভারতীয়দের মতো ত্রিনিদাদের লোকজন স্পিন বোলিংয়ে ভালো করে। কিন্তু বারবাডোজ, জ্যামাইকার লোকজন দ্রুতগতির ফাস্ট বোলিং করতে অভ্যস্ত ছিল। আমি ওখানেও মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমার দেখা সেরা ফাস্ট বোলার ছিল ওয়াসিম আকরাম আর স্পিনে শেন ওয়ার্ন। মুরালিও বেশ ভালো বোলিং করে। আমাকে শেন ওয়ার্ন ও মুরালির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বললে আমি ওয়ার্নকেই বেছে নেব। মুরালির থেকে ওয়ার্নি বেশ স্থিরভাবে বোলিং করত। ফাস্ট বোলার হিসেবে ওয়াসিম আকরাম ছিল দুর্ধর্ষ। আমার ১৯৯২ সালের কথা মনে আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের খেলার কিছুদিন আগে আমাকে জানানো হয় আমি ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করব। কিন্তু আমি তো সচরাচর ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করি না। আমাকে কেউ কিছুই জানায়নি। আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। বল নিয়ে সুইং করতে পারাটা যে কত খানি ভয়ংকর হতে পারে তা আকরাম জানত।

Web: http://tanbircox.blogspot.com

গর্ডন গ্রিনিজ আমাকে ফাস্ট বোলার মোকাবিলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আকরামের মতো ফাস্ট বোলারকে মোকাবিলা করার জন্য বোলিং প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকাটাই নিরাপদ। সে জন্য আমি প্রথম বলেই এক রান নিয়ে বোলিং প্রান্তে চলে যাই। কিন্তু ছক পাল্টে যায়, যখন গর্ডন গ্রিনিজ নিজেই এক রান নিয়ে আমাকে পুনরায় ব্যাটিংয়ে পাঠান। সেই ওভার যে কীভাবে শেষ হয়েছিল আমার মনে নেই। আমি ওভার শেষে গর্ডনকে ধরলাম, কেন আমাকে সে বিপদে ফেলল। গর্ডনের নীরস উত্তর ছিল, 'আমি যা বলি সেটা আমাকে শুনতেই হবে, এমন কোনো কারণ কি আছে?' আমি প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম, 'বেঁচে ফিরতে পারলে আমি আর জীবনেও ওপেনিং করব না।' আমার আরেকটি ঘটনা সব সময় মনে পড়ে। ক্রিকেটার ম্যালকম মার্শাল ক্রিকেটের অন্যতম সেরাদের একজন। ১৯৯১ সালে স্থানীয় এক ক্রিকেট ম্যাচে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বোধ হয় সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম। তিনি যখন বোলিং করতে আসেন, আমি তাঁর বলে একটি ছক্কা হাঁকাই। ম্যালকম শুধু আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখে আমি স্পষ্ট লেখা দেখেছিলাম, আমার শেষ তিনি দেখেই ছাড়বেন। বছর খানেক পরে তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় এক ক্রিকেট ম্যাচে। সে ম্যাচে তিনি আমাকে আমার শেষ একটু হলেও দেখিয়ে ছেড়েছিলেন। ভাগ্যিস আমি হেলমেট পরেছিলাম। নইলে তাঁর বল কখন আমার মাথা ছাতু করে দিয়ে চলে যেত। দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষায় আমি কখনোই বসে থাকি না। তার ওপর, আমাদের জীবন কোনো নাট্যমঞ্চ নয় যে এখানে মহড়ার সুযোগ আছে। আমাকেই আমার জীবন নিয়ে বাঁচতে হবে। আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে সেই আগের মতো ধার নেই। আমার মতে, এই সমস্যার মূল কারণ হলো আমাদের ক্রিকেট প্রশাসন। আমাদের ক্রিকেটারদের প্রশাসন তেমন সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের তুলনায় আমাদের ক্রিকেটাররা বঞ্চিত। ১৯৯৬ সালে যখন

www.facebook.com/tanbir.ebooks
শিবনারায়ণ চন্দরপল ক্রিকেট জগতে পা রাখে, তখন তার আর রিকি পন্টিংয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। দুজনেই ভালো ক্রিকেটার। কিন্তু শিব পন্টিংয়ের মতো উন্নত সুযোগের অভাবে সেরা ক্রিকেটারদের দলে নাম লেখাতে পারেনি। আমার মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজেই বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী ক্রিকেটাররা খেলে। কিন্তু অন্য দেশ যেখানে সাধারণ ক্রিকেটারদের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তোলে, আমরা সেখানে সেরা ক্রিকেটারদের সাধারণ মানে নামিয়ে দিই। ১৯৮৯ সালে আমি যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় দলে ক্রিকেট খেলা শুরু করি, তখন আমি ছিলাম ১৯ বছরের তরুণ। আমি আমার চোখে নায়ক ক্রিকেটার ভিভ রিচার্ডস, গ্রিনিজদের সঙ্গে খেলার সুযোগে ছিলাম অভিভূত। আমি চিন্তা করেছিলাম, তাঁরা আমার কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দেবেন। কিন্তু বাস্তবে আমি তাঁদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাইনি। কারণ, এই ক্রিকেটাররা তখন ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ পর্বে ছিলেন। নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছিলেন।

আমাকে সবাই আমার সেরা ইনিংসটির কথা জিজ্ঞেস করে। আমার সেরা ইনিংসটি খেলেছিলাম জ্যামাইকার কিংস্টনে। সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দলের অবস্থা তেমন সুবিধার ছিল না। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমরা ২-২-এ টেস্ট সিরিজ ড্র করি। আমি একটি দ্বিশতক ও তিনটি শতকের মাধ্যমে ৫৪৬ রান করেছিলাম সেবার। কিংস্টনে আমি ২১৩ রান করেছিলাম। আমার সব সময়ের চেষ্টা ছিল ধারাবাহিকভাবে খেলে যাওয়া। আমি সব সময়ই চেষ্টা করতাম আমার দল যেন আমার ওপর ভরসা রাখতে পারে। আমি সবকিছুতে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যাই। আমিও মাঝে মাঝে ভীষণ বড় আকারের ভুল করে থাকি। কিন্তু ভুলগুলোকে অবহেলা করা চলবে না। আমি সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিই।

৭ নভেম্বর ২০১১ সালে
থার্ডম্যান ক্রিকেটকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে লিখেছেন জাহিদ হোসাইন খান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

কুমার সাঙ্গাকারা (ক্রিকেটার)

ক্রিকেট আমাদের ঐক্য

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারার জন্ম ১৯৭৭ সালের ২৭ অক্টোবর। সম্প্রতি ঘোষিত (১৫ সেপ্টেম্বর) আইসিসি নির্বাচিত ২০১১-১২ মৌসুমের ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার ও টেস্ট ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার তিনি। ২০১১ সালের ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের লর্ডসে তিনি এ বক্তব্য দেন।

আমি ধন্যবাদ জানাই মেলবোর্ন ক্রিকেট কাউন্সিলকে। প্রথম শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার হিসেবে 'স্পিরিট অব ক্রিকেট' শীর্ষক বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে শুধু আমি একাই সম্মানিত নই, এর মাধ্যমে আমার পুরো দেশ সম্মানিত।
আমি আপনাদের আজকে ভিন্ন একটা গল্প শোনাব। আমার দেশের খেলার কথা, ক্রিকেটের কথা। শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেট শুধু একটি খেলা নয়, ক্রিকেট দিয়েই সমগ্র শ্রীলঙ্কা আজ এক বন্ধনে আবদ্ধ।
আমাদের সমাজে ক্রিকেটের অবস্থানের জন্য ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। মাঠের ভেতরে যেমন আমাদের দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি বাইরের জগতেও। ২০০৫ সালের সুনামির সময় আমাদের জীবনব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা জাতীয় দল নিয়ে অবস্থান করছিলাম নিউজিল্যান্ডে। ড্রেসিংরুমে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। সুনামির তীব্রতা আমাদের বাক্রুদ্ধ করে দিয়েছিল। খবরের ছবি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগছিল। বাস্তবে কি এটা সম্ভব? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ৩১ ডিসেম্বর যখন দেশে ফিরলাম, তখন একটা অস্বাভাবিক কলম্বো দেখলাম। অন্য সময় আমাদের কারণে বিমানবন্দরে উৎসবের আমেজ দেখা দিত, হাসি-আনন্দে ভরে উঠত চারপাশ; কিন্তু সেদিন শহরটা ছিল জনশূন্য, অন্ধকার ও বিষণ্ন।
আমরা ক্রিকেটাররা সেনাবাহিনী ও তামিল টাইগারদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় যাই। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা থাকলেও সেই বিপদে সবাই ছিল

একসঙ্গে। মহাবিপদে সবাই ছিল ধৈর্যশীল, সবাই ছিল ঐকবদ্ধ। সেই দুর্দশাতেও প্রিয় ক্রিকেটারদের দেখে বিপদগ্রস্ত মানুষের মুখেও দেখা দিয়েছিল হাসির রেখা। নিঃস্ব মানুষের চোখে সেদিন আমরা আনন্দাশ্রু দেখেছিলাম। সবাই একসঙ্গে সেই বিপদ মোকাবিলা করেছিলাম। ধৈর্য, সাহস ও শক্তি দিয়ে এক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের খেলার মাঠেও আমরা তা-ই করি। পুরো শক্তি দিয়ে মাঠে মনোনিবেশ করি। হেরে গেলেও একসঙ্গে থাকি, সুনামির মতো বিপদেও এক হয়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়াই। দেশের মানুষ আমাকে যে সম্মান দেয়, খেলার মাঠে আমিও সেই সম্মান ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি। আমাকে যারা সম্মান দেয়, তাদের আমি ব্যাটে-বলে সম্মান ফিরিয়ে দিই।

ক্রিকেট আমাদের কাছে আরাধ্য, পবিত্র ও পূজনীয়। আমাদের বৌদ্ধভিক্ষুরা পর্যন্ত ক্রিকেট খেলে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে ক্রিকেট। আমাদের দেশে খেলার সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি সরাসরি জড়িত। হাসি-কান্না, আতিথেয়তা, গান-বাজনা—সবকিছুই যুক্ত আমাদের খেলার সঙ্গে। আমাদের সামাজিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে একটি মাত্র খেলা, যার নাম ক্রিকেট। আমাদের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রে ক্রিকেটের গুরুত্ব অনেক। ভবিষ্যৎ নির্মাণে ক্রিকেট একটি মাধ্যম। শ্রীলঙ্কার অন্ধকার সময় দূর করতে ক্রিকেটের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গৃহযুদ্ধের বাজে সময়গুলোয় দেশের অবস্থা খারাপ হলেও ক্রিকেট দলের সাফল্যে সবাই এক হয়ে যেত। ক্রিকেট আমাদের ঐক্য। ক্রিকেটের কারণেই যুদ্ধের তীব্রতা কমে আসত দেশে। আমরা সৌভাগ্যবান যে দেশে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমাদের সন্তানেরা এখন যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই মুক্তভাবে বেড়ে উঠবে। ক্রিকেটে মিশে আছে আমাদের আনন্দ-বেদনা। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই ক্রিকেটের সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যবর্ধনে আমাকে সাধারণ মালী হয়ে কঠিন কাজ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করে আমরা খেলি দেশপ্রেম থেকেই। খেলার মাঠে ভদ্র আচরণ

করি যেন সবাই ভাবে, আমরা লঙ্কানরা এ রকমই মার্জিত ও ভদ্র। দুই কোটির কিছু বেশি মানুষের বাস আমাদের ছোট্ট দেশে। এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্না। নানা বর্ণ-গোত্রের লোকজন ক্রিকেটকে কেন্দ্র করেই এক হয়ে যায়। তারাই আমাদের শক্তি ও প্রেরণার ভিত্তি; আমরা ক্রিকেট খেলি সেসব মুখের জন্য। তারাই আমাদের মাঠের প্রেরণা। তাদের জন্য আমি একজনই একসঙ্গে তামিল, সিংহলি, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান হয়ে যাই। আমি সবার, সবাই আমার। সবার ওপরে আমি, সব সময়ের জন্য একজন লঙ্কান হিসেবে গর্বিত।

সূত্র: লন্ডনের দ্য টেলিগ্রাফ

ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর: জাহিদ হোসাইন খান

মাইকেল ফেল্পস (সাঁতারু)

লক্ষ্য ঠিক করে এগিয়ে যাও



সাঁতারের বিস্ময় মাইকেল ফেল্পস ১৮টি স্বর্ণপদকসহ ২২টি অলিম্পিক পদক জয় করে সর্বকালের রেকর্ড গড়েছেন। এথেন্স অলিম্পিকে ছয়টি, বেইজিং অলিম্পিকে আটটি, আর এবারের লন্ডন অলিম্পিকে জিতেছেন চারটি স্বর্ণপদক।

মাইকেল ফ্রেড ফেল্পেসর জন্ম ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন যুক্তরাষ্ট্রে।

ছোটবেলা থেকে কোনো কিছুকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মনেপ্রাণে ধারণ করলে তা একদিন বাস্তব হবেই। আমার বড় দুই বোনের কারণে অনেক ছোটবেলায় আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আমার মা আমাদের পুলে ফেলে দিতেন। সেটা সাঁতারু হওয়ার জন্য ছিল না, ছিল জীবনের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তার জন্য শেখা সাঁতারকে অজান্তেই পছন্দ করে ফেলি

একসময়। মা আর বোনদের উৎসাহেই আমি মাত্র সাত বছর বয়সে সাঁতারু জীবন শুরু করি। আমার বয়স যখন ১১ বছর, তখন আমার কোচ বব বাউম্যান আমাকে বলেন, পরিশ্রম করলেই আমি অলিম্পিক গেমসে সাঁতারে অংশ নিতে পারব। কোচের কথামতো প্রশিক্ষণ আর পরিশ্রম করা শুরু করি। ২০০০ সালে সিডনি অলিম্পিকে আমি সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে মার্কিন সাঁতারু দলে যোগ দিই। কিন্তু সেবার আমি প্রচণ্ড হতাশ হই। কারন আমি আমার প্রথম অলিম্পিকের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে পঞ্চম স্থান অধিকার করি। হতাশার পরে আমি আমার লক্ষ্য নতুন করে তৈরি করি। আমি অলিম্পিকের সাঁতারের আট ইভেন্টেই স্বর্ণ জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আগের থেকে বেশি পরিশ্রম আর সাঁতারে মনোযোগ দিতে থাকি। অলিম্পিকে সাঁতারের সবগুলো স্বর্ণ অর্জন হয়ে ওঠে আমার নতুন লক্ষ্য। যার ফলে ২০০১ সালে ১৫ বছর বয়সে ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে এক মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের কম সময়ে (১:৫৪.৯২ সে) অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করি। প্রচণ্ড আগ্রহে আমি পুলে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকি। ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে আমি ছয়টি স্বর্ণপদকও লাভ করে ফেলি। কিন্তু তার পরও আমি ভীষণ হতাশ হই। কারণ সাঁতারের ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ও চারজনের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলে সাঁতারের হিট রাউন্ডেই ফলাফল খারাপ করি। ফ্রি-স্টাইলের বাছাইপর্বে আমি পঞ্চম হয়ে ফাইনালে অংশ নিই। আবার চারজনের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রিলেতে তৃতীয় দল হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে অংশ নিই। ব্যর্থতার কারণে আমি কোচের কাছে হতাশা প্রকাশ করি। পরের দুটি ইভেন্টে অংশ নিতে অনিচ্ছা জানাই। কোচের নির্দেশ আর উৎসাহে আমি অংশ নিতে রাজি হই। হতাশার মধ্যে আমি আরও দুটি ব্রোঞ্জপদক দিয়েই সেবারের অলিম্পিক শেষ করি। এ রকম দুঃসময় আমার জীবনে অনেকবারই এসেছে। আমার সাঁতার ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেছে। তখন আমার মা আমাকে প্রায়ই একটা কথা জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আমার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত

নিচ্ছি কি না?' আমি চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারি, এটা আমার জন্য সেরা সিদ্ধান্ত হবে না। আমি ফের আমার লক্ষ্যের দিকে তাকাই, আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি হাল ছেড়ে দেব না, আমি আমার লক্ষ্য পূরণ করবই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার কিছু হারানোর নেই, নিঃশেষ হলে হয়ে যাবে। এই ইচ্ছাতেই আবার পানিতে নামি। আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে হতাশা কাটানোর জন্য পুলে সময় কাটাতে থাকি। আমি সব সময়ই আমার সেরা সময় আর দুঃসময়ের কথা চিন্তা করি। আমি যেকোনো সময়ই সাঁতারে অযোগ্য হতে পারি, কখনো আমার গগলসে পানি ঢুকে যেতে পারে, গগলস হারিয়েও যেতে পারে। এই চিন্তা আমাকে বেশ সাহায্য করে। আমি হারতে পছন্দ করি না। তার পরও যদি আমি হেরে যাই, তখন নিজেকে প্রশ্ন করি, 'আমি কী করলে এই ব্যর্থতা আর হবে না?' এটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করে চোখের পলকেই যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। আমি বুঝতে পারি কল্পনার যেকোনো কিছুই বাস্তবে ঘটতে পারে। একবার সাঁতারের সময় আমার কবজি ভেঙে যায়। তার পরও আমি পানিতে নামি। আমি প্রথম কয়েক দিন খুবই হতাশ ছিলাম। তখন আমি অনেক সময় পেয়েছিলাম চিন্তাভাবনা করার। আমি বুঝতে পারলাম যারা বলে আমি কিছু করতে পারব না, তাদের কথাবার্তায় আমার পথকে আরও কঠিন করে দেয়। আমি তাদের কথা পাত্তা না দিয়েই পানিতে নেমে পড়ি। সেবারই আমি প্রথম শিখতে পারি 'কখনো হাল না ছাড়া'। জীবনে কোনো অর্জনই সহজে আসে না। প্রাপ্তি নির্ভর করে কীভাবে তুমি বাধাবিপত্তি সামলাবে। বাধাগুলো এক এক করে দূর করলেই তুমি হয়ে উঠবে শক্তিশালী মানুষ। কিন্তু ব্যর্থ হলে কী হবে? ব্যর্থতাগুলো যখন পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে, তখন কোনো একসময় তুমি সফলতা লাভ করবেই। আমার স্কুলের সাঁতারের শিক্ষক বলতেন, 'কোনো কিছুতেই শেষ সীমানা তৈরি করা যাবে না। যত বেশি স্বপ্ন দেখবে তত বেশি সামনে যাবে।' সেই স্বপ্ন দেখার ফল আসে আমার হাতে, যখন আমি পরের বেইজিং

অলিম্পিকে রেকর্ড আটটি স্বর্ণপদক লাভ করি। আমি সব সময়ই চেষ্টা করি আগের মাইকেল ফেল্পসকে অতিক্রম করে যেতে। আমার জীবনের আদর্শ মাইকেল জর্ডান। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই দেখা হয়নি, তার পরও তিনি আমার আদর্শ। তিনি জানেন, কীভাবে বাস্কেটবল কোর্টের ভেতরে ও বাইরে খেলতে হয়। বাস্কেটবল কোর্টে তিনি শুধুই খেলতেন, অন্যদিকে মনোযোগ ছিল না তাঁর। এটাই আমার আদর্শ—আমি যখন যা করব তাতে থাকবে সম্পূর্ণ মনোযোগ।

আমি সব সময় অন্যদের কথা চিন্তা করে শিহরিত হই। অলিম্পিক ভিলেজে আমি এক ছাদের তলায় মার্কিন বাস্কেটবল দল, টেনিসের রাফায়েল নাদাল-রজার ফেদেরারকে দেখতে পাই। আমি বড়মাপের এই খেলোয়াড়দের দেখে রোমাঞ্চিত হই। আমি যখনই হতাশ হয়ে পড়ি তখনই তাদের দেখে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। এই বড়মাপের মানুষদের দেখার জন্য আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই খেলার চ্যানেলে চোখ রাখি। আগের রাতে তারা কী করছে তা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকি।

আমি সাঁতারের জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও ফোন পেয়ে থাকি। আমাকে সবাই উৎসাহ দেয়। আমি সেই উৎসাহকে আমার জন্য বিশাল কিছু মনে করি। মনে হয় তাদের জন্য হলেও আমাকে পানিতে সাঁতরাতে হবে!

আমার লকারে একটা ছবি রাখা ছিল। ছবিটা ছিল ইয়ান ক্রকারের, যে আমাকে ২০০৫ সালের এক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয়। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম যখন অস্ট্রেলীয় সাঁতারু ইয়ান থর্প বলেছিল আটটি স্বর্ণপদক জেতা কারও পক্ষে কখনোই সম্ভব না। আমি আমার প্রস্তুতির সময় সেই ছবিটা আর থর্পের সাক্ষাৎকার ছাপানো সংবাদপত্রের কাটা অংশটা প্রতিদিন দেখতাম। এই দুটি জিনিস আমাকে আরও পরিশ্রমী করে তোলে। আমাকে কেউ সমালোচনা না করে সন্দেহ করলে আমি বেশ রেগে যাই, যা আমাকে আরও জেদি করে তোলে। আমি সব সময়ই আমার নিজের জন্য উৎসাহ খুঁজে বেড়াই। আমি হতাশার মাঝেও

উৎসাহ খুঁজে বেড়াই, যা আমাকে আবার জেগে উঠতে সাহায্য করে।
ইয়ান থর্প আমার প্রতিযোগী হলেও আমি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। যদিও তার জন্যই ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে হতাশা তৈরি হয়েছিল। তাকে প্রতিযোগী হিসেবে অবহেলার কিছু নেই, তার কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। তার কারণেই বিশ্ব সাঁতার অনেক ওপরে উঠে এসেছে।
যে কাজই করুন না কেন, আপনাকে অবশ্যই নীতির সঙ্গে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। শক্তিশালী মন তৈরি করতে হবে প্রেরণা গ্রহণের জন্য। এই শক্তিশালী মনই আপনার মাঝে অনেক কিছু নিয়ে আসে, আপনি নিজেই নিজেকে নতুন করে চিনবেন। আমি সব সময়ই এমনই কিছু করার চেষ্টা করি যা কেউ আগে করেনি, আমি সাঁতারের ধারণা বদলে দিতে চেয়েছি মাত্র।

২০০৮ সালে প্রকাশিত ফেল্পেসর আত্মজীবনী নো লিমিটস: দ্য উইল টু সাকসিড এবং সিএনএনের সাক্ষাৎকার অবলম্বনে
ভাষান্তর জাহিদ হোসাইন

বিশ্বনাথ আনন্দ(দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন)

ঝুঁকি আনে সাফল্য—বিশ্বনাথ আনন্দ



বিশ্বনাথ আনন্দ। দাবায় বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬৯ সালের ২০ ডিসেম্বর ভারতের চেন্নাইয়ে তাঁর জন্ম। দাবার ইতিহাসে আনন্দই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি নক-আউট, টুর্নামেন্ট ও ম্যাচ—তিন ফরম্যাটেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ২০০৭ সালে আনন্দ পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। ২১ জুলাই ২০১০ তাঁর এই লেখাটি ‘ফোর্বস ইন্ডিয়া’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।
আমি কি বিচলিত হই? আমি মনে করি,

বিচলিত হওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়। যখন দুশ্চিন্তা তোমার পিছু ছাড়ে না, তখন তুমি বিচলিত হও, কী করবে তা ভেবে পাও না। তবে এটার ইতিবাচক একটা দিক আছে। এ রকম পরিস্থিতিতে কোন কোন সমস্যা সামনে আসতে পারে, তা তুমি অনুমান করতে শেখো। আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো তখনই এসেছে, যখন আমি পরমানন্দে অসচেতনভাবে গা ছাড়া দিয়ে খেলেছি। তাই যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলে, তখনো তোমাকে চিন্তা করতে হবে, নিশ্চয় সামনে কোনো সমস্যা আছে। আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় কেটেছে ২০০১ সালের শেষের দিকে। সে সময় আমার আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে নষ্ট হতে শুরু করল। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে আমার কয়েক মাস লেগেছিল। কত চেষ্টা করেছি, কোনো কিছুতেই কোনো কাজ যেন হচ্ছিল না। না, খুব বেশি অঘটন ঘটেনি। তবে আমি জানি, দাবা খেলার সঠিক ধরন সেটা ছিল না। এবং সে বছর ডিসেম্বরে আমি আমার বিশ্বখ্যাতি হারিয়েছিলাম।

তুমি যে কাজ করছ, তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। ২০০০-০১ সালে খেলায় আমার অনেক সুনাম ছিল। আমি খুব ভাগ্যবানও ছিলাম। কারণ, তখন খেলায় আমি অনেক ভুল করতাম। কিন্তু ফল খারাপ হয়নি। সতর্ক হওয়ার জন্য কিছু লক্ষণ তখন আমি দেখেছিলাম। এবং আমি আমার স্ত্রী অরুণাকেও বলেছিলাম, 'যেভাবে আমি দাবা খেলছি, তাতে আমি নিজেই খুশি নই। কেননা, একের পর এক শুধু ভুল করেই যাচ্ছি।' তবে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, যদি তুমি নিজেকে বলতে পার, 'আমি অবশ্যই সঠিক কাজটা করব।'

ব্যর্থতা মানে নতুন করে জেগে ওঠা। এটা অনেকটা তোমার মুখে অত্যন্ত ঠান্ডা বরফজল ঢেলে দেওয়ার মতো। কখনো ব্যর্থ হলে প্রথমে জানতে হবে কী কী ভুল তুমি করেছ। দুই ধরনের ব্যর্থতা আছে। এক, হঠাৎ একবার ব্যর্থ হওয়া। আর দুই, বারবার ব্যর্থ হওয়া। আমার ক্ষেত্রে শেষেরটা ঘটে। এটা ঘটে যখন আমি দাবা খেলি। খেলার সময় আমি নতুন নতুন

উপায় বের করি। সাধারণত আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে খেলি। এবং আমি দেখেছি, নতুন ও ভিন্ন কৌশলে খেললে আমার সমস্যা খুব একটা হয় না। বারবার একই চাল চাললে, যদি প্রতিদ্বন্দ্বীও তা ধরতে না পারে, তবু তা একঘেয়েমি তৈরি করে।

খেলায় বা যেকোনো কাজে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে সজাগ থাকতে হবে। আর সফল হওয়ার জন্য ঝুঁকি নিতে হবে। যখন তুমি ঝুঁকি নেবে, তখন আরও সতর্ক থাকতে হবে। একবারের খেলায় তোপালিওভ অপ্রত্যাশিত একটা ঝুঁকি নিল। কারণ এর আগে সে কয়েকবার নির্দিষ্ট কিছু চাল মিস করে। তা ছাড়া অনেক সময় ধরে খেলাটা চলছিল। ফলে এ রকম ঝুঁকি নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক। খেলায় সে হেরেছিল। তবে যদি জিতত, সেও একই কথা বলত যে কীভাবে ওই ঝুঁকিটা তাকে জয় এনে দিয়েছে। এবং বলা হতো, সে যে ঝুঁকিটা নিয়েছিল, তা ছিল নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি। মনে রাখতে হবে, তুমি অপ্রত্যাশিত কিছু ঝুঁকি নিতেই পার। তবে তুমি কী করছ, সে বিষয়ে অবশ্যই সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে নিজেই তুমি বোকা তো বানাতে পারো না।

আত্মবিশ্বাসী হও। যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে সব সময় তুমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে। আত্মবিশ্বাসই সবকিছু। যেহেতু কোনো কাজই শতভাগ পরিপূর্ণ নয়। তাই তোমার মনে সর্বদাই সন্দেহ থাকবে। কিন্তু থেমে থাকলে হবে না। তোমাকে এমন এক পথ বের করতে হবে, যাতে করে তুমি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারো। আমার কথাই ধরো। আমি সোফিয়াতে শেষ যে খেলাটা খেললাম, সেটার গেম-১-এ আমি হেরে গেলাম। অবশ্যই এ আঘাতে আমি আহত হয়েছিলাম। কিন্তু সবাই আমাকে বলেছিল, 'তুমি সেদিনও অনেক শান্ত ছিলে।' ব্যর্থ হলে আবেগের বশে অস্থির হওয়া, হুটহাট রাগ করা, দুশ্চিন্তা করা বা মাথা গরম করা ভালো নয়। বরং নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে এবং পুনরায় চেষ্টা করতে হবে। আমি সেটাই করেছিলাম। গেম-২ খেললাম। আমার অভিজ্ঞতা বলছিল, 'তুমি যদি গেম-২ খেলো।

আর তা যদি ড্রও হয়। তবু তমি শান্ত থাকবে। গেম-৩ খেলার সময় ধৈর্যের ফল তুমি পাবে। এভাবে শেষ গেম পর্যন্ত লড়াই করবে।' এবং সত্যিই আমি গেম-৬ ও ৭-এ পয়েন্টে এগিয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা আমি জিতে যাব। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে, জেতাটা কত কঠিন হবে। হলোও তাই। গেম-৮-এ আমি হেরে গেলাম। গেম-৯-এ ড্র হলো। খেলাটা সত্যিই কঠিন ছিল। কিন্তু আমি যদি তা প্রত্যাশা না করতাম, শেষ পর্যন্ত আমি যেতে পারতাম না।

যেকোনো প্রতিযোগিতায় তুমি যদি জেত, তবে ভালো। কিন্তু তুমি এ কথা বলবে না যে সেখানে তুমি শতভাগ সঠিক ছিলে। তুমি বলতে পার, তোমার কৌশল বা তোমার চেষ্টা কাজ করেছে বলে জিতেছ। আবার যে সেই একই কৌশলে কাজ হবে, তার কি কোনো অর্থ আছে? তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো জেনে গেছে তুমি কীভাবে জিতেছ। এ জন্য তোমাকে নতুন নতুন কৌশলের খোঁজ করতে হবে। যদি দেখো যে দীর্ঘ সময় ধরে সবকিছু ঠিকমতো চলছে, তাহলে বুঝতে হবে, এমন অনেক কিছু আছে যা তুমি খেয়ালই করোনি। হয়তো তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক শক্তিশালী। কিন্তু সত্যিই তুমি কি শ্রেষ্ঠ? খেলতে খেলতে আমি একটা বিষয় শিখেছি, সেটা হলো প্রয়োজনে কৌশল পরিবর্তন করা। পরিবর্তনের মানে এই নয় যে সামনে বিপদ দেখে তুমি ভয় পেয়েছ। বরং নতুন ও ভিন্ন কিছু আবিষ্কারের ইচ্ছা আছে তোমার। আমি ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কোনো চাপ ছাড়াই দাবা খেলেছি। তখন দাবা খেলাটা দারুণ উপভোগ করেছিলাম। তুমিও নিজের কাজকে উপভোগ করো। এটা একটা বড় গুণ।

ফোর্বস ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন থেকে প্রাপ্ত,
সংক্ষেপিত ভাষান্তর: জাহাঙ্গীর আলম

স্যার অ্যাডমন্ড হিলারি (সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয়ী)

জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মনের জোর



প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী স্যার অ্যাডমন্ড পার্সিভ্যাল হিলারি ২০ জুলাই ১৯১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে তিনি ও শেরপা গাইড তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেন। এর আগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গকে জয় করা মানুষের সাধ্যের বাইরে মনে করা হতো। ২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি স্যার এডমন্ড হিলারির মৃত্যু হয়।

সে সময় নিউজিল্যান্ডে ছেলেমেয়েরা হাইস্কুলে ভর্তি হতো মোটামুটি ১৩ বছর বয়সে। কিন্তু আমি প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সেই হাইস্কুলে ঢুকে পড়ি। আর এমনটা হবেই বা না কেন? আমার মা ছিলেন আমাদের ছোট্ট অকল্যান্ডের একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তিনি আমার লেখাপড়ার বিশেষ যত্ন নিতেন সব সময়। তাই ওই অল্প বয়সেই আমি বেশ ভালো ছাত্র হয়ে উঠি আর ক্লাসে অটো প্রমোশন পেয়ে ১১ বছর বয়সেই হাইস্কুলে ঢুকে পড়ি। তাও আবার নিউজিল্যান্ডের সেই সময়ের সবচেয়ে সেরা স্কুলগুলোর একটায়। যাই হোক, সেখানে গিয়ে দেখি ক্লাসের সবাই আমার থেকে বেশ বড়। আমাকে ওদের মাঝে বেশ ছোট ছোট মনে হতো। তবে বছর খানেকের মধ্যে আমিও ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে উঠলাম। শক্তিশালীও হলাম। নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস এভাবেই ফিরে পেলাম। ফলাফল ভালো হতে শুরু করলো ঠিক আগের মতো।

আমি যে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলাম, তা কিন্তু নয়। আমি আসলে এমন ছাত্র ছিলাম, যে কিনা সব সময় নিজের প্রয়োজনীয় লেখাপড়াটা ঠিকভাবে, ঠিক সময়ে করে রাখত। বাবা-মায়ের

কাছ থেকে আমি এই স্বভাবটা পেয়েছি। তাদের দুজনেই নীতির দিক থেকে ছিলেন আপসহীন। বাবা একটা ছোট্ট পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। শুধু সম্পাদনা বললে অবশ্য ভুল হবে; তিনি একাধারে ওই পত্রিকার মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক, প্রতিবেদক, আলোকচিত্রী—সব ছিলেন। শুধু ঘরে ঘরে পত্রিকা বিলি করার কাজটাই করতে হতো না বাবাকে।

সে সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হল। অসৎ কিছু ব্যবসায়ী খাদ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মুনাফা লোটার চেষ্টা করছিল। বাবা এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন নিজের পত্রিকায়। আমি যদি কোনো দিন খেতে বসে খাবার নষ্ট করার চেষ্টা করতাম, তাহলে মা আমাকে মনে করিয়ে দিতেন এশিয়া মহাদেশের এমন অনেক হতদরিদ্র মানুষের কথা, যারা কিনা খাবারের অভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। তখন ছোট্ট আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে আমি খাবার নষ্ট করলে ওই সব দুর্ভাগা মানুষের কী সমস্যা। অবশ্য বড় হয়ে যখন বুঝতে পেরেছি আসল সমস্যাটা, তখন চেষ্টা করেছি ওই সব হতভাগা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।

আজ আমাকে বিশ্ববাসী চেনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের জন্য। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পরে যে বিশ্ববাসীর এত ভালবাসা, সম্মান পাব, তা আমি কখনোই ভাবিনি। আর তার চাইতেও বড় কথা, আমি যে কোনো দিন এভারেস্ট জয় করব, সেটাই কখনো চিন্তা করিনি। এমনকি যখন আমি মাউন্ট এভারেস্টের পাদদেশ থেকে যাত্রা শুরু করি, তখনো আমি সংশয়ে ছিলাম এ ব্যাপারে। আমি জানতাম না, আসলে কোনো মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা।

কৃত্রিম অক্সিজেন ব্যবহার করেও বরফে ঢাকা বিপৎসংকুল ২৯ হাজার ৩৫ ফুট উঁচু কোনো পর্বত পাড়ি দেওয়াটা কোনো সহজ কাজ ছিল না কখনোই। আর শুধু ওপরে উঠলেই তো হয়ে গেল না! ওপরে উঠে আবার নিচেও নেমে আসতে হবে ওই বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে। পৌঁছানোর মাত্র ৩০ ফুট আগেও জানতাম না

www.facebook.com/tanbir.ebooks
চূড়ায় পা রাখতে পারব কিনা আদৌ! এমনো হতে পারত, হয়তো চূড়ায় পা রেখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছি বা নেমে আসার সময় বরফের কোনো গুপ্ত ফাটলের নিচে সমাধি হতে পারত। পুরো অভিযান শেষে নিচে নেমে আসার আগ পর্যন্ত জানতাম না এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব কি না। কিন্তু একটা কথা সত্য, আমি এক মুহূর্তের জন্যও মনোবল হারাইনি অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমি তো মনে করি, যেকোনো কাজ সফলভাবে করার জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো মনোবল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে শারীরিক সামর্থ্য, কারিগরি দক্ষতা, এমনিকি টাকা-পয়সারও প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজনটা হলো মনের জোর। কঠোর মনোবল, দৃঢ় সংকল্প, প্রবল উৎসাহ ছাড়া কোনো কাজই ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। এটাই আসলে মূল পার্থক্য গড়ে দেয় একজন সাধারণ মানুষ আর একজন বিখ্যাত মানুষের মধ্যে।

ছোটবেলায় পড়া হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, জর্জ হায়ারের বই পড়ে আমার সময় কাটত। আমি এসব বই পড়ে শক্তি পেতাম। আমার মনোবল শক্ত হয়েছে এভাবেই। আমি মনে করি, খুব বেশি মেধাবী হওয়ার দরকার নেই বিশেষ কিছু হওয়ার জন্য, বা বিখ্যাত হওয়ার জন্য।

তরুণদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তোমরা সব সময় বড় কিছু চিন্তা কোরো। বড় কিছু পাওয়ার চেষ্টা কোরো। হয়তো একবারে পারবে না, দুবারেও পারবে না, কিন্তু একসময় বিজয় আসবেই। কোনো কাজ বারবার চেষ্টা করলে সেই কাজের ওপর আরও বেশি দখল আসে। সেই কাজ করা আরও বেশি সহজ হয়ে যায়। যেকোনো কিছু জয় করার সামর্থ্য রয়েছে তোমার। বিশেষ কিছু করতে হলে বিশেষ কোনো মানুষ হতে হবে, তা নয় মোটেও। আমি মনে করি, যে কারও পক্ষে সম্ভব যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা।

সূত্র: একাডেমি অব অ্যাচিভমেন্ট।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: ফয়সাল হাসান

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

খাদিজা উইলিয়ামস

মানুষের ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে ক্ষমতাধর(খাদিজার হার্ভার্ডে পৌঁছে যাওয়া!)



খাদিজা উইলিয়ামস। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী শিক্ষার্থী। স্কুলের এক শিক্ষক তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তুমি তো ঈশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছো।'

তার কারণও ছিল বটে। নবম শ্রেণি পর্যন্ত খাদিজা প্রতিটি বিষয়ে গড়ে ৯৯ ভাগ নম্বর পেতো।

অথচ খাদিজার জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোর গল্প কেউ জানতো না। সে মেধাবী, পড়াশোনায় ভালো করছে। কিন্তু প্রতিদিন তার জীবনটা কেমন যায়? এই খোঁজ তো কেউ রাখে না।

খাদিজার কোনো ঘর ছিল না। সে থাকতো রাস্তায় কিংবা ফুটপাতে অথবা কোনো পার্কের বেঞ্চে। প্রতিটি দিনই ছিল তার যুদ্ধের। যে যুদ্ধ সে সবার আড়ালেই করেছে। তবে হাইস্কুলে পড়ার সময় খাদিজার অর্থ সংকট দেখা দিলো। সে তখন তার স্কুলের কাউন্সিলরদের বিষয়টি জানাতে বাধ্য হলো। তারা খাদিজার গল্প শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন।

সবাই তখন খাদিজার মেধা ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে সমস্ত খরচ ফ্রি করে দিলো। খাদিজাকে মাস শেষে বৃত্তির কিছু অর্থও দেয়া হতো কলেজ থেকে।

খাদিজার বয়স তখন ১৮ বছর। সবাইকে

Web: http://tanbircox.blogspot.com

বিস্মিত করে খাদিজা সুযোগ পেলো বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার কারণও ছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির দরখাস্তে খাদিজা নিজের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে স্কুল ও কলেজ সময়ের গৃহহীন হয়ে থাকার গল্পটি তুলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াতে প্রকাশ পেলো খাদিজার জীবন যুদ্ধের গল্প। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ মেয়ের যুদ্ধের গল্প শুনে মুগ্ধ হলো। খাদিজাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্যও ডাকা হলো।

সেখানে তাকে হার্ভার্ডে পড়তে দেয়ার কথা জানানো হলে সে বলে, আপনারা যদি আমাকে পড়ার সুযোগ দেন তবে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হবো। তবে আমি মেধার যোগ্যতা দিয়ে পড়তে চাই। আমার থাকার কোনো জায়গা নেই, সেজন্যই হার্ভার্ডে সুযোগ পাচ্ছি। এ বিষয়টি গুরুত্ব পেলে আমি এখানে পড়বো না। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে খাদিজা উইলিয়ামসকে তার যোগ্যতা দেখে ভর্তি করলো। সেখানে হাজারো শিক্ষার্থীদের সামনে অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত খাদিজা উইলিয়ামস।

জেরেমির যুদ্ধ

পুরো নাম জেরেমি সিসিলে কাইরা। তার জন্য হাইস্কুলে পড়াশোনা করা ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি। অটিজমে আক্রান্ত জেরেমি কথা বলতে পারতো না। কিন্তু সব বাধা টপকে হাইস্কুল ডিপ্লোমা নিতে ছিল বদ্ধ পরিকর। স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ জেরেমির জন্য বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু জেরেমি সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্লাশ করতে চায়। সেজন্য পরিচালনা পর্ষদ কিছুটা বিপাকে পড়লেও পরে রাজি হয়। জেরেমির জন্য যেকোনো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা দেয়া হতো না। জেরেমি অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারলেই হবে। কিন্তু জেদি জেরেমি তার ক্লাশের অন্য বন্ধুদের সঙ্গেই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতো।

অটিজমে আক্রান্ত জেরেমি কথা বলার এমনকি শুনতে পারার শক্তিও হারায়। যে কারণে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনেক সমস্যা হতো। জেরেমি এ বিষয়টি বুঝতো। সে আপ্রাণ

চেষ্টা করতো নিজের মনোযোগকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখার। এ সম্পর্কে জেরেমি বলেছিল, আমি যদি সামান্য পরিমাণ মনোযোগ ধরে রাখতে না পারি, তবে বুঝতে হবে আমি এক আজব পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি।
জেরেমির সাহস দেখে তার শিক্ষক ও অভিভাবকরা অবাক হতেন। তার আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায় ছিল দেখার মতো। অবশেষে যুদ্ধ জয় করলো জেরেমি। ক্যালিফোর্নিয়া হাইস্কুল থেকে তিন দশমিক পাঁচ জিপিএ নিয়ে পাশ করলো। তার পড়াশোনার জীবন নিয়ে তাকে একটা বক্তৃতা দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।
জেরেমি ভয়েস অ্যাসিসটেন্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে বক্তৃতা দেয়। যেখানে সে বলে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর স্বভাব হলো মানুষের ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি দিয়ে প্রতিটি মানুষ বিশ্বজয় করার ক্ষমতা রাখেন। ।
হারিয়ে যাওয়া শিশু রিয়াক
ইথিউপিয়াতে দীর্ঘসময় ধরে চলেছে গৃহযুদ্ধ। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে নব্বয়ে এসে শেষ হয়েছে। ততদিনে রক্তাক্ত হয়েছে হাজার হাজার প্রাণ। নষ্ট হয়েছে হাজারো শিশুর স্বপ্ন। তেমনই একজন আদভেই রিয়াক। মাত্র ছয় বছর বয়সে আদভেই রিয়াকের পুরো পরিবার গৃহযুদ্ধে নিহত হয়। হাজারো আশ্রয়হীন মানুষের সঙ্গে জীবন চলতে থাকে রিয়াকের। রিয়াকের মতো শিশুদের বলা হতো 'লস্ট চিল্ডড্রেন অব সুডান'। আশ্রয়হীনভাবেই বিভিন্ন ক্যাম্পে রিয়াকের কেটেছে দীর্ঘসময়।
যুক্তরাষ্ট্র ২০০০ সালে ৮৯ জন শিশুকে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের অভিবাসন করা হয়। তখন বেলমন্ট পরিবার রিয়াককে নিয়ে যান। তারা তাকে স্কুলে ভর্তি করান। রিয়াক তখন ঠিকমতো কোনো ভাষাও বলতে পারে না। ভাষা শিক্ষার জন্য বাসায় শিক্ষকও নিয়োগ করলেন বেলমন্ট। বছর দুয়েকের মধ্যেই ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ফেললো রিয়াক। এরপর দেখা গেলো ক্লাশের সবাইকে পেছনে ফেলে ভালো ফলাফল করা শুরু করেছে রিয়াক।

পড়াশোনায় মেধাবী হবার কারণে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ব্র্যানডিস ইউনিভার্সিটি তাকে স্কলারশিপ দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়। রিয়াক সেখান থেকে ২০০৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ভালো ফলাফল করার জন্য রিয়াককে লুইস ব্র্যানডিস স্কলার সম্মান দেয়া হয়।

বর্তমান সময়ে রিয়াক সামাজিক কর্মকা- নিয়ে কাজ করছেন। মানবতাবিরোধী শক্তির বিপক্ষে রিয়াক রয়েছেন সোচ্চার। শুধু তাই নয়, নারী অধিকার এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য রিয়াক বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের কাজ করে যাচ্ছেন।

রোনান ফ্যারো(ইউনিসেফের যুব মুখপাত্র)

সাফল্যের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস



ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ মিলনায়তন তখন একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় এক হাজার ‘ভিকি’ অপেক্ষা করছে, ‘তিনি’ আসবেন তাই। হাজারো ভিকির তুমুল করতালি, ড্রামবাদন আর উল্লাসধ্বনির ভেতরে ডায়াসে এলেন তিনি। ‘তিনি’ হলেন রোনান ফ্যারো। রোনান যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল স্কুল থেকে স্নাতক। কিছুদিন মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন। ইউনিসেফের যুব মুখপাত্রও ছিলেন একসময়। এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘গ্লোবাল ইয়ুথ ইস্যুজ’-বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা এবং অফিস অব গ্লোবাল ইয়ুথ ইস্যুজের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

যাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে এত কথা বলতে হলো তাঁর বয়সটা কত শুনতে চান, পাঠক? এই তো, দুই দিন আগে মানে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে সবে চব্বিশে পা রাখলেন এই তরুণ!

যুক্তরাষ্ট্রের হারপার্স বাজার-এর বিবেচনায়, তিনি

২০১০ সালের সেরা উঠতি রাজনীতিবিদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে সারা দুনিয়া চষে বেড়ান এই তরুণ। যে দেশেই যান সেই দেশেই তরুণদের ক্ষমতায়নের কথা বলেন, একসঙ্গে সংগঠিত হয়ে নিজের কথা, নিজের দাবি কীভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হয়, তা নিয়ে আলোচনা করেন তরুণদের সঙ্গে। তারই অংশ হিসেবে তিনি এসেছেন বাংলাদেশে। ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বরের সফরে ১২ তারিখ তিনি গিয়েছিলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের তরুণ নেতৃত্বের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে।

'আমি জেনেছি, গত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের যাঁরা অনেকেই প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছেন, তাঁরাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন ক্ষমতায় যাবেন কারা। আগামী নির্বাচনে এই তরুণ ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়বে।' তরুণদের অবহেলা করাটা যে একেবারেই কাজের নয়, সেটাই যেন বলে দিলেন রোনান ফ্যারো। শুধু যে নিজে বললেন তা-ই নয়, শিক্ষার্থীদের কথা বলার সুযোগ দিলেন। আনিকা তাহসীন, নাইমা আমীনসহ আরও অনেকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন রোনান।

কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম বলেন, 'রোনান ফ্যারোর মতো একজন তরুণ নেতা এসে যখন তরুণদের উদ্দীপ্ত করেন, তখন তরুণেরা নিজেরাও মনে করে যে রোনান ফ্যারো যদি হতে পারেন তবে আমরা কেন নয়। এ কারণেই আমি মনে করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা আজ রোনান ফ্যারোর কথা শুনে একদিন তাঁর মতোই হওয়ার জন্য কাজ শুরু করবে এখন থেকেই।'

এই অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই এই তরুণ সাংবাদিককে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন তরুণ নেতা রোনান ফ্যারো। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই রোনান জানালেন, তিনি বাংলাদেশকে খুব ভালোবাসেন। তিনি এমনটা বলতেই পাল্টা প্রশ্ন করি, কেন তিনি বাংলাদেশকে

ভালোবাসেন। তাতে যা উত্তর মিলল, সেটা না হয় রোনানের মুখ থেকেই শোনা যাক, 'বিশ্বের অনেক দেশেই যাওয়ার এবং সেখানকার তরুণদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব দেশেই তরুণেরা কিছুটা একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, সেবামূলক ভালো কাজের প্রতি বাংলাদেশের তরুণদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে, তা অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি।'
রোনান জানালেন, বাংলাদেশের অনেক তরুণের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, যাদের দেখে তাঁর মনে হয়েছে, তারা অনেক শক্তিশালী তরুণ নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। রোনানকে প্রশ্ন করি, ছাত্ররাজনীতিকে তিনি কীভাবে দেখেন। রোনান বলেন, 'আমার মনে হয় শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ছাত্ররাজনীতি ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। আমি অনেক বাংলাদেশি তরুণের কাছে শুনেছি, তাদের নিজেদের ক্যাম্পাসে নিজেদের চিন্তাচেতনার কথা ছড়িয়ে দিতে গিয়ে তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আমি আশা করি শিক্ষার্থীরা এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে পারবে নিজেরাই।'
রোনান ফ্যারোর কাছে জানতে চাই, তিনি নিজে একজন তরুণ নেতা—এ বিষয়টা কেমন লাগে তাঁর কাছে। 'আমার নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়। সেই সঙ্গে এটা অনেক মজারও। কারণ, সব সময় তরুণদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়।' সবশেষে জানতে চাই, বাংলাদেশের একজন তরুণ যদি রোনান ফ্যারোর মতো তরুণ নেতা হতে চায়, তবে কোন তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রোনান একটু ইতস্তত করতে থাকেন, জানতে চান, তিনটিই বলতে হবে, নাকি আরও কিছু বলতে হবে। আমি বলি, তিনটি বললেই হবে। অনেকগুলোর মধ্য থেকে সেরা তিনটি বলুন। স্মিত হেসে রোনান বলতে থাকেন, 'প্রথমেই বলব যে নিজের নীতি মেনে চলতে হবে। কী নিয়ে কথা বলছ, সেটা

www.facebook.com/tanbir.ebooks
ভালোভাবে জানতে হবে। অনেক দেশেই এমন হয়, সফল হওয়ার পর আর নিজের নীতির কথা মনে থাকে না। দ্বিতীয়ত, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। চাই আত্মবিশ্বাস। নিজের মানুষদের কাছে, নিজের ক্যাম্পাসে যাও। ২০০৮-এর নির্বাচনের সময় এক-চতুর্থাংশ ভোটারই ছিল তরুণ। সামনের নির্বাচনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। এভাবেই তরুণদের নিজেদের কথার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে সবার কাছে। তৃতীয়ত, আমি তাদের বলব সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য। সম্মিলিতভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে হবে হিংসা-ভেদাভেদ ভুলে। অনেক সময়ই এমন দেখা যায়, ভালো কাজের জন্য ভালো মানুষেরা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা করতে থাকেন, এটা আসলে ধ্বংসাত্মক। আমি মনে করি, বাংলাদেশি তরুণেরা যদি নিজেদের নীতিতে অটল থেকে, সাহসিকতার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কথা বলে, তাহলে একদিন এই দেশটি অনেক উন্নতি করতে পারবে।'

ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত

Web: http://tanbircox.blogspot.com

www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox

http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox

http://somewhereinblog.net/tanbircox

http://pchelplinebd.com/?author=1177

http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359555

E --Mail: → tanbir.cox@gmail.com

Facebook: →

http://facebook.com/tanbir.cox

Fb Page: →:

https://facebook.com/tanbir.ebooks

Web Site : →

http://tanbircox.blogspot.com

Skype: tanbir.cox

